সাইয়েদ কুতুব শহীদ
তাফসীর
ফী যিলালিল
কোরআন
১৮তম খন্ড
কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৮ম খন্ড

সূরা আল মোমেন
থেকে
আল জাসিয়া

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১৮তম খন্ড সূরা আল মোমেন থেকে সূরা আল জাছিয়া)

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

১১ম সংস্করণ

রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ চৈত্র ১৪১৭

কম্পোজ

আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition

Hafiz Munir Uddin Ahmed

18th Volume

(Surah Al Momen to Surah Al Jasiah)

Published by

Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London

124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK

Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507 Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1217
38 Banglabazar Computer Market (1st Floor), Stall No-226
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1999

11th Edition

Rabius Sani 1432 March 2011

Price Tk. 200 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk

ISBN NO 984-8490-18-3

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়
এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আলামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরি চয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে

নিমজ্জিত একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল মোমেন

আয়াত ৮৫ রুকু ৯

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى

الْبِلَادِ ۝٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ

كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ

فَاَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা-মীম, ২. এ গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, (তিনি) পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, ৩. (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (তিনি) শাস্তিদানে কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, (একদিন) তাঁর দিকেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে। ৪. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালার (নাযিল করা এ) আয়াতসমূহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা কুফরী করে, অতপর শহরে (বন্দরে) তাদের বিচরণ যেন (কোনোদিনই) তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে। ৫. তাদের আগে নূহের জাতি (সে যমানার নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, আবার তাদের পর অন্যান্য দলও (নবীদের অস্বীকার করেছে), প্রত্যেক জাতিই তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি এটেছিলো এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করেছি। (চেয়ে দেখো), কেমন (ভীতিকর) ছিলো আমার আযাব! ৬. এভাবে কাফেরদের ওপর তোমার মালিকের বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো যে, এরা সত্যি সত্যিই জাহান্নামী। ৭. যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন করে চলেছে, যারা এর

حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا

سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۨ الَّتِيْ

وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ

اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ

اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ج وَاِنْ

চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে (তারা বলে), হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার (দ্বীনের) পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! ৮. হে আমাদের মালিক, তুমি তাদের সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে (তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, ৯. তুমি (কেয়ামতের দিন) তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করো, (মূলত) সেদিন তুমি যাকেই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে, তাকে তুমি (বড়ো বেশী) দয়া করবে, আর এটাই হচ্ছে (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

রুকু ২

১০. নিসন্দেহে যারা কুফরী করেছে, (তাদের উদ্দেশে) ঘোষণা দিয়ে বলা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে রোষ– তার চাইতে আল্লাহ তায়ালার রোষ আরো বেশী (বিশেষ করে), যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হচ্ছিলো আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে। ১১. তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি তো দু'বার আমাদের মৃত্যু দিলে, আবার দু'বার জীবনও দিলে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকারও করেছি, অতএব (এখন আমাদের এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি? ১২. (তাদের বলা হবে,) তোমাদের (এ শাস্তি) তো এ জন্যে, যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, যখন তাঁর সাথে শরীক

يُشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ

اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا

اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ

ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ

التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ

الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا

كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ

الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا

করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে; (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা– তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান। ১৩. (হে মানুষ,) তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে রেযেক পাঠান, (আসলে এ থেকে) তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা (একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবিষ্ট হয়। ১৪. অতএব (হে মুসলমানরা), তোমরা (তোমাদের) জীবন বিধানকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিবেদিত করো, একমাত্র তাঁকেই ডাকো, যদিও কাফেররা (এটা) পছন্দ করে না। ১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মহান অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ তার ওপর ওহী পাঠান, যাতে করে সে (ওহীপ্রাপ্ত রসূল আল্লাহর সাথে) সাক্ষাত লাভের (এ) দিনটির ব্যাপারে (বান্দাদের) সাবধান করে দিতে পারে, ১৬. সেদিন (যখন) মানুষ (হাশরের ময়দানে) বেরিয়ে পড়বে, (তখন) তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন থাকবে না; (বলা হবে,) আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? (জবাব আসবে,) প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে। ১৭. আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ সে (দুনিয়ায়) অর্জন করে এসেছে; আজ কারও প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে তৎপর। ১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী,

شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي

بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

যা (তখন) গ্রাহ্য করা হবে; ১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)। ২০. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাদের মাঝে) ন্যায়বিচার করেন; (কিন্তু) ওরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা (অন্যের ন্যায়বিচার তো দূরের কথা, নিজেদের) কোনো বিচার ফয়সালাও করতে সক্ষম নয়; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটায় প্রধানত হক ও বাতিল, ঈমান ও কুফরী, দাওয়াত ও তা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সর্বশেষে পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে একনায়কত্ব ও জবরদস্তি প্রয়োগ এবং একনায়ক ও জবরদস্তি প্রয়োগকারীদের ওপর আল্লাহর শাস্তির বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুগত মোমেনদের ভূমিকা ও তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য, তাদের জন্যে ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দোয়া কবুল করা এবং আখেরাতে তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতি পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ কারণেই সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বলে প্রতীয়মান হয়। এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের যুদ্ধ, ঈমান ও আল্লাহদ্রোহিতার যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারদের সাথে আল্লাহর সেই ভয়াবহ আযাবের যুদ্ধ, যা তাদেরকে পদে পদে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত করে। আর এর মাঝে যখন মোমেনদের প্রসংগ আসে, তখন আল্লাহর করুণা ও সন্তোষের সুবাতাস বয়ে যায়।

সূরার প্রেক্ষাপটে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে। আর এই দুটো বিষয় সূরার আয়াতগুলোতে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খুবই লক্ষণীয়ভাবে। এগুলোকে সূরার সঠিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে সূরার প্রেক্ষাপটে যে কঠোরতা রয়েছে, আলোচ্য বিষয়গুলোতেও তা রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য সূরার উদ্বোধনী অংশেও পরিলক্ষিত হয়। একটা বিশেষ ছন্দময় সুরেলা ঝংকারের সাথে বলা হয়েছে, 'তিনি গুনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদানকারী এবং মহাশক্তিধর....।' *(আয়াত ৩)*

এ আয়াতের শব্দগুলো যেন হাতুড়ি দিয়ে তাল মিলিয়ে পিটিয়ে ঘন্টা বাজানোর ধ্বনি। এর আঘাতের প্রভাব যেন স্থায়ী। এর প্রত্যেকটা শব্দ যেন স্বতন্ত্র এক। এর প্রত্যেকটা শব্দের অর্থও এর ঝংকৃত সুরের সমর্থক ও শক্তি যোগানদাতা।

বা'স, বা'সুল্লাহ ও বা'সুনা (আযাব, আল্লাহর আযাব ও আমার আযাব) শব্দটাকেও বারবার সূরার বিভিন্ন জায়গায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া এর কাছাকাছি অর্থের আরো বহু শব্দ রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, সমগ্র সূরাটা মানুষের মনের ওপর তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করা ও গভীর দাগ কাটার মতো বহু উপাদানে সমৃদ্ধ। অতীতের ধ্বংস হওয়া জাতিগুলোর কাহিনী এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলী এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কোনো কোনো জায়গায় আবার হৃদয়ের ওপর কোমল পরশ বুলানো কথাবার্তাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আরশবহনকারী ও আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের জন্যে দোয়া করা, প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনাবলী ও মানুষের নিজ সত্ত্বার ভেতরে বিরাজমান নিদর্শনাবলীর উল্লেখ ইত্যাদি। নিম্নে সূরার এইসব বিষয় ও পটভূমি নির্দেশকারী কয়েকটা আয়াত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি,

অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী ৫, ২১, ২২, নং আয়াত সমূহ। কেয়ামতের দৃশ্যাবলী, ১৮, ৭০, ৭১ ও ৭২ নং আয়াতসমূহ। আর কোমল পরশ বুলানো আয়াত ৭, ৮, ৯ নং আয়াত লক্ষ্য করুণ। প্রকৃতিতে ও মানবসত্ত্বায় বিরাজিত নিদর্শনাবলীর উল্লেখ, ৬৭, ৬৮, ৬৪, ৬৫, ৬১ নং আয়াত লক্ষ্য করুন।

এসব আয়াত থেকে সূরার সামগ্রিক পটভূমি ও আলোচ্য বিষয় জানা যায়। আর এগুলো দ্বারা এর বিষয়বস্তুর সাথে এর প্রকৃতির সমন্বয় ঘটানো যায়। সূরাটা মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত এবং এর প্রত্যেকটা অংশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী,

প্রথম অংশটায় রয়েছে সূরার উদ্বোধনী পর্ব, যা বর্ণমালার দুটো অক্ষর দ্বারা শুরু হয়েছে। যেমন, 'হা-মীম, এটা মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাব।' (আয়াত ১ ও ২) এরপর রয়েছে সেই অপূর্ব ছন্দময় সুরে ঝংকৃত আয়াত, গুনাহ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী ....।' (আয়াত ৩)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত। মানুষের ভেতর থেকে কিছু কাফের ছাড়া বিশ্বজগতের কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে তর্ক করে না। তর্ককারী এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলো সমগ্র সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই ধন সম্পদের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা যতোই পাল্টে যাক রসূল (স.)-এর কাছে তাদের কোনোই গুরুত্ব নেই। কেননা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং এমন শাস্তি দিয়েছিলেন, যা অহংকারীদের যথার্থই প্রাপ্য। আর শুধু দুনিয়ার শাস্তিই তো শেষ নয়, তাদের জন্যে আখেরাতের আযাবও অপেক্ষা করছে। ওদিকে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের এবাদাত করে ও দুনিয়াবাসী মোমেনদের মাগফেরাত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দিন কাফেরদের কী শোচনীয় পরিণতি হবে তাও দেখানো হয়েছে। মোমেনদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতোটা ক্ষুব্ধ হচ্ছো, তোমাদেরকে যেদিন ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো, আর তোমরা সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলে, সেদিন আল্লাহর ক্রোধ আরো সাংঘাতিক ছিলো।'

দুনিয়ার জীবনের অহংকার ও গর্ব সেদিন ধুলোয় মিশে যাবে। সেদিন তারা চরম বিনয়ের সাথে নিজেদের সমস্ত পাপের স্বীকারোক্তি করবে এবং তাদের প্রতিপালককে মেনে নেবে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিও মেনে নেয়াতে কোনো লাভ হবে না। আসলে তারা শুধু তাদের পার্থিব জীবনের শেরক দাম্ভিকতা ও যাবতীয় অপকর্মই স্মরণ করবে। আখেরাতে আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থান প্রসংগে দুনিয়ার কথা পুনরায় স্মরণ করানো হবে,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন।'

তিনি এসব নিদর্শন স্মরণ করান এ জন্যে যেন তারা তাদের প্রতিপালকের অনুগত হয় এবং একমাত্র তার এবাদাত করে, 'অতএব আল্লাহর এবাদাত করো একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

এরপর সেই কঠিন দিন সম্পর্কে যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছিলো এবং ওহী পাঠানো হয়েছিলো, তার উল্লেখ করে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য পুনরায় তুলে ধরা হচ্ছে,

'যেদিন তারা আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তাদের কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।'

সেদিন বড় বড় দাম্ভিক, একনায়ক ও বিতর্ককারী সবাই উধাও হয়ে যাবে। সেদিন বলা হবে 'আজকের রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।' এরপর এই দিনের আরো কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে, যেদিন আল্লাহ তায়ালাই এককভাবে শাসন ও বিচার পরিচালনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যা কিছুর পূজা উপাসনা করা হতো সেদিন সে সবের আর কোনো পাত্তা থাকবে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যারা অবাধে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো ও জনগণের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতো, তাদেরও আর কোনো খোঁজ থাকবে না।

দ্বিতীয় অংশটা প্রাচীনকালের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা এসেছে ফেরাউন, হামান ও কারূণের সাথে হযরত মূসার ঘটনাবলী বর্ণনার ভূমিকা হিসাবে। সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে ফেরাউনের ভূমিকার বর্ণনা প্রসংগে এখানে এমন একটা ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যা হযরত মূসার কাহিনীতে ইতিপূর্বে কখনো উল্লেখ করা হয়নি এবং এই সূরায় ছাড়া আর কোথাও তার উল্লেখ নেই। এই ঘটনা হলো, ফেরাউনের অনুসারীদের মধ্য এমন এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ, যিনি এ যাবত তার ঈমান গোপন রেখে আসছিলেন। হযরত মূসাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হতে দেখে এই ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারেননি। তিনি এই হত্যার ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে সচেষ্ট হন। প্রথমদিকে তিনি সত্য ও ঈমানের কথা অত্যন্ত সন্তর্পণে ও বিনীতভাবে প্রকাশ করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি ফেরাউনের সাথে অত্যন্ত জোরালো ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তর্ক করেন। তাকে ও তার দলবলকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কেয়ামতের কিছু কিছু দৃশ্যও তুলে ধরেন এবং তাদের ও তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। এ প্রসংগে তিনি হযরত ইউসুফ ও তার রেসালাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। এভাবে এ কেসসা বর্ণনা করতে করতে ফেরাউনের আখেরাতে কী অবস্থা হবে, তাও ব্যক্ত করেন। সূরার এই পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন।

সূরার তৃতীয় অংশটা শুরু হয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে যে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য থাকে বলেই তারা এটা করে। অথচ তারা এই সত্যের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। এরপর আল্লাহর সৃষ্টি করা এই বিশাল বিশ্বজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির চেয়েও বিরাট ও বিশাল। অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা যদি আল্লাহর সৃষ্টির বিশালত্বের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্রত্বকে অনুধাবন করতো, তাহলে তারা এমন অন্ধ ও গোঁড়া হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চক্ষুস্মান ব্যক্তি ও অন্ধ ব্যক্তি, আর সৎকর্মশীল ব্যক্তি ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি সমান হয় না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'

এই পর্যায়ে মানুষকে কেয়ামতের আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং দোয়া কবুলকারী মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা দাম্ভিকতা

দেখায়। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু কিছু প্রাকৃতিক নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যার কাছ দিয়ে তারা উদাসীনভাবে চলাচল করে। রাতকে অবকাশ যাপন ও বিশ্রামের সময় এবং দিনকে আলোকোজ্জ্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবীকে অবস্থানের জায়গা ও আকাশকে ছাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে, আর তাদের নিজেদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি কতো সুন্দর গঠন ও আকৃতি দান করেছেন। অতপর তাদেরকে একনিষ্ঠ আনুগত্য সহকারে আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দান করেছেন। রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাদের মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন, তাদের দেব দেবী থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ জনগণকে অবহিত করেন, তাকে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করার আদেশ প্রচার করেন। জনগণের মনে এই সত্য বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রথমে মাটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। অতপর পুনরায় রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ককারীদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে কেয়ামতের আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সেদিন তাদের ঘাড়ের ওপর বেড়ি ও শেকল পরানো হবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে টেনে নেয়া হবে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।'

যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো তারা সেদিন সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে। এমনকি স্বয়ং মোশরেকেরাও দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো এবং ওখানে চিরদিন অবস্থান করো। দাম্ভিকদের আবাসস্থল কতই না জঘন্য!'

এ দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর রসূলকে পুনরায় ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আস্থা রাখতে বলছেন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, চাই এই প্রতিশ্রুতির কিছু অংশ দুনিয়াতেই কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে থাক অথবা তার আগেই মারা যাক। সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই।

সূরার শেষ ভাগটি তৃতীয় অংশের সাথেই সংযুক্ত। রসূল (স.)-কে ধৈর্যধারণ ও অপেক্ষা করতে আদেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আগে বহু রসূল পাঠিয়েছেন। 'কোনো রসূলই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতে পারে না।' সাধারণভাবে বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র এবং সকলের চোখের সামনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে সবাই উদাসীন। যেমন ধরা যাক, এইসব জীবজন্তু যারা মানুষের ইংগিতে চলে। কে তাদেরকে মানুষের অনুগত করলো? আর এইসব নৌযান, যা মানুষকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। নিদর্শন তারা কি দেখতে পায় না? আর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের বৃত্তান্ত কি তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না? কোনো উপদেশই কি তাদেরকে দেয় না? সূরাটার সমাপ্তি টানা হয়েছে কাফেরদের ধ্বংসের কাহিনী সম্পর্কে একটা জোরদার মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে। তারা আল্লাহর আযাব দেখে ঈমান এনেছিলো। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এই সমাপনী বক্তব্য থেকে দাম্ভিক লোকদের পরিণতি কী হয়, তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এবার এটা সূরার বিশদ ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করা যাক।

তাফসীর

আয়াত ১-২০

হা-মীম..........। (আয়াত ১, ২ ও ৩)

এই সূরা থেকে শুরু হয়েছে হা-মীম দিয়ে আরম্ভ করা সাতটা সূরা। এগুলোর মধ্যে একটা সূরায় হা-মীমের পর 'আইন-সীন-কাফ'ও যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সূরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই কোরআন এসব বর্ণমালা দিয়েই রচিত হয়েছে, তথাপি এ বর্ণমালা দিয়ে মোশরেকরা এ ধরনের কেতাব রচনা করতে পারে না। অথচ এসব বর্ণমালা তাদেরই ভাষার বর্ণমালা, এগুলো দিয়ে তারা কথা বলে ও লেখে। এগুলো তাদের কাছে সুপরিচিত এবং এগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার তাদের কাছে খুবই সহজ।

এর অব্যবহিত পরই কেতাব নাযিল করার বিষয়টার উল্লেখ করা হয়েছে। আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনার পর্যায়ে মক্কী সূরাগুলোতে যে তত্ত্বটা বারবার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে, এটা তার মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহর জন্যে সংরক্ষিত নাম ও তার ক্ষমতা

'মহাপরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কেতাব নাযিল হয়েছে।'

এখানে কেতাব সংক্রান্ত বিষয়টা এতোটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই প্রসংগ পাল্টে এই কেতাব নাযিলকারী মহান আল্লাহর কিছু গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, (আয়াত ৩)

এই গুণগুলো হচ্ছে শক্তি ও পরাক্রম, জ্ঞান, গুনাহ মাফ করা, তাওবা গ্রহণ করা, কঠিন শাস্তি দান, অনুগ্রহ ও পুরস্কার দান, প্রভুত্বের একত্ব এবং শেষপরিণতি ও কর্মফল স্থলের একত্ব।

সূরার সবকটা আলোচ্য বিষয় এই গুণাবলীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। এই গুণাবলী সূরার শুরুতেই এতো প্রভাবশালী ভংগীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাতে স্থীতিশীলতার আভাস পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নিজের এমন গুণাবলীর পরিচয় দেন, যা তাদের জীবনে ও অস্তিত্বে প্রভাব বিস্তার করে, যা তাদের হৃদয় ও ভাবাবেগকে স্পর্শ করে, যা তাদের আশা ও অভিলাষকে জাগিয়ে তোলে, আবার তাদের মনে ভয় ভীতিরও সঞ্চার করে এবং তাদেরকে এরূপ ধারণা দেয় যে, তারা আল্লাহরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেখান থেকে তাদের পালানোর কোনো উপায় থাকে না। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হলো,

আল-আযীয : মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী, যিনি শুধু বিজয়ী হন, কখনো পরাজিত হন না, যিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, কেউ তার ওপর ক্ষমতা লাভ করে না এবং কেউ তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে না।

আল আলীম : মহাজ্ঞানী, যিনি গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গোটা বিশ্বজগতকে পরিচালিত করেন। কোনো কিছু তার আগোচরে ও অজানা থাকে না।

গাফেরুয্ যাম্বে : পাপ ক্ষমাকারী। কেননা তিনি জানেন, কারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

কাবেলুত তাওবে : তাওবা কবুলকারী, তাদেরকে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় দেন এবং তাদের জন্যে তার দরজা খুলে দেন।

শাদীদুল একাবে : কঠিন শাস্তি দাতা, যিনি সেইসব অহংকারীদেরকে নিপাত করেন এবং সেইসব বিদ্রোহীরেকে শাস্তি দেন, যারা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে না।

যিত তাওলে : বিপুল বিত্তশালী, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেন, সৎকাজের বহুগুণ বেশী প্রতিদান দেন এবং বিনা হিসাবে তাদের দান করেন।

লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া : তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক ও সমকক্ষ নেই।

ইলাইহিল মাসীর : একমাত্র তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তার কাছে জবাবদিহী না করে ও সাক্ষাত না করে কারো পালানোর স্থান নেই।

এভাবে তাঁর বান্দাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে তারা বুঝতে পারে সচেতনভাবে কেমন করে তার সাথে আচরণ করবে। কিসে তিনি খুশী এবং কিসে অসন্তুষ্ট হন, তা জানতে পারবে।

মোশরেকরা তাদের মূর্তিগুলোর উপাসনা করতো বটে। তবে ওগুলোর সম্পর্কে তাদের কোনো নিশ্চিত জ্ঞান ছিলো না। কিসে তারা সন্তুষ্ট, কিসে অসন্তুষ্ট হয়, তা তারা জানতো না কেবল নানারকমের তাবীয-তুমার ও পশু বলির প্রচলন করে তাদেরকে খুশী রাখতে চেষ্ট করতো- তাও নিছক আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। এতে তারা সন্তুষ্ট হলো, না অসন্তুষ্ট হলো তা জানতো না।

এই পরিস্থিতিতে ইসলাম এসে সকল অস্পষ্টতা ও অসচ্ছতা ঘুচিয়ে দিলো। মানুষকে তার প্রকৃত উপাস্যের সাথে যুক্ত করে দিলো, তার গুণাবলীর সাথে তাকে পরিচিত করলো, তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কি তা জানিয়ে দিলো এবং কিভাবে তার নৈকট্য লাভ করা যায়, কিভাবে তাঁর করুণা লাভ করা যায়। আযাব থেকে বাঁচা যায় এবং সরল ও সঠিক পথে থাকা যায় তা জানিয় দিলো।

হক বাতিলের চিরন্তন লড়াই ও কাফেরদের পরিণতি

'কাফেররা ছাড়া আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে কেউ বিতর্ক করে না...।' (আয়াত ৪, ৫, ও ৬)

আল্লাহর উল্লেখিত মহান গুণাবলী ও একত্বের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হচ্ছে যে, এসব সত্য এ বিশ্বজগতের প্রতিটা সৃষ্টি অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে এবং কেউই বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। একমাত্র কাফেররাই বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং সৃষ্টির অধম বলে চিহ্নিত হয়। অথচ এই পৃথিবীর তুলনায় তারা পিঁপড়ার চেয়েও ক্ষুদ্র। তারা যখন আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে তর্ক তোলে, তখন তারা থাকে এক কাতারে, আর মহাবিশ্বের তাবৎ সৃষ্টি অপর কাতারে অবস্থানে নেয়। কেননা এই মহাবিশ্ব তার সৃষ্টিকর্তার ও তাঁর অসীম ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়। কাফেররা এ অবস্থান গ্রহণ করে তাদের পরকালের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, চাই তারা যতোই শক্তিধর, যতোই প্রতাপশালী ও যতোই বিত্তশালী হোক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

'অতএব নগরে বন্দরে তাদের ঘোরাফেরা যেন তোমাকে প্রভাবিত না করে,..........।'

কেননা তারা যতোই ঘোরাফেরা করুক, যতোই দর্প দেখাক, তাদের শেষ পরিণাম ধ্বংস অবধারিত। মহান স্রষ্টার সাথে এই দুর্বল মানুষের যদি যুদ্ধ হতো, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াতো এবং যুদ্ধের ফলাফল কী হতো, তা সুবিদিত। ইতিপূর্বে তাদেরই মতো কিছু জাতি ও দল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের যে পরিণতি হয়েছিলো, সেটা প্রত্যেক বিদ্রোহীর জন্যে অবধারিত,

'তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি অস্বীকার করেছিলো..........' (আয়াত ৫)

এটা একটা প্রাচীন ঘটনা। হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই এটা চলে আসছে। এটা এমন এক লড়াই। যা সকল যুগেই সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এ আয়াত থেকে সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ অতীতে প্রত্যেক যুগেই রসূলরা এসেছেন, তাদেরকে অংগীকার করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সবাই একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে।

রসূল আসেন, আর তার জাতির চরম উচ্ছৃংখল লোকেরা তাকে অস্বীকার করে। অথচ এ জন্যে তারা কোনো যুক্তি প্রমাণের ধারও ধারে না। তারা নিছক উচ্ছৃংখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার

আশ্রয় নিয়ে থাকে। এমনকি রসূলকে তারা শারীরিকভাবেও আক্রমণ করতে চেষ্টা করে এবং জনগণের ওপর বাতিলকে চাপিয়ে দেয়, যাতে তা সত্যের ওপর বিজয়ী হয়। ঠিক এই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা হস্তক্ষেপ করেন এবং ভয়াবহ আযাব নাযিল করেন, যার ফলে কাফেররা ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়,

'আমার শাস্তিটা কেমন ছিলো?

বস্তুত শাস্তিটা ছিলো সর্বনাশা, ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ। জাতির ধ্বংসযজ্ঞের যে নিদর্শনাবলী পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে, তা থেকে এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এ সংক্রান্ত জনশ্রুতি থেকেও জানা গেছে যে, আল্লাহর সেই আযাব ছিলো লোমহর্ষক।

এখানেই শাস্তির শেষ নয়। বরং পরকাল পর্যন্তও তা বিস্তৃত থাকে।

'এভাবেই তোমার প্রতিপালকের এ ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়েছিলো যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

বস্তুত আল্লাহর ফয়সালা যখন কারো ওপর কার্যকরী হয়ে যায়, তখন আযাব এসেই যায় এবং যাবতীয় বিতর্কের মীমাংসা হয়ে যায়।

এভাবেই কোরআন সেই চিরন্তন সত্যটাকে চিত্রিত করে। সত্যটা হলো, ঈমান ও কুফরির মাঝে, হক ও বাতিলের মাঝে এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের এবং অন্যায়ভাবে দম্ভকারী স্বৈরাচারীদের মাঝে লড়াই চিরদিনই লেগে থাকবে, কখনো বন্ধ হবে না। এ লড়াই মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে। এ লড়াই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর ময়দান সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও প্রশস্ত। কেননা গোটা সৃষ্টিজগত তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী, নতি স্বীকারকারী ও আত্মসমর্পিত। আর মহান আল্লাহকে যারা মানে না, তারা এই বিশাল সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে। এ অসম লড়াই এর পরিণাম কী তা সবাই জানে। হকপন্থীদের কাতার সুদীর্ঘ ও বাহিনী বিশাল। আর বাতিল পন্থীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তারা দুর্বল, চাই তারা পৃথিবীতে যতোই বুক ফুলিয়ে চলুক এবং যতোই শক্তির বাহাদুরি দেখাক।

হক ও বাতিলের লড়াই সংক্রান্ত এই চিরন্তন সত্য, এর প্রধান পক্ষ ও বিপক্ষ এবং এর কালগত ও স্থানগত অবস্থানের চিত্রটাই কোরআন এঁকে দেখায়, যাতে তা মানুষের মানসপটে স্থায়ী হয় এবং বিশেষভাবে, স্থান ও কাল নির্বিশেষে যারা সত্য ও ঈমানের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত তারা এটা উপলব্ধি করে। উপলব্ধি করতে পারলে তারা স্থান ও কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ বাতিলের দৃশ্যমান শক্তি দেখে ঘাবেড় যাবে না। কেননা এগুলো বাস্তব নয়। বাস্তব হচ্ছে শুধু আল্লাহর কেতাবের বক্তব্য তথা আল্লাহর বক্তব্য। কেননা তিনিই সবচেয়ে সত্যবাদী ও বাস্তববাদী বক্তা এবং সবচেয়ে প্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী।

মোমেনদের জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া

আর উল্লেখিত প্রথম সত্যটার সাথে পরবর্তী আয়াতে এ কথাও যুক্ত হয়েছে যে, আরশ বহনকারী ও আরশের আশপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতারা, যারা সৃষ্টিজগতের ঈমানদার শক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর কাছে ঈমানদার মানুষদের কথা উল্লেখ করে থাকে। তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের ব্যাপারে প্রদত্ত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবী জানায়। কেননা তাদের সাথে মোমেনদের ঈমানভিত্তিক সংহতি, সংযোগ ও সৌহার্দ্য বিদ্যমান,

'যারা আরশ বহন করে ও যারা আরশের আশপাশে থাকে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা পোষণও গুণকীর্তন করে...........।' (আয়াত ৮-৯)

আরশ কী জিনিস আমরা জানি না। এর কোনো ছবিও আমাদের কাছে নেই। যারা আরশকে বহন করে, তারা কিভাবে বহন করে এবং যারা তার আশপাশে থাকে তারাই বা কিভাবে থাকে।

আর যে জিনিস উপলব্ধি করার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের নেই, তার পেছনে ছুটোছুটি করে কোনো লাভ নেই। আর যে বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে অদৃশ্য জ্ঞান দেননি, তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেও কোনো ফায়দা নেই। এ আয়াত ক'টাতে যে তথ্যটা জানানো হয়েছে তা কেবল এতটুকুই যে, আল্লাহর কিছু ঘনিষ্ঠ বান্দা তার 'প্রশংসাসহ তাসবীহ করে থাকে' এবং 'তার প্রতি ঈমান আনে'। কোরআন তাদের ঈমানের বিষয়টা উল্লেখ না করলেও বুঝা যাচ্ছিলো যে, তারা মোমেন। তথাপি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ঈমানদার আদম সন্তানদের সাথে তাদের সম্পর্ক ও সখ্য প্রকাশ করা। এসব ঘনিষ্ঠ বান্দা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর ঈমানদার মানুষদের জন্যে সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা করে। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের জন্যে যেমন সার্বিক কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে, তারাও তদ্রূপ করে। এখানে তাদের শুধু দোয়াটাই তুলে ধরা হচ্ছে না, বরং দোয়া করার আদব ও নিয়ম পদ্ধতিটাও শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে,

'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি দয়া ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছো।'

দোয়ার আগে তারা জানাচ্ছেন যে, তারা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর সেই দয়া ও করুণা কামনা করছেন, যা কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয় এবং কোনো বিশেষ সৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরং সকল সৃষ্টির জন্যে অবারিত এবং সকল সৃষ্টির ওপর পরিব্যাপ্ত। তারা আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করেছেন। তারা আল্লাহর সামনে আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলছেন না এবং কোনো অনধিকার চর্চা করছেন না; বরং আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও দয়ার কাছেই আশ্রয় চাইছেন এবং তারই খানিকটা প্রার্থনা করছেন,

'অতএব, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথে চলেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।'

এখানে যে তাওবা ও ক্ষমার উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে সূরার শুরুতে 'গুনাহ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী' বলে আল্লাহর যে গুণকীর্তন করা হয়েছে তার মিল রয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে যে 'দোযখের আযাব' এর উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে সূরার শুরুতে বর্ণিত 'কঠিন শাস্তিদাতা' শব্দটার মিল রয়েছে।

এরপর ফেরেশতারা তাদের দোয়ায় ক্ষমা ও আযাব থেকে রক্ষা করার আবেদনের পর আরো এক ধাপ এগিয়ে আল্লাহর সৎ বান্দাদের জন্যে জান্নাত ও তার প্রতিশ্রুতি পালনের আবেদন জানান,

'হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাদেরকে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে এবং তাদের সৎ পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তুমি দিয়েছো। নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।'

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, জান্নাতে প্রবেশ একটা বিরাট নেয়ামত ও সাফল্য। সেই সাথে সেখানে যদি সততার বলে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সাহচার্যও পাওয়া যায়, তবে সেটা হবে পৃথক আরো একটা নেয়ামত। এই ঈমান ও সততার বন্ধন ঈমানদারদের সকলের ঐক্যের প্রতীক। এই ঈমানের বন্ধনের কারণেই স্ত্রী পুত্র পরিজনের মধ্যে সম্মিলন ঘটবে। এ বন্ধন না থাকলে তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকবে না, সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এই দোয়ার শেষ বাক্যটা 'নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী' একটা সমাপনী মন্তব্য। এতে শক্তি ও পরাক্রমের দিকে এবং বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এই বিজ্ঞতা দ্বারাই বান্দাদের ওপর শাসন কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

'আর তাদেরকে সকল অসততা ও পাপাচার থেকে রক্ষা করো। যাকে সেদিন পাপাচার থেকে মুক্ত করে ওঠাবেন, তাঁর ওপর তুমি অবশ্যই অনুগ্রহ করবে। বস্তুত এটা একটা বিরাট সাফল্য।'

চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করানোর আবেদন জানানোর পর এই দোয়াটা কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম আশ্রয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেহেতু অসৎ কাজ ও পাপ কাজ আখেরাতে মানুষের সর্বনাশ ঘটায়, সেহেতু আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদেরকে পাপকাজ থেকে বিরত ও মুক্ত রাখেন, তখন তার কুফল ও অশুভ পরিণাম থেকেও তাকে রক্ষা করেন। তাই সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এটা একটা, রহমতরূপে গন্য হয়। আর এটা সাফল্য ও সৌভাগ্যেরও সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সুতরাং এ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিছক পাপাচার থেকে রক্ষা পাওয়াও একটা বিরাট ব্যাপার।

দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণতি

একদিকে যখন আরশ বহনকারী ও আরশের আশপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের ঈমানদার ভাইদের জন্যে এই দোয়া করা হয়। অন্যদিকে তখন কাফেরদেরকে আমরা এমন শোচনীয় অবস্থায় পতিত দেখতে পাই, যখন প্রত্যেক প্রাণী সাহায্যকারী কামনা করে, অথচ সাহায্যকারীর কোনো পাত্তা থাকে না। এইসব কাফেরের সাথে অন্য সকলের ও সকল সৃষ্টির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন তাদেরকে চারদিক থেকে অপমানজনকভাবে ধমক দিয়ে ডাকা হবে। দম্ভ ও অহংকারের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে আসার পর তাদেরকে সহসাই এই অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাদের সকল আশা সেদিন নিস্ফল হয়ে যাবে,

'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে ডেকে বলা হবে' (আয়াত ১০, ১১ ও ১২)

'আল মাক্‌তু' হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রার ক্ষোভ বা অসন্তোষ। কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে চারদিক থেকে সমস্বরে ডেকে বলা হবে যে, যেদিন তোমাদেরকে ঈমানের আহ্বান জানানো হচ্ছিলো, আর তোমরা তা অগ্রাহ্য করছিলে, সেদিন তোমাদের ওপর আল্লাহর যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিলো, সেটা তোমাদের ওপর তোমরা নিজেরা আজ যে ক্ষোভ ও অনুশোচনা প্রকাশ করছো, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী তীব্র ছিলো। কেয়ামতের সেই ভয়াবহ পরিবেশে কাফেরদের এই অনুশোচনা এতো মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হবে যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তখন তাদের সকল ধোঁকাবাজি ও বিভ্রান্তির পর্দা সরে যাবে এবং তারা বুঝতে পারবে যে, আজকে কেবল আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, তাই সেদিকেই তারা মনোনিবেশ করবে ,

'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দিয়েছো। আমরা আমাদের গুনাহর কথা স্বীকার করেছি। এখন বের হবার কি কোনো পথ আছে?'

এ হচ্ছে চরম দুদর্শাগ্রস্ত, হতাশ ও অপমানিত ব্যক্তির উক্তি, 'হে আমাদের প্রতিপালক।' অথচ দুনিয়ায় থাকতে এই প্রতিপালককে তারা চিনতোইনা এবং অস্বীকার করতো।

'দু'বার জীবন দিয়েছ' কথাটার অর্থ হলো, একবার প্রাণহীন ভ্রুণে প্রাণ ফুঁকে দিয়ে জীবন দিয়েছ, আর একবার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করে এই কেয়ামতের ময়দানে সমবেত করেছো।

আমরা এখন যে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আছি, তা থেকে বের করার ক্ষমতা তোমার আছে। আমরা তো আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি। 'বের হবার কি কোনো পথ আছে' কথাটার ভেতরে স্পষ্টতই তীব্র হতাশা ফুটে উঠেছে।

এই হতাশাব্যঞ্জক শোচনীয় পরিস্থিতিতে তাদেরকে জানানো হচ্ছে এই শোচনীয় পরিণতির কারণ কী'

'তোমাদের এ অবস্থার কারণ হলো, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে শরীক করা হতো, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। সুতরাং মহামহিম সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তায়ালাই আজ এর ফয়সালা করবেন।'

অর্থাৎ আল্লাহর কল্পিত শরীকদের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস এবং তাঁর একত্বের প্রতি তোমাদের অবিশ্বাস তোমাদের এই শোচনীয় অবমাননাকর পরিস্থিতিকে টেনে এনেছে। 'অতএব মহামহিম সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তায়ালাই আজ এর ফয়সালা করবেন।' 'আল-আলী' ও 'আল-কাবীর' আল্লাহর এই দুটো গুণবাচক বিশেষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটো গুণই ফায়সালা করার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা আল-আলী অর্থ সব কিছুর উর্ধে যিনি। আর 'আল-কাবীর' অর্থ সবকিছুর চেয়ে বড় যিনি। এই দুটো গুণই চূড়ান্ত ফয়সালা ও মীমাংসার জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা

প্রসংগক্রমে পরবর্তী কটা আয়াতে আল্লাহর আরো কিছু গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। সেই সাথে মোমেনদেরকে আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, কেয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হবেন সবকিছুর মালিক ও সর্বময় কর্তা,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তোমাদেরক নিজের নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করেন....।' (আয়াত ১৩-১৮)

'তিনি নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদেরকে দেখান...................।'

আল্লাহর নিদর্শনাবলী জগতের প্রত্যেকটা জিনিসেই দৃশ্যমান। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, রাত দিন, মেঘ বৃষ্টি, এবং বজ্রবিদ্যুতের ন্যায় বড় বড় জিনিসে যেমন বিদ্যমান, তেমনি ফুল, পাতা, অণু পরামাণু ও জীবকোষের ন্যায় ছোট ছোট জিনিসেও নিদর্শন বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যকটাতেই অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে। এই আলৌকিক নিদর্শনের মাহাত্ম্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন মানুষ তার অনুকরণের চেষ্টা চালায়। নতুন সৃষ্টি করা তো তার সাধ্যাতীত। তাই অনুকরণই ভরসা। কিন্তু পরিপূর্ণ ও নির্ভুল অনুকরণও তার অসাধ্য। মহান আল্লাহর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টির হুবহু অনুকরণ তার পক্ষে শুধু সাধ্যাতীত নয় বরং কল্পনারও অতীত।

'আর তোমাদের ওপর আকাশ থেকে জীবিকা অবতীর্ণ করে।'

আকাশ থেকে অবতীর্ণ জীবিকার মধ্যে মানুষ এ যাবত যা কিছু জানতে পেরেছে, তার একটা হলো বৃষ্টি। এই বৃষ্টি পৃথিবীতে জীবনের উৎস এবং খাদ্য ও পানীয়ের মূল উপাদান। বৃষ্টি ছাড়া আরো বহু জিনিস রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে। এর মধ্যে একটা হলো আলোকরশ্মী, যা না থাকলে ভূপৃষ্ঠে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না। নবী ও রসূলদের কাছে অবতীর্ণ কেতাব বা ওহীও সম্ভবত আকাশ থেকে অবতীর্ণ জীবিকার আওতাভুক্ত, যা মানবজাতিকে নির্ভুল ও নিরাপদ পথে বহাল রাখে এবং আল্লাহর সাথে যুক্ত জীবন ও তার নির্ভুল নিয়ম-বিধির সন্ধান দেয়।

'একমাত্র বিনয়ী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ স্মরণ করে না।'

বস্তুত আল্লাহমুখী বিনম্র ও বিনয়ী মানুষ তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা ও তাঁর নিদর্শনাবলীর কথা স্মরণ করে, আর পাষাণ হৃদয়ের মানুষ তা ভুলে যায়। বিনয় মানুষকে নিদর্শনাবলী স্মরণ করতে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এর উল্লেখের পর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে এক আল্লাহর এবাদাত ও একনিষ্ঠ আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং এতে কাফেরদের পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা না করার আদেশ দিয়েছেন,

'অতএব এক আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকো, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

বস্তুত মুসলমানরা আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্য ও একক এবাদাত করুক এটা অমুসলিমরা কখনো পছন্দ করে না। মুসলমানরা তাদের সাথে যতোই কোমল ও বিনম্র আচরণ করুক, তাতেও তারা সন্তুষ্ট হবে বলে আশা করা যায় না। কাজেই মুসলমানদেরকে আল্লাহর এবাদাত ও তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। কাফেরদের সন্তোষ অসন্তোষের তোয়াক্কা করা উচিত নয়। কেননা তারা কোনোদিনও সন্তুষ্ট হবে না।

এরপর আল্লাহর এমন কয়েকটা গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ এবাদাত ও আনুগত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ-

'তিনি উচ্চমর্যাদাশালী, আরশের অধিপতি। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছে করেন নিজের নির্দেশ পাঠান,'

অর্থাৎ একমাত্র তিনিই উচ্চমর্যাদাশালী এবং সর্বোচ্চ আরশের মালিক। তিনিই তার সেই বিধান তাঁর মনোনীত বান্দার কাছে পাঠান, যা অন্তর ও আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করে। এটা আসলে রেসালাত ও ওহীর দিকে ইংগিত। তবে যে বাচনভংগী এখানে অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে ওহীর সুষ্ঠু পরিচয় নিহিত রয়েছে। সেটা হলো, ওহী মানবজাতির আত্মা ও জীবনী শক্তির উৎস, আর এই ওহী নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয় ওপর থেকে। এই কথাগুলোর সবই আল্লাহর উল্লেখিত গুণ 'আল-আলী' ও 'আল কাবীর' (বড় ও উচ্চ)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এরপর বলা হচ্ছে যে, ওহী নাযিল করার জন্যে যে বান্দাদেরকে মনোনীত করা হয়, তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সতর্ক করা।

'যেন সে মহামিলনের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।'

এই দিন সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে। পৃথিবীতে তারা যা কিছু করেছে, তাও প্রকাশিত হবে, মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও সমস্ত সৃষ্টি সেদিন একত্রিত হবে এবং মহান, আল্লাহর সামনে হিসাব দিতে জমায়েত হবে। বস্তুত 'তালাক' শব্দের সব অর্থের আলোকেই এটা সম্মেলন ও সাক্ষাতের দিন।

তাছাড়া এটা আত্মপ্রকাশেরও দিন। কোনো পর্দা, ঢাকনা, বা গোপনীয়তা ছাড়াই এদিন সবাই আত্মপ্রকাশ করবে।

'সেদিন তারা সবাই আত্মপ্রকাশ করবে। আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।'

বস্তুত কোনো সময়ে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো কিছু আল্লাহর চোখের আড়াল হয় না। এ দিন ছাড়া অন্যান্য দিন কেউ ভাবতে পারে যে, তাকে ও তার কাজ কর্মকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু কেয়ামতের দিন কেউ এ রকম ভাববে না। সবাই ভাববে যে, আজ আর কোনো কিছু লুকানোর উপায় নেই। সবকিছুই প্রকাশিত। এমনকি চিন্তা ও কল্পনার পর্দাও সরে যাবে।

সেদিন বড় বড় অহংকারীরাও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করবে এবং সবাই বিনয়ী বান্দা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালাই হবেন একমাত্র সর্বময় শাসক ও দন্ডমুন্ডের মালিক। তিনি সব সময়ই একক সর্বময় কর্তা। তবে কেয়ামতের দিন তার এই কর্তৃত্ব সবার চোখের সামনে সচ্ছ স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। সকল নাস্তিক ও সকল বলদর্পী এটা বুঝবে। সবাই নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা গুরুগম্ভীর আওয়ায ধ্বনিত হবে যে,

'আজ রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।'

নিজেই প্রশ্ন করবেন আর নিজেই উত্তর দেবেন। কেননা সেদিন তিনি ছাড়া আর কোথাও কোনো প্রশ্নকারী ও উত্তর দাতা থাকবে না।

'আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে। আজ কোনো অবিচার হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'

অর্থাৎ আজ ন্যায্য কর্মফলের দিন। আজ সুবিচারের দিন। আজ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন। কাউকে কোনো সময়ও দেয়া হবে না, কারো বিচার বিলম্বিতও করা হবে না।

এক ভয়াল গুরুগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করবে। সকল সৃষ্টি বিনয়াবনত হয়ে শুনবে। এর ভেতর দিয়েই বিচারের কাজ সমাধা হয়ে যাবে এবং হিসাব নিকাশের দফতর বন্ধ করা হবে।

'কেয়ামতের মাঠের এ পরিবেশটা সূরার শুরুতে আল্লাহর ওহী নিয়ে বিতর্ককারীদের সম্পর্কে উচ্চারিত, 'সুতরাং দেশে তাদের বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে না দেয়,' এই উক্তিটার সাথে সংগতিপূর্ণ, কেননা কেয়ামতের ময়দানের এ পরিবেশ সমস্ত দর্পিত বিচরণ, দাম্ভিকতা, অহংকার ও ভোগবিলাসের সাধ মিটিয়ে দেবে।

পরবর্তী আয়াতগুলোতেও রসূল (স.)-কে উক্ত কেয়ামতের দিন সম্পর্কে জনগণকে হুশিয়ার করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ দিনের একটা দৃশ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে কোনো সম্বোধন না করেই নিছক বর্ণনার আকারে তা তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ১৮, ১৯ ও ২০)

'তুমি তাদেরকে কেয়ামত সম্পর্কে সাবধান করো.............।'

'আযেফা' শব্দের অর্থ হচ্ছে আসন্ন ও নিকটবর্তী। এ দ্বারা কেয়মতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতে যে শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে এমন একটা ছবি আঁকা হয়েছে, যার আগমন আসন্ন এবং যার আগমনের আতংকে সবার হৃৎপিন্ড কণ্ঠনালীতে উপনীত হবে। আতংকে সবার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে। এই শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা তাদেরকে উৎকণ্ঠিত করবে। তাদের বুককে ভারী করে তুলবে। এ অবস্থায় তাদের প্রতি স্নেহ ও সমবেদনা প্রকাশ করে এবং সুপারিশ করে এমন কোনো লোক থাকবে না।

অথচ সেদিন তারা সবাই হাযির হবে। আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গুপ্ত আকবে না। এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাকারী চোখের চোরা চাহনি এবং মনের একান্ত গোপন কথাও আল্লাহর অজানা থাকে না।

'তিনি চোখের চোরাচাহনি ও বুকের একান্ত গুপ্ত কথাও জানেন।

বিশ্বাসঘাতক চোখ তার বিশ্বাসঘাতকতাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তবে তা আল্লাহর দৃষ্টির আড়াল করতে পারে না। মানুষ তার অন্তরে অনেক কথা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সবকিছুই উন্মুক্ত।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কেয়ামতের দিন সঠিক বিচার করবেন। মোশরেকদের কল্পিত উপাস্যদের তখন কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না, কোনো শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার করেন। আর যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করে ডাকে, তারা কোনো ধরনের বিচারই করতে পারে না।'

আল্লাহ যে ন্যায়বিচার করেন, তা করেন নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণে এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শ্রবণের ভিত্তিতে, তাই তিনি কারো ওপর যুলুম করেন না এবং কোনো কিছুই ভুলে যান না। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن
قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت
تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا
قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ
رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

রুকু ৩

২১. এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে ঘোরাফেরা করে না? (ঘুরলে) অতপর তারা দেখতে পেতো এদের আগের লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে (হোক) এবং যেসব কীর্তি তারা (এ) দুনিয়ায় রেখে গেছে (সে দৃষ্টিতে হোক), যমীনে তারা ছিলো (এদের চাইতে) অনেক বেশী প্রবল, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করলেন; আল্লাহ তায়ালার গযব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিলো না। ২২. এটা এ কারণে, তাদের কাছে (সুস্পষ্ট) নিদর্শনসহ আল্লাহ তায়ালার রসূলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অস্বীকার করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন, তিনি খুব শক্তিশালী, শাস্তিদানেও তিনি কঠোর। ২৩. আমি আমার আয়াত ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ মূসাকে পাঠিয়েছিলাম, ২৪. (তাকে পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতপর ওরা বললো, এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী যাদুকর। ২৫. অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য (দ্বীন) নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন তারা বললো, যারা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং (শুধু) তাদের কন্যাদেরই জীবিত রাখো; (কিন্তু) কাফেরদের ষড়যন্ত্র (তো) ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ২৬. (এক পর্যায়ে) ফেরাউন (তার পারিষদদের) বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও– আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলি, ডাকুক সে তার রবকে, আমি আশংকা করছি সে তোমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাই পাল্টে দেবে এবং (এ) যমীনেও সে (নানারকমের) বিপর্যয় ঘটাবে।

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

২৭. মূসা বললো, প্রতিটি উদ্ধত ব্যক্তি, যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না, আমি তার (অনিষ্ট) থেকে আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি।

রুকু ৪

২৮. একজন মোমেন ব্যক্তি– যে ছিলো (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক (এবং) যে ব্যক্তি নিজের ঈমান (এদ্দিন পর্যন্ত) গোপন করে আসছিলো, (সব শুনে) বললো (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে (শুধু এ জন্যেই) হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে আমার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (অথচ) সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার (এ) মিথ্যা তো তার ওপরই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে (আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু না কিছু তো এসে তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী। ২৯. (সে বললো,) হে আমার জাতির লোকেরা, এ যমীনে আজ তোমরা হচ্ছো ক্ষমতাবান, কিন্তু (আগামীকাল) আমাদের ওপর (আযাব) এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর (পাঠানো) দুর্যোগ থেকে সাহায্য করবে; ফেরাউন বললো, আমি তো (এ ব্যাপারে) তোমাদের সে রায়ই দেবো, যেটা আমি (ঠিক হিসেবে) দেখবো, আমি তো তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাবো না। ৩০. (যে ব্যক্তি গোপনে) ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের মতোই (আযাবের) দিনের আশংকা করছি,

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ

مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا

جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ

ءَايَٰتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ

ابْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ الْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ السَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ

৩১. (তোমাদের অবস্থা এমন যেন না হয়–) যেমনটি (হয়েছিলো) নূহের জাতি, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরে যারা এসেছিলো (তাদের সবার); আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করতে চান না। ৩২. হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক ডাকের (কেয়ামত) দিবসের (আযাবের) আশংকা করি, ৩৩. সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউই থাকবে না, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারীই থাকে না। ৩৪. এর আগে তোমাদের কাছে (নবী) ইউসুফ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যা কিছু বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে (শুধু) সন্দেহই পোষণ করেছো; এমনকি যখন সে মরে গেলো তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ তায়ালা কখনো আর কোনো রসূল পাঠাবেন না; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে) সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের গোমরাহ করে থাকেন, ৩৫. যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়; তারা আল্লাহ তায়ালা ও ঈমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষের কারণ বলে বিবেচিত; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দেন। ৩৬. ফেরাউন (একদিন উযীর হামানকে) বললো, হে হামান, আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে করে আমি (আকাশে চড়ার) কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি, ৩৭. (আকাশে চড়ার অবলম্বন এমন হবে) যেন আমি মূসার মাবুদকে (তা দিয়ে উঁকি মেরে) দেখে আসতে

اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ، وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ
عَنِ السَّبِيْلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز
وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِىْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى
النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ
مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا
تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ

পারি, অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি; এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজটি শোভনীয় (প্রতীয়মান) করা হলো এবং তাকে (সত্য পথ থেকে) নিবৃত্ত করা হলো; (মূলত) ফেরাউনের ষড়যন্ত্র (তার নিজের) ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

রুকু ৫

৩৮. যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের (একটা) সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি, ৩৯. হে আমার সম্প্রদায়, (তোমাদের) এ দুনিয়ার জীবন (কয়েকটি দিনের) উপভোগের বস্তু মাত্র, স্থায়ী নিবাস তো হচ্ছে আখেরাত! ৪০. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে পরিমাণের চাইতে বেশী প্রতিফল দেয়া হবে না , পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কেউই নেক কাজ করবে সে-ই মোমেন (হিসেবে গণ্য হবে হাঁ,), এমন ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রেযেক দেয়া হবে। ৪১. হে আমার জাতি, এ কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে! ৪২. তোমরা আমাকে একথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছো যেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং তাঁর (সাথে) অন্য কাউকে শরীক করি, যার সমর্থনে আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, (পক্ষান্তরে) আমি তোমাদের আহ্বান করছি সেই আল্লাহ তায়ালার দিকে, যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। ৪৩. যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছো, দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা (কোনো মানুষের জন্যেই) শোভনীয় নয়, (তেমনি) পরকালে তো (মোটেই) নয়, কেননা আমাদের সবাইকে তো আল্লাহ তায়ালার দিকেই

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ

لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَاهُ اللَّهُ

سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ

عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ

النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ

الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ

يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

ফিরে যেতে হবে, (সত্যি কথা হচ্ছে), যারা সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী। ৪৪. (আজ) আমি তোমাদের যা কিছু বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, আর আমি তো আমার কাজকর্ম (বিষয় আসয়) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সোপর্দ করছি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ নযর রাখেন। ৪৫. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিলো, ৪৬. (জাহান্নামের) আগুন, যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হাযির করা হবে, আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফেরাউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো। ৪৭. যখন এ লোকেরা জাহান্নামে বসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, অতপর (যারা) দুর্বল (ছিলো) তারা এমন সব লোকদের বলবে, যারা ছিলো অহংকারী– আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাছ থেকে নিবারণ করতে পারবে? ৪৮. অহংকারীরা (এর জবাবে) বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো তার ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন। ৪৯. (তারপর) যারা জাহান্নামে পড়ে থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের (উদ্দেশ করে) বলবে, তোমরা (অন্তত আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো, তিনি যেন (কোনো না) কোনো একটি দিন আমাদের ওপর থেকে আযাব কম করে দেন। ৫০. তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে, তারা বলবে হ্যাঁ,

بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

(এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি, জাহান্নামের যারা প্রহরী) তারা বলবে, (তাহলে তোমাদের) দোয়া তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!

রুকু ৬

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ বৈষয়িক দুনিয়ায় (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সেদিনও সাহায্য করবো) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে, ৫২. সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি কোনোই উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস। ৫৩. আমি মূসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদেরও (আমার) কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম, ৫৪. (তা ছিলো) জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও (সুস্পষ্ট) উপদেশ। ৫৫. অতপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

তাফসীর
আয়াত ২১-৫৫

ইতিপূর্বে আমি সূরার এ অংশটার সংক্ষিপ্তসার দিয়েছি। এ অংশের বিস্তারিত তাফসীর আলোচনা করার আগে যে কথা বলা দরকার তা হলো, এ অংশটা সূরার সার্বিক আলোচ্য বিষয়ের সাথে একান্ত সংগতিপূর্ণ। এমনকি এ অংশের ভাষা ও বাচনভংগীর সাথেও অনেকাংশে সূরার সার্বিক ভাষা ও বাচনভংগীর সাথে মিল রয়েছে। ফেরাউনের অনুসারীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ঈমান গোপন করে রেখেছিলো, তার মুখ দিয়ে এমনসব বক্তব্য উচ্চারণ করানো হয়েছে যা সূরার পূর্ববর্তী অংশেও ছিলো। সে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ওপর আগত দিনের ন্যায় বিপজ্জনক দিন আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে। অনুরূপভাবে তাদেরকে কেয়ামত সম্পর্কেও সাবধান করে, যার কিছু কিছু দৃশ্য সূরার শুরুতে তুলে ধরা হয়েছে। যারা

আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে তর্ক করে, তাদের সম্পর্কে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ও মোমেনদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করে, যা সূরার প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে। এরপর তুলে ধরা হয়েছে দোযখে তাদের শোচনীয় অবমাননাকর আযাবের দৃশ্য। তখন তারা দোয়া করবে, অথচ সে দোয়া কবুল হবে না। সূরার পূর্ববর্তী অংশেও এ ধরনের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এ ধরনের আরো অনেক বক্তব্য এসেছে সূরার এ অংশে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানভিত্তিক যুক্তি ও মোমেনদের যুক্তি এক ও অভিন্ন। কেননা একই সত্য উৎস থেকে তা উৎসারিত। এ বৈশিষ্ট্যটাই সমগ্র সূরাকে সমন্বিত করেছে এবং তাকে একটা একীভূত রূপ দান করেছে। কোরআনের সব কটা সূরাতেই এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মূসা ও ফেরাউনের সংঘাত

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না........?' (আয়াত ২১-২২)

হযরত মূসার (আ.) কাহিনী ও তার আগে আলোচিত সূরার অংশটা আরবের মোশরেকদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওহী নিয়ে তর্ক করতো, তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীকালের ইতিহাস ও তা থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা স্মরণ করে দিচ্ছে এবং তাদেরকে দেশ-বিদেশ সফর করে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসস্তূপ দেখে আসতে বলছে। কেননা আজ যারা ইসলামের দাওয়াতকে অস্বীকার করছে, তারা তাদেরই উত্তরসূরী। পূর্ববর্তীরা এই উত্তরসূরীদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও প্রতাপশালী ছিলো। তথাপি তারা আল্লাহর আযাবের সামনে ছিলো দুর্বল ও অসহায়। তাদের পাপাচার তাদেরকে আসল শক্তির উৎস থেকে হটিয়ে দিয়েছিলো তাদের ওপর ঈমানী শক্তিগুলো মহান আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিজয়ী হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপাচারের দায়ে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। সুতরাং তিনি ছাড়া তাদেরকে রক্ষা করার সাধ্য কারো ছিলো না। বস্তুত নিজের ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হওয়া এবং ঈমানদার, সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠদের দলভুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। পক্ষান্তরে রসূলদেরকে ও তাদের আনীত অকাট্য প্রমাণাদীকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

'এর কারণ এই যে, তাদের রসূলরা যখনই অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে আসতো, অমনি তারা তাদেরকে অস্বীকার করতো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি কঠিন শাস্তিদাতা ও শক্তিশালী।' (আয়াত ২২)

এই সার্বিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর পূর্ববর্তীদের কিছু নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। তারা ছিলো অধিকতর শক্তিশালী, প্রভাবশালী। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপের দায়ে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। এরা হচ্ছে ফেরাউন, কারূণ, হামান ও তাদের সহযোগী অন্যান্য স্বৈরাচারী ও একনায়ক।

মূসা (আ.)-এর কাহিনীর এ অংশটা একাধিক পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বটায় রয়েছে ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে তাঁর রেসালাত উপস্থাপন। এর শেষ পর্বটা হলো আখেরাতের জাহান্নামে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের ঝগড়া-বিবাদের দৃশ্য সম্বলিত। এটা এক দীর্ঘ সফর। তবে আয়াতগুলোতে এই দীর্ঘ সফরের কিছু কিছু বাছাই করা অংশ তুলে ধরা হয়েছে। আর এগুলো দ্বারাই সূরার এ অংশটার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

'আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ফেরাউন হামান ও কারূণের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা বলেছিলো, মূসা একজন মিথ্যুক যাদুকর।'

এ হচ্ছে প্রথম সাক্ষাতের পটভূমি। মূসা (আ.) ও তার সাথে আল্লাহর নিদর্শনাবলী, তার সাথে বিদ্যমান সত্যের প্রভাবে সৃষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আর ফেরাউন, কারুন, হামান এবং তাদের সাথে তাদের ভূয়া বাতিল শক্তি, তাদের দৃশ্যমান ক্ষমতা ও প্রতাপ, তাদের সেই ক্ষমতার কেন্দ্র, যা নিয়ে তারা শক্তিশালী সত্যের মোকাবেলা করতে ভয় পায়। একারণেই তারা সত্যকে পরাভূত করার জন্যে ভুয়া যুক্তির ভিত্তিতে তর্কে লিপ্ত হয়। তাই তারা বলে, মূসা মিথ্যুক যাদুকর।

এই বিতর্কের পর কী ঘটেছিলো, আয়াতে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি। যাদুকরদের সাথে সংঘটিত প্রতিযোগিতা যাদুকরদের ঈমান আনয়ন এবং তাদের যাদুর পরাজয়ের কাহিনী এখানে উহ্য রাখা হয়েছে। আর এসব ঘটনার পরবর্তী ভূমিকাটা তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ২৫)

'অতপর যখন মূসা আমার কাছ থেকে অকাট্য সত্য নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন ফেরাউন ও তার সহযোগীরা আদেশ জারী করলো যে, যারা মূসার ওপর ঈমান এনেছে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করো এবং তাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখো।' অতপর আয়াত শেষ করার আগে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে,

'কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

বস্তুত এ হচ্ছে চরম গোয়ার্তুমি বক্তব্য। যখনই বাতিল শক্তি অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সামনে অসহায় হয়ে যায় ও হেরে যায় তখন এ ধরনের বক্তব্যের আশ্রয় নেয়। কেননা সত্য সুস্পষ্ট, সচ্ছ, নির্ভেজাল ও জোরালো হওয়ার কারণে তা বিজয়ী হয়ে যাবে বলে তারা আশংকা করে। তারা ভয় পায় যে, মানুষের অকৃত্রিম স্বভাব প্রকৃতিকে আহ্বান জানানোর কারণে মানুষ এ আহ্বান গ্রহণ করতে পারে। যেমন যাদুকররা গ্রহণ করেছে। অথচ ফেরাউন তাদেরকে মূসার ওপর বিজয়ী হবার উদ্দেশ্যেই এনেছিলো। কিন্তু ফেরাউনকে হতবাক করে দিয়ে যাদুকররা প্রথম ঈমান আনয়ন করলো, ওদিকে ফেরাউন, কারুন ও হামান বললো।

'মূসার ওপর যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুরুষদের হত্যা করো আর মহিলাদের বাঁচিয়ে রাখো।

হযরত মূসার জন্মের প্রাক্কালে ফেরাউন এ ধরনের আদেশ জারী করেছিলো। এই আদেশ জারী করার পর যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে দু'রকমের সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রথমত, যে ফেরাউন এ আদেশ জারী করেছিলো, সে হয়তো মারা গিয়েছিলো এবং তার ছেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলো। কিন্তু নতুন শাসকের আমলে আদেশটা কার্যকরী হয়নি। এই অবস্থার ভেতরেই হযরত মূসা এসে নতুন ফেরাউনের সম্মুখীন হয়েছেন। এ ফেরাউন যুবরাজ থাকা অবস্থায়ই হযরত মূসাকে চিনতো। তাকে যে রাজ প্রাসাদেই লালন-পালন করা হতো, তাও যুবরাজ জানতো। সে বনী ইসরাঈলের পুরুষ সন্তাদেরকে হত্যা করা ও মেয়ে সন্তাদেরকে সংরক্ষণ করার প্রথম আদেশের কথাও জানতো। তাই তার সভাসদরা তাকে এই আদেশটার দিকেই ইংগিত করছিলো এবং মূসার ওপর যারা ঈমান এনেছে, কেবল তাদের সন্তানদের মধ্যেই আদেশটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পরামর্শ দিলো। চাই তারা যাদুকর হোক, অথবা বনী ইসরাঈল হোক। যারা সংখ্যালঘু হয়েও ফেরাউন ও তার দলবলের ভয়ে চুপিসারে তার প্রতি ঈমান এনেছিলো। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, সে ছিলো প্রথম ফেরাউন, যে মূসাকে নিজের পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলো এবং সে এই সময়েও সিংসাসনে বহাল রয়েছে। হয়তো তার এ আদেশটা কিছুদিন পর আর কার্যকর থাকেনি, অথবা তার তেজ কমে যাওয়ার পর তার বাস্তবায়ন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো

সভাসদরা হয়তো ওটাকে পুনরায় বলবত করার পরামর্শ দিচ্ছিলো এবং শুধু মূসার ওপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে এর আওতাধীন করেছিলো, যাতে তারা ভয় পায়।

ওদিকে ফেরাউন সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করছিলো বলে মনে হয়। আবার এও হতে পারে যে, সলাপরামর্শের সময় সে একটা অতিরিক্ত প্রস্তাব আকারে এটা পেশ করেছিলো। সেটা ছিলো, স্বয়ং মূসাকেই হত্যা করে পথের কাটা দূর করা।

'আর ফেরাউন বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, মূসাকে হত্যা করে ফেলি। সে তার প্রভুকে ডাকুক। আমার আশংকা, সে তোমাদের গোটা বিধানকেই পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, কিংবা দেশময় অরাজকতা ছড়িয়ে দিতে পারে।'

ফেরাউনের 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্য করে ফেলি' এই কথা থেকে বুঝা যায় যে, তার এই অভিমত কিছুটা বিরোধিতা ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলো অন্যান্য পরামর্শদাতার পক্ষ থেকে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যেতে পারে যে, কেউ হয়তো বলে থাকবে, মূসাকে হত্যা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এতে বরঞ্চ জনসাধারণের কাছে তার মর্যাদা বেড়ে যেতে পারে এবং তাকে শহীদরূপে বিবেচনা করা হতে পারে। আর তার প্রতি ও তার আনীত ধর্মের প্রতি জনগণের আবেগ উদ্দীপনাও বেড়ে যেতে পারে। বিশেষত একটা প্রকাশ্য জনসমাবেশের ভেতরে যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলাম গ্রহণের কারণ প্রকাশ করার পর পরিবেশটা খুবই স্পর্শকাতর হয়ে গেছে। অথচ এই যাদুকরদের আনাই হয়েছিলো মূসা (আ.)-এর দাওয়াত ও আন্দোলন বাতিল সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে। এমনও হতে পারে যে, ফেরাউনের কোনো কোনো উপদেষ্টা এই ভেবে শংকা বোধ করছিলো যে, মূসাকে হত্যা করা হলে মূসার খোদা তার প্রতিশোধ নেবে এবং তাদের পাকড়াও করবে। এটাও অসম্ভব নয়। কারণ পৌত্তলিকেরা বহু উপাস্যে বিশ্বাস করতো, তাদের পক্ষে এরূপ ধারণা করা খুবই সহজ যে, মূসার ওপর কেউ অত্যাচার করলে মূসার এমন কোনো দেবতা বা খোদা থাকতে পারে যে তার প্রতিশোধ নেবে। হয়তো এ ধরনের আশংকা কেউ ব্যক্ত করেছিলো এবং তার জবাবেই ফেরাউন বলেছিলো, 'সে তার প্রভুকে ডাকুক।' এটাও অসম্ভব নয় যে, ফেরাউনের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাটা নিছক ধৃষ্টতা ও স্পর্ধার প্রতীক। আর এর প্রতিফল সে শেষ মুহূর্তে পেয়েছিলো। কিছু পরেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

হযরত মূসাকে হত্যা করার সপক্ষে ফেরাউন যে যুক্তি দিয়েছিলো, তা নিয়ে একটু ভেবে দেখা হয়তো কৌতূহলোদ্দীপক হবে। সে বলেছিলো,

'আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাই পাল্টে ফেলবে, অথবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াবে।'

'বিপথগামী ও পৌত্তলিক ফেরাউন আল্লাহর রসূল হযরত মূসা সম্পর্কে দেশবাসীর ধর্ম জীবন ব্যবস্থা পাল্টে দেয়া ও দেশময় নৈরাজ্য ছড়ানোর অভিযোগ তুলবে, এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কী হতে পারে?

পৃথিবীর প্রত্যেক ফ্যাসিবাদী ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী একনায়ক এবং মানবরচিত জীবন ব্যবস্থার ধারক বাহকরা চিরকাল সত্যের আহ্বায়ক ও সংস্কারক সম্পর্কে ঠিক এ ধরনের কথাই বলে থাকে। নির্মল ও নিঁখুত সত্যের সামনে কুৎসিত ও কদাকার বাতিল ঠিক এ রকম কথাই বলে থাকে। নোংরা ধাপ্পাবাজ শক্তি প্রশান্ত ঈমানের সামনে অবিকল এ ধরনের কথাই বলার ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে থাকে।

হক ও বাতিলের মাঝে, ঈমান ও কুফরির মাঝে এবং সততা ও অসততার মাঝে যখনই সংঘাত বাধে, তখনই এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে, তা স্থান ও কালের যতো ব্যবধানই থাকনা কেন। এ ব্যাপারটা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে এবং বারবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

ওদিকে মূসা (আ.) সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীরা চিরদিনই নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে থাকে।

'মূসা বললো, আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর কাছে এমন প্রত্যেক অহংকারীর কবল থেকে আশ্রয় চাই, যে হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না।'

হযরত মূসা এ কথাটা বলেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন, আর নিজের যাবতীয় বিষয় সেই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। যিনি সকল অহংকারীর ওপর প্রতাপশালী যিনি সকল স্বৈরাচারকে দমন করেন এবং যিনি তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। এখানে হযরত মূসা আল্লাহকে তার ও তাদের প্রভু আখ্যায়িত করে সুকৌশলে আল্লাহর একত্বের ইংগিত দিলেন। হুমকি ও শাসানির এই ভয়াল পরিবেশেও সেটা ভোলেননি এবং ত্যাগ করেননি। অনুরূপভাবে তিনি অহংকারীর কেয়ামতে অবিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেছেন। কেননা কোনো মানুষ যতক্ষণ কেয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে, ততোক্ষণ সে অহংকারী হতে পারে না। কেননা সেদিন তার সম্ভাব্য বিপদ ও লাঞ্ছনার কথা এবং শক্তিহীনতা ও বন্ধুহীনতার কথা ভেবে সে বিনয়ী না হয়ে পারে না।

স্বৈরাচারী শাষকের সামনে মোমেনের বলিষ্ঠ ভাষণ

এই পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করলো ফেরাউনের অনুসারীদের মধ্য থেকে একব্যক্তি, যার অন্তরে সত্যপ্রেম ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু সে নিজের ঈমানকে লুকিয়ে রেখেছিলো। সে মূসার পক্ষে কথা বললো, তার লোকদেরকে তার ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করলো। সে ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে বিভিন্ন পন্থায় উপদেশ দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে ও বুঝ দিয়ে তাদের অন্তরে সংবেদনশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করলো।

'ফেরাউনের বংশের একব্যক্তি যে মোমেন ছিলো এবং নিজের ঈমান গোপন রেখেছিলো, সে বললো, তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এ জন্যেই হত্যা করবে যে, সে আমার প্রভু আল্লাহ' এই কথা বলে?..........।' (আয়াত ২৮-৩৫)

কূটচক্রী ফেরাউন ও তার সভাসদদের সাথে আলোচনার যে ঝুঁকি এই ব্যক্তি গ্রহণ করেছিলো, তা বাস্তবিকই বিপজ্জনক ছিলো। সতর্কতা, দক্ষতা ও শক্তি সর্বদিক দিয়েই একজন মোমেনের স্বভাবসুলভ পরিপক্কতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা এ ভাষণে ফুটে উঠেছে।

প্রথমেই ব্যক্তি এই বলে তাদের পরিকল্পনার ভয়াবহতা ব্যক্ত করলো! 'তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এ জন্যেই হত্যা করবে যে, ব্যক্তি বলে, 'আমার প্রভু আল্লাহ।'

অন্তরের সন্তোষ ও বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট এই নিষ্পাপ কথাটা বলায় কি এতোই বড় অপরাধ হয়ে গেছে যে, সে তোমাদের কাছে হত্যার যোগ্য বিবেচিত হচ্ছে? এটাতো আসলে একটা জঘন্য অন্যায় ও দূষণীয় কাজ।

এরপর তাদের সাথে সে আরো একধাপ অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি 'আল্লাহ আমার রব' এই চমৎকার কথাটা উচ্চারণ করতে পারে, তার কাছে এর যুক্তি প্রমাণও অবশ্যই থাকার কথা। তাই সে বলে! 'সে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে।' এ দ্বারা সে হযরত মূসার প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনাগুলোর প্রতি ইংগিত দিয়েছে। সে সব ঘটনা তারা সচক্ষে দেখেছে এবং তা নিয়ে কারো সন্দেহের অবকাশ ছিলো না।

এরপর সে বিচার বিবেচনার খাতিরে সবচেয়ে খারাপ ধারণাটা মেনে নিয়ে বলছে; 'সে যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে, তবে তার মিথ্যার দায় তার ঘাড়েই পড়বে।'

অর্থাৎ তার অপকর্মের শাস্তি সে নিজেই ভোগ করবে। কিন্তু এ জন্যে তাকে হত্যা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না। অন্য একটা সম্ভাবনাও এখানে রয়েছে যে, সে সত্যবাদীও হয়ে বসতে পারে। এই সম্ভাবনার খাতিরে সতর্কতা অবলম্বন করাই উত্তম।

'আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে যেসব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তার অন্তত কিছু কিছু অংশ সত্য হয়ে তোমাদেরকে আক্রান্ত করতে পারে।'

আর তাঁর প্রতিশ্রুতি কিছু কিছু জিনিস দ্বারা তাদের আক্রান্ত হওয়াও নিছক একটা সম্ভাবনা মাত্র। বস্তুত তাদের কাছে সে এর চেয়ে বেশী কিছু দাবী জানাতে পারবে না। তর্কের ক্ষেত্রে এটুকুই সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

এরপর সে অত্যন্ত কৌশলে ও গোপনে তাদেরকে একটা হুমকি দিচ্ছে। এ হুমকি হযরত মূসা ও তাদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য; 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে সুপথ দেখান না, যে সীমা অতিক্রমকারী ও অতিমাত্রায় মিথ্যুক।'

মূসা যদি মিথ্যুক ও সীমা অতিক্রমকারী হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুপথ দেখাবেন না ও সৎ কাজের শক্তি যোগাবেন না। কাজেই তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে দাও। তোমরা সাবধান থাকো যেন তোমরাই মূসা ও তার প্রতিপালকের ওপর মিথ্যা আরোপকারী না হও, সীমা অতিক্রমকারী না হও এবং এর কু-ফল ভোগ না করো।

মিথ্যাবাদী ও সীমা অতিক্রমকারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দেয়া হবে– এ কথা জানানোর পর সে তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাচ্ছে এবং হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাউকে আযাব থেকে রক্ষা করবে না। সেই সাথে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এই নেয়ামত এমন জিনিস, যার শোকর করা কর্তব্য এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকা উচিত।

'হে আমার জাতি, আজ রাজত্ব তোমাদের, তোমরাই পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি এসে পড়ে, তাহলে কে আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করবে?'

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই মোমেন ব্যক্তি অন্যান্য মোমেনের মতোই অনুভব করে যে, পৃথিবীর রাজা ও শাসকরা আল্লাহর আযাবের সবচেয়ে নিকটবর্তী, তাই তাদেরও তা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা এই আযাব তাদের জন্যে দিনরাত অপেক্ষা করছে। তাই তাদেরকে সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদেরকে রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ন্যায় নেয়ামত দেয়া হয়েছে। অতপর বলছে! 'আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে আমাদেরকে রক্ষা করবে?' এ কথা বলে সে বুঝাচ্ছে যে, তাদের বিপদ আপদ সম্পর্কে সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। কেননা সে তাদেরই একজন এবং তাদের যে পরিণতি হবে, সেও তারই জন্যে অপেক্ষমান। তাই সে তাদের হিতাকাংখী। সে ভেবেছিলো যে, এতে তারা তার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করবে এবং তাকে নির্দোষ ও আন্তরিক মনে করবে। কেননা সে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করার চেষ্টা করছে যে, আল্লাহর আযাব এসে গেলে তা থেকে কেউ রক্ষা করতে ও সাহায্য করতে পারবে না। কেননা তারা তার সামনে খুবই দুর্বল।

এখানে ফেরাউন অন্যান্য একনায়কের মতোই তার উপদেশকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলো না, বরং সে এতে অপমান বোধ করলো। এই আন্তরিক সদুপদেশ ও কল্যাণকামীতাকে সে তার

ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ, তার প্রতাপ ও পরাক্রমের ঘাটতি এবং তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে ভাগ বসানোর অভিলাষ হিসাবে বিবেচনা করলো। তাই তার প্রতিক্রিয়া দাঁড়ালো এ রকম।

'ফেরাউন বললো আমি যা বুঝি, তাই তোমাদেরকে বলছি। আর আমি তোমাদেরকে কেবল কল্যাণের পথই দেখাচ্ছি।'

অর্থাৎ আমি যা সঠিক ও উপকারী মনে করছি সেটাই তোমাদেরকে বলছি। আমি যা বলছি, নিসন্দেহে সেটাই নির্ভুল। একনায়করা কি কখনো সঠিক ও কল্যাণকর পথ দেখতে পায়? তারা ভুল করতে পারে বলে কেউ ভাবুক এটা কি তারা বরদাশত করতে পারে? তাদের মতামতের বিপক্ষে কেউ কি কোনো বিকল্প মত দিতে পারে? তা যদি পারতো, তাহলে তারা একনায়ক হবে কেন?

কিন্তু এই মোমেন লোকটার ঈমান অন্যরকম ছিলো। সে বুঝতে পেরেছিলো যে, সতর্ক করা, উপদেশ দেয়া এবং নিজের বিবেচনায় যা ভালো মনে করে তা ব্যক্ত করা তার দায়িত্ব। একনায়ক ও স্বৈরাচারী মতামত যা হয় হোক।

সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়া তার কর্তব্য এরপর সে তাদের বিবেককে জাগ্রত করা ও নম্র করার জন্যে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। পরবর্তী আয়াতে এই ভিন্ন পন্থার উল্লেখ রয়েছে। সেটা এই যে, কে তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই জাতিগুলো দেখেছে আল্লাহর আযাব কিভাবে অস্বীকারকারী ও স্বৈরাচারীদেরকে পাকড়াও করে। ঈমান আনয়নকারী লোকটা বললো,

'হে আমার জাতি, আমার আশংকা হয়, পূর্বতন জতিগুলোর ন্যায় বিপজ্জনক দিন তোমাদের ওপর এসে পড়ে কিনা। নূহের জাতি, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তীদের ন্যায় বিপজ্জনক দিন। আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর অত্যাচার করতে চান না।'

প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটা নির্দিষ্ট দিন ছিলো। কিন্তু এই মোমেন ব্যক্তি সকলের দিনকে একই দিনে সমবেত করেছে। বস্তুত এ দিনটা হলো আল্লাহর আযাব দেখা দেয়ার দিন। জাতি যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক, তাদের এই দিনের প্রকৃতিটা ছিলো একই রকম। 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর অত্যাচার করতে চান না।'

অর্থাৎ শুধু অপরাধীর শাস্তি দিয়ে তার চারপাশের ও পরবর্তীকালের মানুষকে সংশোধন করতে চান। এরপর এই মোমেন ব্যক্তি তাদের ভেতরে চেতনা সঞ্চারের জন্যে আরো একটা দিন কেয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,

'হে আমার জাতি তোমাদের ওপর আশংকা করি কেয়ামতের দিনের ....।' (আয়াত ৩২-৩৩)

সেদিন ফেরেশতারা লোকজনকে মাঠে সমবেত হবার জন্যে ডাকবে। আ'রাফের অধিবাসীরা দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীকে, দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীকে এবং বেহেশতবাসীরা দোযখবাসীকে ডাকবে। এভাবে সেদিন নানাভাবে ডাকাডাকি হতে থাকবে। একে এখানে 'ইয়াওমুত তানাদি' (ডাকাডাকির দিন) বলা দ্বারা এর এমন একটা চিত্র ফুটে উঠেছে যে, এখান থেকে ওখান থেকে ডাকাডাকি ও ঝগড়াঝাটি চলতে থাকবে। এটা মোমেন ব্যক্তিটার এই কথার সাথেও সংগতিপূর্ণ; 'যেদিন তোমরা পালাবে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো রক্ষক থাকবে না।' এই পালানোর কারণ জাহান্নামের ভীতিও হতে পারে, অথবা এটা নিছক পালানোর চেষ্টাই হবে। কিন্তু সেদিন কোনো রক্ষকও থাকবে না, পালানোরও কোনো জায়গা থাকবে না। এখানে

পালানোর ভয়ভীতির যে চিত্র আঁকা হয়েছে, পৃথিবীর একনায়ক শাসক ও অহংকারীদের বেলায় এটাই এ ধরনের প্রথম চিত্র।

'আর আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করবেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'

সম্ভবত এটা ফেরাউনের এই কথাটার দিকে সুক্ষ্ম কটাক্ষ; 'আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই।' এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথ প্রদর্শনই প্রকৃত পথ প্রদর্শন। তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তার আর কোনো পথ প্রদর্শক নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালাই মানুষের প্রকৃত অবস্থা জানেন। সেই অনুসারেই তিনি কে হেদায়াতের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা স্থির করেন।

সবার শেষে এই মোমেন ব্যক্তি তাদেরকে হযরত ইউসুফের কথা তাদের স্মরণ করাচ্ছে। মূসা (আ.) তারই বংশধর। এই ব্যক্তি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কিভাবে হযরত ইউসুফকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করা হয়েছে। কাজেই হযরত মূসার সাথেও তাদের একই আচরণ করা উচিত। কেননা তিনি হযরত ইউসুফের আনীত জীবন বিধানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তবুও তারা তার ওপর সন্দেহ করতো। তারা একথাও বলতো যে, হযরত ইউসুফের পর আল্লাহ তায়ালা আর কোনো রসূল পাঠাবেন না। হযরত মূসা হযরত ইউসুফের কিছুকাল পরে এসেছেন এবং উক্ত কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। (আয়াত ৩৪ ও ৩৫)

কোরআনে এই একবারই মিসরের জনগণের প্রতি হযরত ইউসুফের রসূলরূপে আগমনের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসূফ থেকে আমরা এতোটুকু জেনেছি যে, তিনি মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হয়েছিলেন এবং তিনি মিসরের 'আযীয' বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সূরা ইউসুফ থেকে এ ধারণাও পাওয়া যায় যে, তিনি মিসরের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন, তবে এ ব্যাপারটা সুনিশ্চিত নয়। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে;

'তিনি তার পিতামাতাকে সিংহাসনে আরোহন করালেন………।'

এমনও হতে পারে যে, তিনি তার পিতামাতাকে যে সিংহাসনে আরোহন করিয়েছিলেন, তা মিসরীয় সম্রাট ফেরাউনের সিংহাসন নয়। সে যাই হোক, এ কথা নিশ্চিত যে, হযরত ইউসুফ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ থেকে আমরা কল্পনা করতে পারি এই মোমেন ব্যক্তি কোন্ পরিস্থিতির দিকে ইংগিত করেছে। সেটা হলো, হযরত ইউসুফের আনীত শরীয়ত ও বিধান সম্পর্কে তাদের সন্দেহ পোষণ, ইউসুফের ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে তার সাথে তাদের আপস করা ও তাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে না পেরে কেবল মনে মনে সন্দেহ পোষণ।

'অতপর তিনি যখন মারা গেলেন তখন তোমরা বললে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পর আর কোনো রসূল পাঠাবেন না।'

অর্থাৎ তারা যেন তার মৃত্যুতে হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। ফলে তারা এভাবে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং তার প্রচারিত নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছে। এই তাওহীদ তিনি কারাগারে বসেও প্রচার করেছেন। তিনি তার দুই সাথীকে বলেছিলেন; 'বহুসংখ্যক প্রভু ভালো, না এক ও অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা?' তারা দাবী করতো যে, তাঁর পর আর কোনো রসূল তাদের কাছে আসবে না। কেননা তারা আসলে এটাই চাইতো। মানুষ অনেক সময় যা কামনা করে, সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। কেননা তার বাস্তবায়নেই তার কামনা পূর্ণ হয়।

তাদের একগুয়েমির কারণে মোমেন লোকটা এই পর্যায়ে এসে খানিকটা কঠোর ভূমিকায় আসে। এখানে সে সন্দেহ ও সীমা অতিক্রমকে প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত করে। তাই সে বলে;

'এভাবেই আল্লাহ তায়ালা সীমা অতিক্রমকারী ও সন্দেহকারীকে গোমরাহ করেন।'

এভাবে সে সতর্ক করছে যে, অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্তেও যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে ও সীমা অতিক্রম করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করেন।

এরপর সে তাদেরকে আল্লাহর ঘৃণা ও মোমেনদের ঘৃণার সম্মুখীন হবার হুমকি দেয়। কেননা তারা কোনো যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। তারাই এ কাজটা সবচেয়ে জঘন্য আকারে করে। এরপর সে অহংকারের নিন্দা জানায় এবং অহংকারীদের মনকে আল্লাহ তায়ালা নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার হুমকি দেন;

'যারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে। তাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে ও মোমেনদের কাছে ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর মনের ওপর মোহর মেরে দেন।'

এই মোমেন ব্যক্তির মুখ দিয়ে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে, তা বলতে গেলে এ সূরার প্রথম দিককার বক্তব্যগুলোর হুবহু প্রতিলিপি। প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ককারীদের প্রতি ঘৃণা, এবং অহংকারীদেরকে বিপথগামীকরণ; যার ফলে তাদের অন্তরে আর হেদায়াত গ্রহণের ও উপলব্ধির আর কোনো স্থান অবশিষ্ট থাকে না এগুলো সূরার প্রথমাংশে রয়েছে।

এই মোমেন ব্যক্তি অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ কথাগুলো বলা সত্তেও ফেরাউন তার গোমরাহী চালিয়ে যেতে থাকলো এবং সত্যের বিরোধিতা অব্যাহত রাখলো। তবে সে বাহ্যত দেখালো যে, সে মূসার দাবীগুলোর সত্যতা যাচাই করতে চায়। এখানে এটাও বুঝা যায় যে, এই মোমেন ব্যক্তির কথাবার্তা ও যুক্তি প্রমাণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী প্রমাণিত হয়েছিলো, যার কারণে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এটাকে অস্বীকার করতে পারেনি। এ জন্যে ফেরাউন নতুন ছুতো খুঁজতে লাগলো;

'ফেরাউন বললো হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো .....।' (আয়াত ৩৬ -৩৭)

অর্থাৎ হে হামান, আমার জন্যে একটা উঁচু দালান বানাও, হয়তো তার ওপর চড়ে আমি আকাশ ও পৃথিবীর উপায় উপকরণ পেয়ে যাবো এবং সেখানে মূসার খোদা সত্যই আছে কিনা, তাও দেখবো। 'আসলে আমি তো ওকে মিথ্যুক মনে করি' এভাবে স্বৈরাচারী ফেরাউন ক্রমাগত ছলছুতো অবলম্বন করতে থাকে, যাতে খোলাখুলি সত্যের বিরোধিতাও না হয়, আবার তাওহীদ মেনে নিয়ে সিংহাসনকে নড়বড়ে করে ফেলাও না হয় এবং তার রাজত্বের ভিত্তি যে পৌত্তলিকতার ওপর, তাও বিধ্বস্ত না হয়। এটা সম্ভব নয় যে, এসব উক্তি ফেরাউনের সুস্থ চিন্তা ও উপলব্ধির ফল। এটাও সম্ভব নয় যে, ফেরাউন এমন সহজ-সরল বস্তুবাদী উপায়ে যথার্থই মূসার মাবুদ অনুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলো। মিসরের ফেরাউনরা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এমন মানে উন্নীত ছিলো যে, এই ধারণা তার সাথে খাপ খায় না। আসলে এটা ছিলো তার বিদ্রূপ উপহাস ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের নামান্তর। অন্যদিক দিয়ে এটা তার ন্যায়নীতি প্রীতির একটা প্রদর্শনী এবং সত্যানুসন্ধানের একটা প্রহসনও ছিলো হয়তোবা। এমনও হতে পারে যে, মোমেন ব্যক্তিটার ধারালো যুক্তি তর্কের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে সে এভাবে একটা ছলছুতো উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলো। এই সব কটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থেকেই সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, সে তার গোমরাহীর ওপর অনড় ছিলো এবং মূসার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে অবিচল ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন; এভাবেই ফেরাউনের কাছে তারা অপকর্মকে সুদর্শন করে দেখানো হয়েছিলো এবং তাকে বিপথগামী করা হয়েছিলো। বস্তুত সে গোমরাহীর যোগ্যও ছিলো। কেননা

এ ধরনের বিতর্ক তোলা দ্বারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি অনির্বাণ হয়ে দাঁড়ায়। আয়াতের শেষাংশের মন্তব্যে তার এই ছলছুতোকে তার ব্যর্থতা ও ধ্বংসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

'ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো।'

এই ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের পাশাপাশি সেই মোমেন ব্যক্তি তার সর্বশেষ বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পেশ করেছে। এর আগে সে জাতিকে তার পদাংক অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে এবং তাকে সে হেদায়াতের পথ বলে আখ্যায়িত করেছে। সে এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করেছে, তাদেরকে চিরস্থায়ী আখেরাতের সুখ ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী হতে বলেছে আখেরাতের আযাব থেকে সতর্ক করেছে এবং শেরককে একটা বাতিল ও অচল মতবাদ বলে ঘোষণা করেছে; (আয়াত ৩৮-৪৪)

এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তা সূরার প্রথমাংশে আলোচিত হয়েছে। মোমেন লোকটা পুনরায় ফেরাউনের মুখোমুখী হয়ে জনগণকে বলেছে;

'হে আমার জাতি, তোমরা আমার পদাংক অনুসরণ করো। আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবো।'

ওদিকে ফেরাউনও বলতো যে, 'আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবো।' এ থেকে বুঝা যায়, এই মোমেন ফেরাউনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়ে সত্য কথা বলতে শুরু করেছে। স্বৈরাচারী ফেরাউন এবং তার সহযোগী হামান কারূণ প্রভৃতি মন্ত্রী ও সভাসদদেরকে সে আর ভয় করছে না।

পার্থিব জীবনের স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'হে আমার জাতি! এ পার্থিব জীবন তো কেবল (কয়েকদিনের) উপভোগের বস্তু'

অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু, এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। অপরদিকে পরকালের জীবনই হচ্ছে স্থায়ী জীবন। সেই জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। কাজেই সেই জীবনই মুখ্য হওয়া উচিত কাম্য হওয়া উচিত। এই চিরস্থায়ী জীবনে মানুষের কর্মের হিসাব নিকাশ ও ফলাফল কিসের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তারই অনুরূপ প্রতিফল পাবে ....। (আয়াত ৪০)

আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি পুণ্যের প্রতিদান দ্বিগুণ (মাঝে মাঝে আরো বেশী) করে দেন। কিন্তু পাপের প্রতিদান দ্বিগুণ করেন না। এটা বান্দার প্রতি তাঁর অপার করুণারই জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি তাঁর বান্দাদের দুর্বলতার কথা জানেন, পাপ-পুণ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কথা জানেন বলেই তাদের পুণ্যের পাল্লা ভারি করে দেন আর পাপের পাল্লা হাল্কা করে দেন। শুধু তাই নয়, বরং হিসাব নিকাশের পর যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সেখানে অগণিত নেয়ামত দান করবেন।

এই মোমেন বান্দা তার জাতিকে মুক্তির ও কল্যাণের পথে ডাকছে, আর তার জাতি তাকে ডাকছে জাহান্নামের দিকে। তাই সে প্রতিবাদের সুরে এবং নিন্দার সুরে তাদেরকে বলছে,

'হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য ব্যাপার, আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে? (আয়াত ৪১)

তার জাতি তাকে কিন্তু জাহান্নামের দিকে আহ্বান করেনি, তারা তাকে আহ্বান করেছে শেরেকের দিকে। শেরেকের দিকে আহ্বান করা, আর জাহান্নামের দিকে আহ্বান করার মাঝে

পার্থক্য কোথায়? কোনোই পার্থক্য নেই, বরং দুটোই পরস্পরের খুব নিকটে রয়েছে। তাই মোমেন ব্যক্তি এই পরস্পর বিরোধী দুটো আহ্বানকে ভিন্ন বর্ণনাভঙ্গিতে এভাবে প্রকাশ করছে,

'তোমরা আমাকে আহ্বান করছো, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে এমন কাউকে শরীক করি যার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই।' (আয়াত ৪২)

এই দু'ধরনের আহ্বানের মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। মোমেন ব্যক্তি তার জাতিকে যে আহ্বান জানাচ্ছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সরল। সে তাদেরকে মহাপরাক্রমশালী ও মহাক্ষমাশীল এক সত্ত্বার পানে আহ্বান জানাচ্ছে, এমন একক উপাস্যের পানে আহ্বান জানাচ্ছে যার একত্বের সাক্ষ্য বহন করছে গোটা সৃষ্টিজগত। তাঁর কুশলী ও নিপুণ সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ও নিরুপম শৈলীর পরিচয় দিচ্ছে। তারা যাতে ক্ষমা লাভ করতে পারে, সে জন্য তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে ডাকছে। কারণ ক্ষমা করার শক্তি তাঁর আছে। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাক্ষমাশীল। কিন্তু সেই মোমেন বান্দাকে তার জাতি কিসের দিকে ডাকছে? আল্লাহকে অস্বীকার করার জন্যে ডাকছে, তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে বলছে যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। কারণ, সেসব হচ্ছে নিছক কুসংস্কার, কল্পনা ও গোলক ধাঁধাঁ।

এরপর মোমেন বান্দা সুস্পষ্ট ভাষায় ও সংশয়-সন্দেহবিহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে সেই কল্পিত শরীকদের সম্পর্কে বলছে যে, ওদের করার মতো কিছুই নেই। দুনিয়াতেও ওদের কোনো প্রভাব নেই এবং পরকালেও ওদের কোনো প্রভাব নেই। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। যারা সীমালংঘন করে তারা জাহান্নামীদের কাতারে শামিল হবে। বলা হচ্ছে,

'এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহ্বান করছো ইহকালে ও পরকালে তার দিকে আহ্বান করা কারো পক্ষেই শোভনীয় নয় ....।'। (আয়াত ৪৩)

ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত মৌলিক তত্ত্বের ব্যাপারে এই সুস্পষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্যের পর আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে? ফেরাউনের দরবারে তার সভাসদদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মোমেন ব্যক্তিটি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে এই বক্তব্য পেশ করছে। প্রথমদিকে সে তার ঈমানের বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছিলো। এখন আর কোনো রাখঢাক নেই। সুস্পষ্ট ভাষায় তার মনের কথা সবার সামনে প্রকাশ করে নিজের বিবেককে হাল্কা করতে পেরেছে। তাই এখন নিজেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়া ছাড়া তার আর করার কিছু নেই। তবে সে তার জাতিকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তার এই কথাগুলোয় তারা এমন একদিন বুঝতে পারবে যেদিন এই বুঝ কোনো উপকারেই আসবে না। কারণ তখন বিচারের ভার থাকবে আল্লাহর হাতে। তাই বলা হচ্ছে,

'আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি ....। (আয়াত ৪৪)

পথভ্রষ্ট নেতা ও তার অনুসারীদের পরিণতি

তর্ক বিতর্ক ও কথা বার্তা এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এই কথাবার্তার মাধ্যমে ফেরাউনের গোষ্ঠীভুক্ত মোমেন লোকটি যে সত্য কথাটি উচ্চারণ করে গেছে তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মূসা (আ.)-এর মাঝে এবং ফেরাউন ও বনী ইসরাঈলের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে,

'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করলো..........। (আয়াত ৪৫-৫০)

পার্থিব জীবনের অবসান ঘটানোর পর পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ সামনে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে দেখা গেলো যে, মোমেন ব্যক্তিটিকে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার লোকজনদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। ওরা পৃথিবীতেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এবং পরকালে তো পারবেই না। অথচ খোদ ফেরাউন ও তার লোকজনকে কঠিন আযাব গ্রাস করে নিয়েছে। এই আযাবের স্বরূপ কি, সে সম্পর্কে নীচের আয়াতে বলা হচ্ছে,

'সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।' (আয়াত ৪৬)

কোরআনের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সকাল বিকাল ফেরাউন ও তার লোকজনদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে এসে শাস্তি দেয়ার ঘটনাটি ঘটবে মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। কবরের আযাব বলতে খুব সম্ভবত, এটাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ, এর পরেই বলা হয়েছে, 'যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে প্রবেশ করাও' এ দ্বারা বুঝা যায় পূর্বের আযাবটি কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে ছিলো। এটাও কঠিন আযাব। সকাল বিকাল আগুনের সামনে হাযির করানোর মাধ্যমে এই আযাব দেয়া হবে। অর্থাৎ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাদের চোখের সামনে বার বার এনে তাদেরকে মানসিকভাবে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা আগুনের তাপ তাদের চোখেমুখে স্পর্শ করার ফলে তারা শাস্তি পাবে। এর পরের শাস্তিতো আরও কঠিন এবং তা হবে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর।

পরবর্তী আয়াতে কেয়ামতের পরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ফেরাউন ও তার লোকজনদেরকে জাহান্নামের ভেতর দাঁড়িয়ে তর্ক করতে দেখা যাচ্ছে। যেমন,

'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম...........। (আয়াত ৪৭)

আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, দুর্বলরাও জাহান্নামে তাদের সাথে অবস্থান করবে। সেই বড়দের লেজুরবৃত্তি আর মোসাহেবী করেও আজ তাদের ভাগ্যে বড়দের কোনো সুপারিশ জুটছে না। সেই বড়রা তাদেরকে ভেড়া-বকরীর মতো যেমন চাইছে এবং যেখানে চাইছে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতো, সেই ব্যাপারে তাদের স্বাধীন কোনো মত থাকতো না, কোনো ইচ্ছা থাকতো না এবং কোনো পছন্দ অপছন্দও থাকতো না; কিন্তু তারা আজ কঠিন শাস্তির মূহূর্তে তাদের কোনোই উপকারে আসছে না।

আল্লাহ তায়ালা সেই দুর্বলদেরকে মর্যাদা দান করেছিলেন। তা হচ্ছে মানবতার মর্যাদা, ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্যাদা। কিন্তু তারা নিজেরাই এসব মর্যাদা ও স্বাধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে এবং এসব ত্যাগ করে তারা বড়দের পেছনে ছুটেছে, যালেমদের পেছনে ছুটেছে, দরবারী লোকদের পেছনে ছুটেছে এবং আমলা কামলাদের পেছনে ছুটেছে। কখনও 'না' বলার মতো শক্তি তাদের ছিলো না। বরং 'না' বলার কথা তারা কোনোদিন চিন্তাও করতো না। সেই বড়রা তাদেরকে কী বলছে এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তারা কোনোদিন ভেবেও দেখতো না। তারা নিজেরদেরকে নিছক অনুসারী বলেই ভাবতো। তারা আল্লাহ প্রদত্ত এই স্বাধীনতা ও মর্যাদা বড়দের স্বার্থে ত্যাগ করেছিলো এবং মনে করেছিলো, বিপদের মুহূর্তে তারা কাজে আসবে, আল্লাহর সামনে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। কিন্তু না, সে আশা পূর্ণ হয়নি। পৃথিবীর বুকে সেই বড়োরা তাদেরকে ভেড়া বকরীর মতো যেমন হাঁকিয়ে নিয়ে

যেতো' তেমনিভাবে এখানেও ওরা এদেরকে এই জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই স্বভাবতই ওরা তাদেরকে প্রশ্ন করছে,' তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? কারণ পৃথিবীতে এই বড়রা ওদেরকে ধারণা দিতো যে, ওরা ওদেরকে সঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে, ওদেরকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে এবং সর্বপ্রকারের অমংগল, অনিষ্ট ও শক্রদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করছে।

কিন্তু এই ক্ষমতাধর অহংকারীরা তখন সেই ছোট ও নিচু শ্রেণীর লোকদের সামনে বড় বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে এবং অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উত্তর দেবে। তারা তাদের অক্ষমতা স্বীকার করে নেবে, 'অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে নিজ ফয়সালা করে দিয়েছেন।' (আয়াত নং ৪৮)

তাদের স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি যে, 'আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি' অর্থাৎ আমরা সবাই দুর্বল ও অক্ষম। এখানে আমাদেরকে সাহায্য করার মতো এবং রক্ষা করার মতো কেউ নেই। এই যন্ত্রণা ও কষ্টের আমরা সবাই সমান। যখন ক্ষমতাশালী ও দুর্বল সবাইকে এক সমান দেখছো, তখন আমাদেরকে আর কেন প্রশ্ন করছো?

যেহেতু 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন' তাই এই ফয়সালা পুনর্বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই এবং এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনেরও অবকাশ নেই । রায় ঘোষণা হয়ে গেছে, কাজেই কোনো বান্দার পক্ষেই আল্লাহর এই রায়কে লঘু করা সম্ভবপর নয়।

যখন উভয় দল বুঝে ফেলবে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সহায় নেই, তখন তারা সবাই অত্যন্ত বিনয় ও কাতর সুরে জাহান্নামের প্রহরীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে,

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন' (আয়াত ৪৯)

অত্যন্ত কাতর স্বরে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে এই আবেদন জানাবে। তাদের আশা, প্রহরীরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদের এই কঠিন শাস্তি কিছুটা লাঘব করাবে। খুব দীর্ঘ সময়ের জন্যে নয়, মাত্র একদিনের জন্যে যাতে করে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যাবে, একটু আরাম পাওয়া যাবে। এই একদিনের জন্যে শাস্তি লাঘব করার সুপারিশ ও দোয়া তাদের প্রাপ্য হওয়াটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু জাহান্নামের রক্ষীরা এই কাকুতি মিনতিভরা আবেদন রক্ষা করতে পারে না। কারণ, তাদের নিয়ম জানা আছে, আল্লাহর বিধান জানা আছে, তারা ভালো করেই জানে যে, এ জাতীয় আবেদনের এখন আর কোনোই সুযোগ নেই। তাই তারা ভর্ৎসনা করে এবং এই শাস্তির কারণ মনে করিয়ে দিয়ে ওদের যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে,'

রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেনি? তারা বলবে, হাঁ......... । (আয়াত ৫০)

প্রশ্ন ও এর উত্তরের মাঝেই যে চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে-তারপর আর কোনো কথাই চলে না। তাই তখন জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে অসহায় অবস্থায়ই ফেলে রাখবে এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে ওদের অসহায়ত্বকে আরও বাড়িয়ে দেবে। কারণ, তারা ওদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, 'তোমরা নিজেরাই আল্লাহকে বলো' তোমাদের বলার কারণে যদি তোমাদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয় তাহলে সেই কাজ তোমাদের নিজেদেরই করা উচিত। কিন্তু, তাদের এই আবেদন করার পূর্বেই আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'বস্তুত, কাফেরদের দোয়া নিস্ফলই হয় ....। অর্থাৎ এই দোয়া জায়গা মতো গিয়ে পৌছবে না এবং এর কোনো উত্তরও আসবে না। এই অবজ্ঞা আর উপেক্ষা ক্ষমতাধর ও দুর্বল উভয় শ্রেণীর ভাগ্যেই সেদিন জুটবে।

জয় পরাজয়ের সত্যিকার মাপকাঠি

এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পূর্বের বক্তব্য ও ঘটনাকে সামনে রেখে সর্বশেষ একটা মন্তব্য করা হচ্ছে। এই মন্তব্যের মাঝে সেইসব দল ও গোষ্ঠীর প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে যারা আল্লাহর সত্য বাণীকে অস্বীকার করার কারণে এবং অহংকার করার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আমি সাহায্য করবো রসূলদেরকে মোমেনদেরকে ....। (আয়াত ৫১-৫৫)

এই মন্তব্যটি যথার্থ স্থানেই করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে, মানুষ বুঝতে পারবে, সত্য ও মিথ্যার ফলাফল পার্থিব জগতে কী হয় আর পরকালে কী হয়। এর মাধ্যমে আনুষ আরও জানতে পারবে, ফেরাউন ও তার লোকজনদের পরিণতি পৃথিবীতে কি হয়েছিলো এবং পরকালে কী হবে। অর্থাৎ তাদের পরিণতি হবে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। পবিত্র কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ জাতীয় সব ঘটনার পরিণতি এ রকমই হবে। বলা হচ্ছে,

'সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি কোনো উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে খারাপ নিবাস।' (আয়াত ৫২)

তবে পরকালে বিশ্বাসী কোনো মোমেন বান্দা পরকালের এই পরিণতি সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। তাছাড়া এ জাতীয় বিতর্কের কোনো প্রয়োজনও তার হবে না। কিন্তু পার্থিব জগতের বিজয় ও সফলতা সম্পর্কে কখনও কখনও নিশ্চয়তা ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই বলা হয়েছে, 'আমি পার্থিব জীবনে আমার রসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো' অথচ বাস্তবে মানুষ দেখতে পায়, কোনো কোনো রসূলকে হত্যা করা হচ্ছে, কোনো কোনো রসূলকে নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং কোনো কোনো রসূলকে তার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে। অপরদিকে মোমেন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, কাউকে জ্বলন্ত অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করা হয়, কাউকে শহীদ করে দেয়া হয়, তাদের কেউ কেউ যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট ও যুলুম-অত্যাচারের মাঝে বেঁচে থাকে। তাহলে পৃথিবীতে সাহায্য করা সম্পর্কে সেই আসমানী ওয়াদা কোথায়? এই ছিদ্র দিয়েই শয়তান মানুষের মনে ঢুকে এবং যা করার তাই করে।

মানুষ সচরাচর যা দেখে তার মাধ্যমেই ঘটনার বিচার করে এবং অনেক মূল্যবোধ ও বাস্তব তত্ত্বই তখন তার বিবেচনায় থাকে না। মানুষ অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ঘটনাসমূহের বিচার করে। বিচারের এই মানবীয় মানদন্ড নিসন্দেহে খুবই সংকীর্ণ। অপরদিকে ব্যাপক মানদন্ডে যখন ঘটনার বিচার করা হয় তখনও স্থান ও কালের গন্ডি থাকে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। সেখানে কালের মাঝে কোনো ব্যবধান থাকে না এবং স্থানের মাঝেও কোনো ব্যবধান থাকে না। এই মানদন্ডের ভিত্তিতে যদি আমরা আকিদা বিশ্বাসের বিষয়টি বিচার করি তাহলে আমরা নিসন্দেহে এর বিজয়কে দেখতে পাবো। আসলে কোনো আকিদা বিশ্বাস বা আদর্শের বিজয়ের অর্থ হচ্ছে এর ধারক ও বাহকদেরই বিজয়। কাজেই, এই আদর্শের অস্তিত্বের বাইরে এর ধারক ও বাহকদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ, এই আদর্শের প্রথম দাবীই হচ্ছে এই যে, এর ধারক ও বাহকরা তাতে বিলীন হয়ে যাবে, এবং নিজেরা পর্দার আড়ালে থাকবে আর আদর্শকে সামনে তুলে ধরবে।

বিজয় ও সাফল্যের বিষয়টিও মানুষ অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে দেখে থাকে এবং সচরাচর এর যে চিত্র তারা প্রত্যক্ষ করে তার ওপর ভিত্তি করেই বিচার করে। অথচ বিজয় বিভিন্নরূপে ও আকারে প্রকাশ পায়। বাহ্যিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিতে এই বিজয় কখনও কখনও পরাজয়ের রূপেও প্রকাশ পেয়ে

থাকে। ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় দেখতে পাই, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা সত্তেও তিনি নিজের আদর্শ থেকে সরে আসেননি এবং এই আদর্শের প্রচার থেকেও বিরত হননি। তাহলে তার এই অবস্থানকে কি নামে আখ্যায়িত করবো? বিজয়ের নামে, না পরাজয়ের নামে? যদি ঈমান ও আকীদার মানদন্ডে বিচার করি, তাহলে নিসন্দেহে বলতে পারি, এটা ছিলো সর্বোচ্চ বিজয়। যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন তখনও তিনি ছিলেন বিজয়ী এবং যখন অগ্নিকুন্ড থেকে সহি-সালামতে বের হয়ে আসেন তখনও ছিলেন বিজয়ী, অথচ বাহ্যিকভাবে দুটো অবস্থার মাঝে কতো ব্যবধান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটো অবস্থার মাঝে কোনোই ব্যবধান নেই। হযরত হোসেন (রা.) অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও করুণভাবে শাহাদত বরণ করেছেন। একদিকে শাহাদত হচ্ছে এক বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা। অপরদিকে সেটা অত্যন্ত মর্মবিদারী ও বিয়োগান্তক এক ঘটনাও। এখন এই ঘটনাকে বিজয় বলবো, না পরাজয়? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং সংকীর্ণ মানদন্ডে এটা ছিলো পরাজয়। কিন্তু, প্রকৃত সত্যের আলোকে এবং উদার মানদন্ডে এটা ছিলো বিজয়। কারণ, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শহীদ নেই যার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় হৃদয় সিক্ত হয় না, মন কেঁদে ওঠে না। ইমাম হোসেন (রা.)-এর ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে পারি। তাঁর বিয়োগান্তক ঘটনায় শুধু মুসলমানই নয়, অনেক অমুসলিমও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এমন অনেক শহীদ আছেন যিনি এক হাজার বছর জীবিত থাকলেও তিনি তার আদর্শের প্রচার ও প্রসারে বিজয়ী হতে পারতেন না, তার শাহাদাতই তাঁর আদর্শকে বিজয়ী করেছেন। শহীদের রক্তে লেখা সর্বশেষ বক্তৃতাই হৃদয়ের মাঝে মহান চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং হাজার হাজার মানুষকে মহান কাজে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। শাহাদতের রক্তাক্ত অধ্যায়ই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

বিজয় কাকে বলে? আর পরাজয়ইবা কাকে বলে? আমাদের মনে জয় পরাজয়ের যে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। পার্থিব জগতে নবী রসূল ও মোমেনদের বিজয় সম্পর্কিত আল্লাহর অবশ্যই এই বদ্ধমূল ধারণা তলিয়ে দেখতে হবে।

এটা ঠিক যে, বিজয় অনেক সময় তার বাহ্যিক রূপেও প্রকাশ পেয়ে থাকে বিশেষ করে যখন এই বাহ্যিক রূপটি অমর ও চিরন্তন রূপটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, মিলে যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁর জীবনে বিজয় দেখেছেন। এটা সঠিক অর্থেই বিজয় ছিলো। কারণ এই বিজয়ের সম্পর্ক ছিলো পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রচারিত আদর্শের সত্যিকার ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সাথে। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, যদি তা গোটা মানব জীবনকে প্রভাবিত না করে, তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ না করে। ব্যক্তির হৃদয় থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের শাসক পর্যন্ত এর বিস্তার না থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় এই আদর্শের ধারক তাঁর জীবদ্দশায়ই বিজয় লাভ করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি এই আদর্শকে এর পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং এই বাস্তব সত্যটিকে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ঘটনা হিসেবে রেখে গেছেন। শুধু তাই নয়, বরং বিজয়ের এই চাক্ষুষ ও নিকটস্থ রূপটি দূরবর্তী রূপটির সাথে মিশে গেছে। ফলে বাহ্যিক রূপটি প্রকৃত রূপটির সাথে মিলে একটি অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। আর এটা আল্লাহর নির্দেশ ও ব্যবস্থায়ই সম্পন্ন হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল রসূল ও মোমেন বান্দাদের জন্যে বিজয়ের যে ওয়াদা করেছেন তা পুরোপুরিই বহাল আছে। তবে এই ওয়াদা কেবল সেই সব লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান থাকবে। প্রকৃত ঈমানের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃত ঈমান বা নির্ভেজাল ঈমান তাকেই বলে যার মাঝে বিন্দুমাত্র শেরকের সংমিশ্রন থাকবে না। শেরকের এমন

কিছু কিছু প্রকার আছে যা খুবই সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম শেরকের কবল থেকে মানুষ কেবল তখনই মুক্তি পেতে পারে যখন সে পুরোপুরি আল্লাহমুখী হবে, একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করবে, তাঁর ফয়সালায় রাজী-খুশী থাকবে এবং অনুভব করবে যে, একমাত্র আল্লাহই তাকে পরিচালিত করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন। কাজেই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তার কোনো মংগল নেই। এই বাস্তব সত্যটিকে সে সন্তুষ্টচিত্তে ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে গ্রহণ করে নেয়। তার অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উন্নীত হবে তখন আল্লাহর নির্দেশের বাইরে সে কোনো কাজ করবে না। বিজয় বা সাফল্যের নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো রূপের জন্যে আল্লাহর কাছে আব্দার করবে না; বরং গোটা বিষয়টিই সে তখন আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করবে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে সেগুলোকেই নিজের জন্যে মঙ্গলজনক মনে করবে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে বিজয় ও সাফল্য। অর্থাৎ এখানে বিজয় হচ্ছে নিজের আমিত্বকে জয় করা, প্রবৃত্তিকে জয় করা। এটাই হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিজয়। এই বিজয় ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই বাহ্যিক বিজয় লাভ করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, পরকালে যালেম অত্যাচারীদের কোনো ওযর আপত্তিই কাজে আসবে না, বরং তারা ভর্ৎসনাও লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং পরিশেষে নিকৃষ্ট জায়গায় স্থান পাবে। অপরদিকে মূসা (আ.)-এর ঘটনায় ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। সেখানে তাঁকে আমরা বিজয়ীবেশে দেখতে পাই। যেমন বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আমি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ......। (আয়াত ৫৩-৫৪)

এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের বিজয়। এই বিজয়ের সারমর্ম হচ্ছে, কেতাব ও হেদায়াতের অধিকারী হওয়া এবং কেতাব ও হেদায়াতকেই নিজের উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে যাওয়া। মূসা (আ.)-এর ঘটনার মধ্য দিয়ে বিজয়ের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয়, তার মাধ্যমে আমরা এক বিশেষ ধরনের বিজয়ের রূপ দেখতে পাই। বিজয়ের এই রূপটি কোনো ধারার ওপর ভিত্তি করে লাভ হয় তার ইংগিতও বহন করে।

আলোচনার এই পর্বে এখন সর্বশেষ বক্তব্য আসছে যার মাঝে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি দিক নির্দেশনা রয়েছে, তাঁর সাথে মক্কায় যুলুম নির্যাতনভোগকারী মোমেনদের প্রতি দিকনির্দেশনা রয়েছে এবং তাঁর উম্মতের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রত্যেকের জন্যে দিক নির্দেশনা রয়েছে যারা অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। বলা হয়েছে,

'অতএব তুমি সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তুমি তোমার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ....। (আয়াত ৫৫)

এই সর্বশেষ বক্তব্যে ধৈর্য সহ্যের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মিথ্যারোপের ওপর ধৈর্যধারণ করা, যুলুম নির্যাতনের ওপর ধৈর্যধারণ করা, বাতিলের সাময়িক উত্থান ও প্রভাবপত্তির ওপর ধৈর্যধারণ করা, মানুষের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারের ওপর ধৈর্যধারণ করা, মনের বিভিন্ন চাহিদা, আশা আকাংখা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং তাৎক্ষণিক বিজয়ের জন্যে মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছুই ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা যা শত্রুদের আগে বন্ধুদের কাছ থেকেই আসতে পারে।

বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য' অর্থাৎ সময় যতোই দীর্ঘ হোকনা কেন, অবস্থা যতোই জটিল হোকনা কেন এবং পরিস্থিতি যতোই অস্থিতিশীল হোকনা কেন, এই ওয়াদা বাস্তবায়িত করা হবেই। কারণ, এই ওয়াদা তিনিই করেছেন যিনি এর বাস্তবায়নের ক্ষমতাও রাখেন, এই ওয়াদা তিনিই করেছেন যিনি বাস্তবায়নের ইচ্ছাও রাখেন।

চলার পথে পাথেয় হিসেবে যা গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে এই, 'তোমার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো' কঠিন ও দীর্ঘপথের জন্যে এটাও হচ্ছে প্রকৃত পাথেয়। অর্থাৎ গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করা। আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এছাড়া এর মাধ্যমে আত্মসুদ্ধি ও মানসিক প্রস্তুতিও লাভ হয়। আর এটাই বিজয়ের সেই রূপ যা মনোজগতে লাভ হয়। এর পরই লাভ হয় জাগতিক জীবনের বিজয়।

এখানে সকাল সন্ধ্যা বলতে হয়তো দিনের গোটা সময় বুঝানো হয়েছে। অথবা এই দুটো মুহূর্তে মানুষের মন পরিস্কার থাকে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে, তাই এভাবে বলা হয়েছে।

বিজয় লাভের জন্যে এটাই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, এটাই হচ্ছে প্রকৃত পাথেয় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, এটা হচ্ছে এক ধরনের যুদ্ধ। আর প্রত্যেক যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে এবং পাথেয়রও প্রয়োজন আছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۙ اِنْ فِيْ
صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۖ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنَّ السَّاعَةَ
لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ
اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ
دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۖ
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই (ছেয়ে) থাকে, তারা কখনো সে (সাফল্যের) জায়গায় পৌঁছুবার (যোগ্য) নয়, অতএব (হে নবী), তুমি (এদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা; সর্বদ্রষ্টা। ৫৭. নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা অপেক্ষা বেশী কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। ৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি (কখনো) সমান হয় না, (ঠিক তেমনি) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি (কখনো) সমান নয়; (আসলে) তোমাদের কমসংখ্যক লোকই (আমার হেদায়াত থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯. কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না। ৬০. তোমাদের মালিক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রুকু ৭

৬১. আল্লাহ তায়ালা– যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ

৬২. এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি তোমাদের মালিক, প্রত্যেকটি জিনিসের একক স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই (বলো), তোমরা (কোথায়) কোথায় ঠোকর খাবে! ৬৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তাদেরও এভাবে (দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হয়েছিলো! ৬৪. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে ভূমিকে বাসোপযোগী (স্থান) বানিয়ে দিয়েছেন, আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, সুতরাং যে আকৃতি তিনি গঠন করেছেন তা কতো সুন্দর এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেযেক দান করেছেন; সে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের মালিক, কতো মহান বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা! ৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তাঁর এবাদাত করো; সমস্ত তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে! ৬৬. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের এবাদাত না করি, যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকো, (তা ছাড়া) যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা হয়ে যাই। ৬৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর জমাট রক্ত থেকে (বানিয়ে) তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তোমরা যৌবনপ্রাপ্ত হও, (এক সময় আবার) উপনীত হও বার্ধক্যে, তোমাদের কাউকে আগেই মৃত্যু দেয়া হবে, (এসব প্রক্রিয়া এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যেন তোমরা (সবাই) নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতে

وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ
فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ
وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ
وَالسَّلٰسِلُ ۗ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ
قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ
لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

পারো এবং আশা করা যায়, (এর ফলে) তোমরা (সঠিক ঘটনা) বুঝতে পারবে। ৬৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যুও ঘটান, তিনি যখন কোনো কিছু করা সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন 'হও', অতপর 'তা হয়ে যায়'।

রুকু ৮

৬৯. (হে নবী,) তুমি কি ওদের (অবস্থার) দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা আল্লাহ তায়ালার (নাযিল করা) আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে; (তুমি কি বলতে পারো আসলে) ওরা (সত্যকে ফেলে) কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে? ৭০. (ওরা) সেসব লোক যারা (এ) কেতাব অস্বীকার করে, (অস্বীকার করে) সেসব কেতাবও, যা আমি (ইতিপূর্বে) নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অতএব অতিশীঘ্রই তারা (নিজেদের পরিণাম) জানতে পারবে; ৭১. যেদিন ওদের গলদেশে (আযাবের) বেড়ি ও শেকল (পরিবেষ্টিত) থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, ৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদের আগুনেও দগ্ধীভূত করা হবে, ৭৩. তাদের বলা হবে, কোথায় (আজ) তারা– যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে? ৭৪. আল্লাহ তায়ালার বদলে, (যাদের তোমরা ডাকতে তারাই বা আজ কোথায়?) তারা বলবে, তারা তো (আজ সবাই) আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, (আসলে) আমরা তো আগে (কখনো) এমন কিছুকে ডাকিনি; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন। ৭৫. (আজ) এ কারণেই তোমাদের (এ পরিণাম) হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে এবং তোমরা (ক্ষমাহীন) অহংকার করতে,

ادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ

نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৬. সুতরাং (এখন) তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে (ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল! ৭৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার মালিকের ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আমি ওদের কাছে যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি (তার) কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, (তাতে দুশ্চিন্তার কারণ নেই,) তাদের তো অতপর আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে।

তাফসীর

আয়াত ৫৬-৭৭

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আসা কোনো দলীল ব্যতিরেকে..........। *(আয়াত ৫৬-৭৭)*

এই পর্বটিও আগের পর্বটির সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত ও সম্পৃক্ত এবং পূর্বের আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদটির সাথে এটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.) কে মিথ্যারোপ, যুলুম-নির্যাতন, সত্যকে প্রতিহত করা এবং বাতিলের লক্ষ-ঝক্ষ ধৈর্য সহকারে মোকাবেলার যে নির্দেশ পূর্বে দেয়া হয়েছিলো তারই সম্পূরক হিসেবে এই পর্বটি আলোচিত হচ্ছে। এই নির্দেশনার পর আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে তর্ক বিতর্কের মূল কারণটি উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে, অহংকার; এই অহংকারই মানুষকে সত্য মেনে নিতে বাধা দেয়। অথচ যে অহংকার তাদের মনে দানা বেঁধে উঠে সে তুলনায় তাদের অস্তিত্ব খুবই তুচ্ছ ও নগন্য।

এরপর সাবধানবাণীস্বরূপ এই সৃষ্টিজগতের বড়ত্ব ও মাহাত্মের কথা বলা হয়েছে, যা মহান আল্লাহর সৃষ্টির অন্যতম, গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব এই বিশাল সৃষ্টি জগতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশ্ব জগত থেকে কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষ তুচ্ছ ও নগন্য হওয়া সত্তেও এই বিশাল সৃষ্টি জগতকে তার করায়ত্ত করে দেয়া হয়েছে। এটা নিসন্দেহে আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া। এই দয়া ও করুনা তিনি খোদ মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করেছেন। যার কিছু কিছু নমুনা আলোচ্য পর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এসব কিছুই মহান সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রমাণ বহন করে। অথচ এই একক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার সাথেই মানুষ মানুষকে ও বিভিন্ন দেব-দেবীকে শরীক করে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে প্রকাশ্যে তাওহীদের বক্তব্য তুলে ধরতে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল কাল্পনিক ও মনগড়া উপাস্যদেরকে উপেক্ষা করতে বলছেন। আলোচ্য পর্বের শেষ দিকে কেয়ামতের ভয়াবহ কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মোশরেকদেরকে তাচ্ছিল্য ও ভর্ৎসনার সুরে নিজেদের মনগড়া শরীকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী পর্বের ন্যায় এই পর্বও রসূলুল্লাহ (স.)-কে ধৈর্য সহ্যের উপদেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওয়াদার আংশিক বাস্তবায়ন তিনি জীবদ্দশায় দেখে যান, অথবা এর পূর্বেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যান এসবই নির্ভর করছে

একন্তভাবে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। তবে যাই হোক না কেন, পরিশেষে সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। বলা হচ্ছে,

আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত অহংকারীদের পরিণতি

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোনো দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে............। *(আয়াত ৫৬-৬০)*

মানুষ নামী এই জীবটি অনেক সময়ই নিজের স্বরূপ ভুলে যায়। সে ভুলে যায় যে, সে একজন ছোট ও দুর্বল প্রাণী, তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, বরং তার যাবতীয় শক্তি ও সামার্থ সেই মহান আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করে যিনি শক্তির আদি উৎস। অথচ এই মানুষ সেই উৎস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অহংকারে ফুলে ফেপে ওঠে, উন্নাসিকতায় মেতে ওঠে, বাহাদুরী প্রদর্শন করতে থাকে। তার মনে আত্মম্ভরিতা দানা বেঁধে ওঠে। এই অহংকার সেই শয়তানের কাছ থেকে সে লাভ করে যে শয়তান এই অহংকারের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন সে মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে এই অহংকারকে তাদের ওপরও চাপিয়ে দিচ্ছে।

এই মানুষ আল্লাহর আয়াতকে নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠে। অথচ এই আয়াত হচ্ছে এমন সবাক প্রমাণ যা প্রকৃতিকে প্রকৃতির ভাষায়ই প্রকাশ করে, ব্যক্ত করে। বিতর্কের কারণ হিসেবে সে নিজেকে এবং অন্যান্য মানুষকে এই ধারণা দিতে চেষ্টা করে যে, সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে নিশ্চিত নয় বলেই বিতর্ক করছে। কিন্তু, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যথার্থরূপে অবগত আছেন। কারণ, তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী। বান্দাদের অন্তরের ভেদ সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। তিনি যথার্থরূপেই জানেন যে, একমাত্র অহংকারের কারণেই মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হয়। এই অহংকারই মানুষকে এমন একটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্বুদ্ধ করে যা তর্কাতীত। অহংকারের বশবর্তী হয়েই মানুষ নিজের অস্তিত্ব ও বাস্তবতার তুলনায় অনেক বড় কিছু দাবী করার চেষ্টা করে, এমন স্থান দখল করতে চায় যার যোগ্য সে নয়। তাছাড়া কোনোরূপ দলীল প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়াই সে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এটাকে অহংকার ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? তাই বলা হচ্ছে,

'তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা যা অর্জনে তারা সফল হবে না।'

মানুষ যদি তার বাস্তবতা এবং এই সৃষ্টিজগতের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারতো; তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতো তাহলে সে কখনও সীমালংঘন করার চেষ্টা করতো না। সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে উপলব্ধি করতে পারতো যে, তার অস্তিত্ব অগনিত ও অসংখ্য অস্তিত্বের মাঝে সামান্য একটা অস্তিত্ব যা আল্লাহর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে এবং এই বিশ্বজগতে টিকে আছে তাঁর অজানা ও অদৃশ্য নিয়মের অধীনেই; তেমনিভাবে মানুষ যদি বিশ্বাস করতো যে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতে তার ভূমিকা তার অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুসারেই নির্ধারণ করা আছে, তাহলে সে শান্তি পেতো, স্বস্তি পেতো, বিনয়ী হতো এবং নিজেকে নিয়ে, নিজের পারিপার্শিকতাকে নিয়ে সুখে ও সাচ্ছন্দেই জীবন যাপন করতে পারতো। আর সাথে সাথে মহান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতো ও তাঁর নির্দেশ মেনে নিতো। তাই বলা হচ্ছে,

'আল্লাহর আশ্রয় কামনা করো, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।'

অহংকার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে এখানে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে বলা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, অহংকার হচ্ছে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য একটি পাপ। কারণ, মানুষ কেবল সেই সব বস্তু থেকেই আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে যা নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর। বলা বাহুল্য, অহংকারের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কারণ, অহংকার খোদ অহংকারীকে অতিষ্ট করে তোলে, তার আশেপাশের

লোকজনকে অতিষ্ট করে তোলে, যে মনের ভেতর অহংকার জন্ম নেয়, সে অন্তরকে যন্ত্রণায় কাতর করে তোলে এবং অন্যদের অন্তরকেও যন্ত্রণায় ভরাক্রান্ত করে তোলে। কাজেই, এই অহংকার হচ্ছে অমংগল ও অনিষ্ট যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করার প্রয়োজন হয়।

'আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন'

অর্থাৎ নিকৃষ্ট অহংকার আচার আচরণে প্রকাশ পেলে আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন এবং কথা-বার্তায় প্রকাশ পেলে তাও তিনি শুনেন। কাজেই অহংকারীদের বিচারের ভার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত।

বিশাল সৃষ্টিজগতে মানুষের অবস্থান

পরবর্তী আয়াতে দৃশ্যমান জগতের তুলনায় মানুষের অস্তিত্বের নগন্যতা ও তুচ্ছতার ব্যাপারটি তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে,

'মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।' (আয়াত ৫৭)

আসমান ও যমীন মানুষের দৃষ্টির সামনেই উন্মুক্ত রয়েছে। তারা সচক্ষে এ দুটোকে দেখছে। এ দুটোর তুলনায় তাদের অস্তিত্ব কতটুকু তা সহজেই তারা অনুমান করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন তার সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়, তার আকার ও মাপ সম্পর্কে অবগত হয় এবং তার শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত হয় তখন তার অহংকার নিমিষে উবে যায়, নিজেকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগন্য মনে করতে থাকে, এমনকি নিজেকে অস্তিত্বহীন মনে করতে থাকে। আর যখন সে তার অন্তর্নিহিত সেই উচ্চমার্গীয় উপাদানের কথা ভাবে যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে ভূষিত করেছেন তখন একমাত্র সেই উপাদানটির বদৌলতেই সে নিজেকে এই বিশাল ও মহাজগতের সামনে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মানুষের এই উপলব্ধি আসমান ও যমীনের দিকে ক্ষণিকের জন্যে তাকালেই লাভ হয়। এই যে, পৃথিবীর ওপর আমরা বাস করছি তা সৌরমন্ডলের প্রায় ত্রিশ লক্ষ গ্রহের মাঝে ছোট্ট একটা গ্রহ। এই পৃথিবীর আকৃতি সূর্যের আকৃতির তুলনায় দশ লক্ষ ভাগের এ ভাগের চেয়েও কম। আর সূর্যের সংখ্যা কতো? সূর্যের সংখ্যা হচ্ছে দশ কোটি। আর সেটাও কেবল আমাদের সবচেয়ে নিকটতম ছায়াপথের সূর্যের সংখ্যা। এ পর্যন্ত মানুষ প্রায় দশ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছে যা এই মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আমরা চিন্তা করলে অবশ্যই বিষয়টি বুঝতে পারতাম; কেননা বিষয়টা সুস্পষ্ট এবং বেশ তাড়াতাড়িই তা বুঝা যায়। এ বিষয়ে নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানো থেকে বেশী আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। এরপর যদি আমরা আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা করতাম এবং আখেরাতের যিন্দেগী যে আসবেই একথা বিশ্বাস করতে পারতাম, বুঝতে পারতাম সেখানে আমাদের অবস্থা কী হবে এবং সে সময়ে অনুষ্ঠিতব্য দৃশ্যাবলীকে আমাদের নযরের সামনে টেনে আনতে পারতাম, তাহলে কতোই না ভালো হতো! এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই কেয়ামত সংঘটিত হবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, তবু অধিকাংশ মানুষ (এ বিষয়ে) বিশ্বাস করে না।'

অর্থাৎ, বিশ্বাস তো করেই না, বরং এ বিষয়ে তারা তর্ক-বিতর্ক করে এবং নিজের বড়ত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, যার কারণে তারা সত্যের সামনে মাথা নত করতে পারে না। তারা তাদের প্রকৃত অবস্থাটাও বুঝতে পারে না, জানে না যে তারা সে অবস্থাটাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে

পারবে না। এবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়া, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং বিনয়াবনত হয়ে তাঁর দরবারে কাকুতি মিনতি করতে থাকা, এই সব প্রক্রিয়া অন্তরের গভীরে অবস্থিত সেই অহংকারকে দূর করতে সাহায্য করে, যার কারণে মানুষ আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে এবং অকারণে ও যুক্তিহীনভাবে আল্লাহর আয়াতগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস করে। অথচ আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের জন্যে তাঁর মেহেরবাণীর দরজা সদা-সর্বদা অবারিত রেখেছেন, যেন আমরা তাঁর দিকে রুজু করি ও কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। আলোচ্য আয়াতে বিশ্বজগতের প্রতিপালক রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার ঘোষণা দিচ্ছেন যে, যে কোনো ব্যক্তি তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ডাকবে, তিনি তারই দোয়া কবুল করবেন, সাথে সাথে তিনি তাদেরকে সতর্কও করছেন, যারা নিজেদের বড়ত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তাঁর কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। তার আনুগত্য করা থেকে এরা দূরে থাকছে, আর এই কারণেই দোযখের আগুন এবং হীনতা ও অপমান তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের রব বলছেন তোমরা ডাকো আমাকে, আমি তোমাদের ডাকের জবাব দেবো। অবশ্যই যে সব মানুষ অহংকারবশত আমার এবাদাত থেকে দূরে থাকবে, শীঘ্রই তারা সমবেতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করার জন্যে কিছু আদব-কায়দা (বা নিয়ম শৃংখলা) রয়েছে যা পালন করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে অন্তরের ঐকান্তিকতা বা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা। কখন কোন দোয়া কিভাবে কবুল করা হবে সে বিষয়ে কোনো চিন্তা না করে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে গভীর আস্থা পোষণ করতে থাকা। কারণ এইভাবে আমার দোয়া কবুল করতে হবে বলে পরামর্শ দেয়া অবশ্যই আদবের খেলাফ। এ বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান রব্বুল আলামীনের কাছে চাইবার জন্যে মনের মধ্যে ইচ্ছা পয়দা হওয়া এটা তাঁরই মেহেরবানী, তারপর দোয়া কবুল হওয়া এটাও তাঁরই আর এক রহমত।

হযরত ওমর (রা.) বলতেন, 'দোয়া করার সময়ে আমার মনের মধ্যে কবুল হবে কি না হবে এ চিন্তা জাগে না, বরং দোয়া আমার করা দরকার এ চিন্তাটাই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তারপর যখন দেখি আমার অন্তরের মধ্য থেকে আমার অজান্তেই দোয়া বেরিয়ে আসছে, তখনই আমি বুঝি অবশ্যই আমার দোয়া কবুল হবে।' আসলে এটাই হচ্ছে সেই সচেতন মনের উপলব্ধি যে মন অনুভব করে যে, মহান আল্লাহ যখন দোয়া কবুল করতে চাইবেন, তখনই তিনি দোয়া করার তাওফীক দান করবেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, দোয়া চাওয়ার মনোবৃত্তির সাথে দোয়া কবুল হওয়ার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

এখন যেসব মানুষ তাকাব্বুরির কারণে দোয়া করতেই নারায তাদের প্রতিদান হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে এগিয়ে দেয়া, আর এটাই সেই অহংকারের পরিণাম যা তাদেরকে এই ছোট্ট ও অতি তুচ্ছ পৃথিবীর বুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে। এ নশ্বর জীবনে তাদের অন্তরগুলোকে সত্য গ্রহণ করার জন্যে অযোগ্য বানিয়ে দেয়, তাকে আল্লাহর সৃষ্ট এ মহাবিশ্বের বিশালত্বকে ভুলিয়ে দেয়। এ অবস্থায় প্রশ্নই আসে না যে, এসব ব্যক্তি আল্লাহর মহানত্ব ও মর্যাদা এবং আখেরাতের চেতনাপ্রাপ্ত হবে। তাদের আমিত্ব তাদেরকে একথাও ভুলিয়ে রাখে যে, এভাবে অহংকারের ফলে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করতে হবে।

কোনো সুস্থ মানুষ আল্লাহর গোলামী না করে পারে না

অহংকারের কারণে মানুষ আল্লাহর এবাদাত থেকে দূরে থাকে একথা উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এ পর্যায়ে তাঁর বেশ কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ

করেছেন। এসব নেয়ামত আমাদেরকে মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানায়। তাঁর সেই সব মেহেরবানীর কথা জানায়, যেসবের জন্যে অকৃতজ্ঞ মানুষ মহান মাবুদের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বরং তাঁর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করে এবং অহংকারের কারণে তাঁর দিকে রুজু করতে চায় না। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা.......... সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' (আয়াত ৬১-৬৫)

সৃষ্টিজগতের মধ্যে রাত ও দিন এ দুটি এমন প্রকাশ্য প্রাকৃতিক অবস্থা, যা সবার চোখে সকল সময়েই ভাসছে। যমীন ও আসমানও একইভাবে দৃশ্যমান আরো দুটি সৃষ্টি। এ দুটি সৃষ্টি মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও দয়ার যেন বাস্তব এক ছবি। তাদের জন্যে এসবই পবিত্র রেযেক, যার দ্বারা মানুষের জীবন ধারণ করা সম্ভব হয়। এসব কিছুর মাধ্যমেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের সকল প্রয়োজন এ দুই-এর মধ্য থেকেই মেটানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই দুই-এর মধ্য থেকে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এসবের মালিক একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনিই সকল শক্তির আধার এবং বিশ্বের সকল ব্যবস্থা যেমন তাঁর পরিচালনাধীন রয়েছে, তেমনি মানব জীবনের সকল বিধান তাঁরই দান, যেহেতু সকলের সৃষ্টিকর্তা বিধায় তিনিই জানেন কার কী প্রয়োজন, আর এটাও আমরা বুঝতে পারি যে, সৃষ্টির বুকে যেখানে যা কিছু আছে সব কিছু পরস্পর এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে সবাই নিজ নিজ গন্তব্য পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে।

এ মহা-সৃষ্টির নির্মাণের ভিত্তি তাঁরই পূর্ব পরিকল্পিত এক ব্যবস্থামতে রচিত হয়েছে। তারপর তিনি এসব কিছুকে তাঁরই কর্মসূচী অনুযায়ী পরিচালনা করেছেন যা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। তিনিই দয়া করে এই সৃষ্টি জগতকে বাস্তবে এনেছেন এবং একে মানুষের বাসোপযোগী করে ক্রমান্বয়ে এর উন্নতি বিধান করেছেন, যেমন করে তিনি মানব প্রকৃতি ও তার গঠন প্রক্রিয়াকে সকল দিক দিয়ে সুন্দর করে বানিয়েছেন। তাদেরকে সুকৌশলপূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন, মানুষের সকল প্রয়োজনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সকল ব্যবস্থা ও সাজ সরঞ্জাম তিনি পৃথিবীর বুকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তিনিই বিশ্রাম গ্রহণ করার, ক্লান্তি হরনের জন্যে এবং শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পূর্ণ আরাম পাওয়ার জন্যে রাতকে বানিয়েছেন, আর দিনকে বানিয়েছেন সব কিছু দেখার জন্যে, অর্থাৎ এর আলোকে চলাফেরা ও প্রয়োজনীয় সব কিছু দেখে শুনে ব্যবহার করার জন্যে এই সমুজ্জ্বল দিবসের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পৃথিবীকে স্থির এবং জীবনের জন্যে বানিয়েছেন...............জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্যে এবং তাদেরকে সকল কাজের ব্যাপারে পারদর্শী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীকে সঠিকভাবে এর উপযোগী বানিয়েছেন, আকাশকে বানিয়েছেন সকল কিছুকে তার আওতার মধ্যে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে। ওদের মধ্যে কেউ কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকে না, আর কেউ কাউকে তিরস্কারও করে না। এর মধ্যে অবস্থিত কোনো জিনিস নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে একটি থেকে আর একটি দূরে চলে যায় না বা সে নিয়ম লংঘন করে কেউ কারো কাছাকাছিও এসে যায় না। যদিও এদের সবার সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে, বরং আরো বড় সত্য হচ্ছে সকলের সমন্বিত কর্মধারার কারণেই মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

তিনিই তো সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আকাশের মধ্য থেকে আসা বৃষ্টি সিঞ্চিত পৃথিবীর মাটি থেকে গোটা সৃষ্টির জন্যে যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন মানুষের জন্যে পাকছাফ খাদ্য খাবার ও উপকারী অন্যান্য বস্তুসমূহ, অতপর মানুষকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি তার আকৃতিকে এমন সুন্দর গঠন দিয়েছেন যার থেকে বেশী সুন্দর আর কিছু চিন্তাই করা যায় না।

তাকে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য ও এমন সব যোগ্যতা দিয়েছেন যার ফলে গোটা সৃষ্টির সব কিছুকে সে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং, এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে, সৃষ্টির বুকে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটি পরস্পর এমন সুসামঞ্জস্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে, যা একটু খেয়াল করলেই নযরে পড়ে। এসব বিষয়কে আল কোরআন এমন সুন্দরভাবে এই একটিমাত্র জায়গায় বর্ণনা করেছে যা আমাদের চিন্তা স্রোতের মধ্যে এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমাদের সামনে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে এমন সব সুস্পষ্ট প্রমাণ হাযির করে দেয় যা গভীরভাবে আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে। তখন পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি যে সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ নয়। এই অনুভূতির আলোকে যে দাওয়াত দেয়া হয় তা মানুষের ওপর সহজে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের মনে প্রত্যয় জাগায় যে, তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা যা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তখন তার অন্তরের মধ্য থেকে আওয়ায বেরিয়ে আসে, আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সে সময়ে তার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে, যিনি এই সৃষ্টিকে চালাচ্ছেন এবং যিনি এসব কিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক হতে পারেন তাঁকেই আমরা আল্লাহ তায়ালা বলে জানি এবং বুঝি, তিনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ভাবতে অবাক লাগে কেমন করে মানুষ এই সুস্পষ্ট সত্য থেকে দূরে থাকতে পারে?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাঝে মাঝে একান্ত হঠাৎ করেই প্রকৃতির কিছু বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। আল্লাহর কেতাবে সে বিশেষ মুহূর্তগুলোর দিকে কিছু অস্পষ্ট ইংগীত রয়েছে বলে বলা হয়। যেমন বলা হয়, 'যদি পৃথিবী সূর্যের সামনে দিয়ে চলার সময় তার মেরু রেখার ওপর আবর্তন না করত তাহলে রাত দিন কখনই পর্যায়ক্রমে এইভাবে আসতো না। ....

আরও বলা হয়, পৃথিবী মেরু রেখার চতুর্দিকে যে গতিতে এখন ঘুরছে যদি তার থেকে একটু বেশী দ্রুত গতিতে তা ঘুরতো তাহলে অবশ্যই নভোমন্ডলের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের ওপর তার প্রভাব পড়তো এবং গোটা পৃথিবীটাই এক সময় ভেংগে চুরমার হয়ে যেতো, এর ফলে আকাশমন্ডলীর সব কিছুর মধ্যে এক চরম বিপর্যয় নেমে আসতো।

যদি মেরু রেখার ওপর পৃথিবী তার বর্তমান গতি থেকে অপেক্ষাকৃত কম গতিতে আবর্তন করতো তাহলে কোনো এক অঞ্চলে তাপমাত্রার আধিক্য এবং অন্য কোনো অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত তাপ হ্রাস হওয়ার ফলে সব মানুষ মরে সাফ হয়ে যেতো। এখন যে গতিতে পৃথিবী নিজ মেরু রেখার ওপর আবর্তিত হচ্ছে, এর সাথে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এর ফলে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে সবকিছুর সাথে পৃথিবী আবহমান কাল ধরে চলছে এবং এর পিঠের ওপর সকল প্রাণীজগৎ তাই আজও বেঁচে আছে।

'পৃথিবী যদি নিজ মেরু রেখার ওপর আবর্তন না করতো তাহলে সাগর মহাসাগর সবই পানিশূন্য হয়ে যেতো।' 'যদি পৃথিবী তার মেরুদন্ডের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার অক্ষরেখার ওপর চলতে চলতে সূর্যের চতুর্দিকে এগিয়ে যেতো, একবার পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে এ পৃথিবীটা ঘুরে না আসত তাহলে কী হতো? সূর্যকে কেন্দ্র করে যদি কক্ষপথ চলতেই থাকতো তাহলে মৌসুমের আর কখনও পরিবর্তন হতো না, মানুষ জানতো না গ্রীষ্ম কি, আর শীতই বা কি, বসন্ত কি, আর শরৎই বা কি।

যদি পৃথিবী পৃষ্ঠের পুরুত্ব আট নয় কদম-এর কিছু বেশী হতো তাহলে পৃথিবীর সমগ্র অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিতো, আর সে অবস্থায় ভূ পৃষ্ঠের কোনো গাছপালাই বেঁচে থাকতে পারতো না।

'আবার যে পরিমাণ বায়ু পৃথিবীর বুকে রয়েছে, তার থেকে একটু বেশী পরিমাণে যদি বায়ু বেড়ে যেতো তাহলে সামান্য কিছু সংখ্যক ছাড়া কোটি কোটি উল্কাপিন্ড পৃথিবীর বুকে পতিত হওয়ার পূর্বেই অক্সিজেনের স্তরের বাইরের বায়ু মন্ডলে তা জ্বলে শেষ হয়ে যেতো। তার অনেকগুলোই সে অতিরিক্ত বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আঘাত করতো এবং এর ফলে পৃথিবী সকল উপাদান ধ্বংস হয়ে যেতো। আলোকময় এসব উল্কাপিন্ডের গতি হচ্ছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এবং এসব উল্কা পিন্ডের আঘাতে সব কিছুই আগুনের অংগারে পরিণত হয়ে যেতো। এমনকি যদি ধীরে ধীরেও সে উল্কাগুলো আসত তাহলেও তা বন্দুকের গুলির গতিতে পৃথিবীতে আঘাত হানতো, ফলে এখানে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হতো। প্রকৃতপক্ষে সে উল্কাগুলো পতিত হতো বন্দুকের গুলী থেকেও কমপক্ষে নব্বই গুণ বেশী দ্রুত বেগে, যার ফলে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।

অক্সিজেন যদি বাতাসের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তার বেশী বা এর পরিবর্তে শতকরা এক'শ ভাগ হয়ে যেতো, তাহলে বিশ্বের সব কিছু আগুনের অংগারে পরিণত হয়ে যেতো। এই সব বিদ্যুতের অগ্নিস্ফুলিংগ কোনো জংগলে পড়ার সাথে সাথে গোটা জংগলটাই অগুনে পরিণত হয়ে যেতো। তাতে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটতো। বাতাসের মধ্যে যদি অক্সিজেন শতকরা দশ ভাগে নেমে আসে অথবা আরো কম হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বাঁচতেই পারতো না। কিন্তু এ অবস্থায় তা মানুষের জীবন থাকবে না, সেটা হবে।(১) প্রচন্ড একটা আগুনের চুল্লি বর্তমানে আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীতে যে অনুপাতে সব কিছুর উপাদান রয়েছে এবং তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে টিকে আছে, এগুলোর মধ্যে সামান্যতম হেরফের হলেই যে কী বিপর্যয় নেমে আসবে তার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। এখন প্রশ্ন আসে, কেন এসব উপাদানের মধ্যে সামান্যতম হেরফেরও হচ্ছে না বা হেরফের হতে পারছে না। কে আছে সব কিছুর মূলে, যার অমোঘ শাসন চলছে এবং যার অভংগুর নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা কারও নেই?

লক্ষ্য করার বিষয় যে, মানুষের এই যে সুন্দর আকৃতি প্রকৃতি, চেহারা সূরত এবং তার অংগ প্রত্যংগের বিন্যাস, সামঞ্জস্যভাবে সব কিছুর মধ্যে একই নিয়মের আনুপাতিক বরাদ্দ, অসংখ্য কর্মকান্ডের জন্যে যোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য প্রত্যেকের শরীরকে সেইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে।এসব কোনো মহাশিল্পীর উদ্ভাবনা? আরও ভাবতে হয়, উপরোল্লেখিত গুণাবলীর সাথে সর্বোত্তম যে গুণটি যোগ হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও তার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। অভূতপূর্ব এ দায়িত্ব দানের সাথে সাথে তাকে যে সব বিশেষ গুণাবলী দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, বুদ্ধি ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শারীরিক গঠন ও অন্যান্য যোগ্যতার সাথে রূহ-এর এক পূর্ব সম্মিলন।

আমরা আরও একটু গভীরভাবে সৃষ্টির এই সেরা সুন্দর মানুষ নামক প্রাণীটির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, তার শরীরের অংগ-প্রত্যংগ ও তার জন্যে বরাদ্দকৃত বৃত্তির মধ্যে এক অকল্পনীয় সামঞ্জস্য রয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জন্যেই তার স্রষ্টা বিশেষ বিশেষ পেশা বা বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার মধ্যে উক্ত বৃত্তি গ্রহণ করার মানসিকতা ও রুচিও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার পছন্দনীয় এই বৃত্তির জন্যে তাকে উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাও তিনি দান করেছেন। তার এ সব গুণাবলী সম্পর্কে এই আয়াতে উল্লেখ এসেছে,

'তিনি তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন, অতপর অতি সুন্দর করে তিনি সে আকৃতিকে গড়ে দিয়েছেন।'

---

(১) ডক্টর আহমাদ যাকী রচিত 'মায়াল্লাহে ফিস্‌সামায়ে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এসব বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো, প্রত্যেকেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংগগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য একক এবং একের সাথে অন্যের কোনোই মিল নেই।

মানুষের বিস্ময়কর এসব অংগ প্রত্যংগ ও যোগ্যতার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ হচ্ছে তার চোয়ালে স্থাপিত দাঁতের পাটিগুলো। এগুলোকে সম্পূর্ণ এক যান্ত্রিক নিয়মে সংস্থাপন করা হয়েছে। এই চোয়ালের কাজটি বড়ই সূক্ষ্ম, কারণ এই চোয়ালের মধ্যে স্থাপিত মাড়ির দাঁতগুলো সংস্থাপন করা হয়েছে মাড়ির মাংসের মধ্যে– যা রয়েছে দশ মিলিমিটার গভীরে, যার ওপর ওপরের মাড়ির দাঁত ও জিহ্বা মৃদু চাপ দেয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে পেটের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। আরও খেয়াল করার বিষয় যে, খাদ্য চিবানোর সময় সামনের দাঁত, পাশের দাঁত বা মাড়ির দাঁতের ওপর ও নীচের মধ্যে ঘর্ষণে যে শব্দ হয় এ সবগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা তাল আছে। এসবগুলোর মাংসের ওপরের অংশগুলো প্রায় সবগুলোই একই মাপের হয়ে থাকে। আর ওপর ও নীচের চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সিগারেটের কাগজের মতোই একটি পর্দা থাকে, উভয় চোয়ালের চাপের সাহায্যে তা খাদ্য চূর্ণ করতে সাহায্য করে। অতপর দাঁতগুলোর চাপ প্রয়োগের ফল প্রকাশ পায় এভাবে যে পুরু খাদ্য টুকরোগুলো বিচূর্ণ হয়ে উদরে প্রবিষ্ট হয়। এরপর আরো চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, যে দুনিয়ার বুকে মানুষের জীবন এইভাবেই চলছে এবং তার বেঁচে থাকার জন্যে তাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য খাওয়ার শিক্ষা প্রকৃতিগতভাবেই দেয়া হয়েছে। এভাবে কাজের যোগ্যতা দিয়েই তাকে তৈরী করা হয়েছে। আলোর কম্পন মাপার যন্ত্র হচ্ছে চোখ, যার দ্বারা সে পৃথিবীতে দেখার দায়িত্ব পালন করে এবং যে শব্দ দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে শোনার দায়িত্ব পালন করে তা মাপার যন্ত্র হচ্ছে কান। মানুষের শরীরের যে কোনো ইন্দ্রিয় বা শক্ত অংগ রয়েছে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ মযবুত জীবনী শক্তি অনুযায়ী এবং তার দেহাবয়ব অনুযায়ী তাকে সীমিত আকারে কিছু শক্তি সামর্থ্য দান করা হয়েছে, আবার পারিপার্শিক অবস্থা অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে এগুলোর মধ্যে কিছু হেরফেরও হয়ে থাকে।

মানুষ এই মহাবিশ্বের বুকে এখানে বসবাসকারী এক সৃষ্টিমাত্র। এ বিশ্বের সব কিছু থেকে সে যেমন প্রভাব গ্রহণ করে তেমনি সে নিজেও এর ওপর প্রভাব ফেলে, আর এ জন্যে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও বিরাজমান রয়েছে। এ সম্পর্ক এ বিশ্বকে গড়ার ব্যাপারে যেমন দরকার, তেমনি মানুষের উন্নয়ন কল্পেও তার প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণেই তার আকৃতি প্রকৃতিকে এই ভাবে গড়ে দেয়া হয়েছে। শুধু পৃথিবীই নয়, আকাশের সাথেও মানুষ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। এই জন্য কোরআনুল করীমের আলোচ্য আয়াতে তার সেই আকৃতির বর্ণনা এসেছে যার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর কথাও বলা হয়েছে। কোরআনের মোজেযার এও একটি চমৎকার দিক বরং একে এক স্বতন্ত্র মোজেযাই বলা যায়।

এই সব সংক্ষিপ্ত ইংগিতের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে, জানানো হয়েছে যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় বন্ধন। আল কোরআনের আলোকে একথাগুলো বুঝার চেষ্টা করা উচিত।

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তোমাদের জন্যে রাত্রি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার মধ্যে প্রশান্তি গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে উজ্জ্বল আলোকে ভরপুর বানিয়েছেন, যার দ্বারা তোমরা সব কিছুকে দেখতে পারো।'

রাত্রির প্রশান্তি সকল জীবজন্তুর জন্যই প্রয়োজনীয়। রাত্রির অন্ধকারের অবসরে সকল জীব কোষগুলো বিশ্রাম পায়, ফলে সেগুলোর মধ্যে এক মধুর শান্তির পরশ জাগে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম হয়ে যাওয়ার ফলে পরবর্তী দিবসের আলো যখন শুরু হয়ে যায়, তখন নবউদ্যমে আবার সবাই কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশান্তি শুধু নিদ্রার মাধ্যমেই আসে না, এর জন্যে অবশ্য রাত্রির সুষমাও প্রয়োজন। দিনের প্রখর আলো যখন নিস্তেজ হয়ে আসে, তখন প্রকৃতির বুকে এক অবর্ণনীয় শান্তি ছেয়ে যেতে থাকে। শরীরের কোষগুলোর তেজ কমে আসতে থাকে। শান্ত শীতল ঘন অন্ধকারের আমেজে শরীরের অভ্যন্তরের সকল কিছুর মত চোখগুলো ঢুলু ঢুলু করতে থাকে, শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। গোটা পরিবেশে যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন বাতি নিভিয়ে দেয়ার সাথে সাথে ঘরের অন্ধকার বাইরের অন্ধকারে সাথে একাকার হয়ে গিয়ে সবাইকে জানাতে থাকে যে, তোমরা আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার ভালোবাসার দান এই আঁধারের পরশে ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ গ্রহণ করো, আপ্লুত হয়ে যাক তোমার দেহ মন, যেন পরবর্তী দিনের কাজ পরম পুলকে ও নবোউদ্যমে শুরু করতে পারো। এটা সত্য যে, যে সব জীব-কোষ সারাক্ষণ আলোর মধ্যে থাকে তারা ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং শরীরের অভ্যন্তরভাগের সকল শিরা উপশিরাগুলোও ক্লান্ত হয়ে যায়। কারণ গোটা বিশ্বের সবকিছুর সাথে মানব প্রকৃতির যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি দেহাভ্যন্তরের সকল কলকবজাগুলোর একটার সাথে অপরটার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর দিনকে দেখানোর ও কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন (বানিয়েছেন)।'

এর জন্যে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা বাস্তব এক চিত্রের মতো ফুটে রয়েছে, দিন যেন এখানে একটি জীবিত সত্ত্বা, যে দেখায় ও নিজে দেখে। আর মানুষরাও যেন সবাই সে দিনের মধ্যে সব কিছু দেখতে পায়, কারণ দেখার এ গুণটাই তার সর্ববিজয়ী গুণ।

এইভাবেই অনাদিকাল থেকে রাত ও দিনের আনাগোনা চলছে এবং রাত ও দিনের এই আসা ও যাওয়াটাই হচ্ছে আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। যদি এ দুটির যে কোনো একটি স্থায়ীভাবে থেকে যেতো বা যদি কোনটা আরও একটু বড় বা আরও একটু ছোট হতো তাহলে পৃথিবীর বুকে সকল প্রাণী খতম হয়ে যেতো। অতএব, রাত ও দিনের পর্যায়ক্রমিক আসা যাওয়াকে আল্লাহর এক বিরাট মেহেরবানী বলাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, অথচ অধিকাংশ মানুষ এ নেয়ামতকে বুঝতে চায় না এবং এর শোকরগোযারীও করে না। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর বড়ই দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'

ওপরে বর্ণিত সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক নেয়ামত দুটির বর্ণনাদানের পর জানানো হচ্ছে যে, এতো বড় সব নেয়ামত যিনি সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তিনিই এই মহান নামের অধিকারী হওয়ার যোগ্য।

'তিনি আল্লাহ, তিনিই তোমাদের রব, তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই। সুতরাং ধোকা দিয়ে তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

আনন্দের বিষয়, হাঁ আনন্দের ব্যাপারই বটে যে, মানুষ সকল কাজের মধ্যে আস্তে আস্তে আল্লাহর হাত দেখতে পাচ্ছে, তারা জানতে বা বুঝতে পারছে যে সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনি। এটা এমন এক সত্য যা, যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, মানুষের বুদ্ধিতে যেমন অন্যান্য সকল কিছুর সত্যতা ধরা পড়ে, তেমনি এসবের মালিক একজন আছেন এবং তিনিই

সকল ক্ষমতার অধিকারী।এটাও সবার নযরে ধরা পড়ে। এ কথা তার আর মনে জাগবে না এবং এ কথার ওপরও তার দৃঢ়তা আসতে পারে না যে, কোনো বস্তু সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনি এমনিই বাস্তবে এসে গেছে। এটা আজব কথা যে, সব কিছু আপনা থেকেই বাস্তবে এসেছে। এ সব কথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অবশ্য মানুষের মনে এসব কথা দোলা দেয় এর পরও মানুষ ঈমান ও সত্যকে স্বীকার করা থেকে দূরে সরে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং ধোকা খেয়ে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?'

এতদসত্তেও মানুষ এ সরল ও স্পষ্ট সত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আল কোরআন প্রথম যাদেরকে সম্বোধন করেছিলো সে কোরায়শদের পক্ষ থেকেও এসব অস্বীকৃতির ঘটনা ঘটেছে। এমনি করে প্রত্যেক যামানাতেই এ রকম কিছু হঠকারী ও সত্য বিরোধী লোক থাকে, তারা কোনো যুক্তি মানে না, অকারণে ও কোনো প্রমাণ ছাড়াই তারা এইভাবে সত্য বিরোধী তৎপরতায় লেগে থাকে। এরশাদ হচ্ছে, 'তারাই এইভাবে বিভ্রান্ত হয় ও ভুল পথে এগিয়ে যায়, যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে।'

সৃষ্টি যার সার্বভৌমত্বও তাঁর

এবারে রাত ও দিন-এ দুটির সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিস্ময়কর বিষয় থেকে নযর ফেরানো হচ্ছে সেই পৃথিবীর অবস্থার দিকে, যাকে স্থির থাকার জন্যে এবং আকাশকে ছাদ-স্বরূপ বানানো হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন স্থির এবং আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ।'

পৃথিবী স্থির ও মানুষের বাস করার জন্যে উপযোগী হয়ে রয়েছে এবং এমন চমৎকারভাবে মানুষ যাবতীয় প্রাণীর আবাসস্থলের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যার দিকে আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে ইংগিত করেছি। আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ বা দূর্গ বানানো হয়েছে যা দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে রয়েছে, যা হেলে দুলে পড়ে যায় না বা নড়বড়ে হয়েও যায় না। এ আকাশ কাউকে প্রদক্ষিণও করে না। ফলে যে মহাকাশ মানুষ ও জীব জগতের জন্যে স্থির তা স্থায়িত্বের দায়িত্ব বহন করে চলেছে বলে বুঝা যায়। এই গোটা অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এ মহাকাশ যেন এক গ্যারান্টি এর নির্মাণ পূর্বনির্ধারিত এক অমোঘ সিদ্ধান্তক্রমে সম্পন্ন হয়েছে এ নিশ্চিত ধারণা সবার মনেই জাগে।

এরপর আরও গভীরভাবে খেয়াল করলে বুঝা যায়, আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব সকল প্রকার পাক পবিত্র ও নিরাপদ বস্তুসমূহ থেকে মানুষের জীবন ধারণ সামগ্রীর সরবরাহ করার উৎস। এসব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজ করছে। এসব এমন রহস্যঘেরা বাস্তবতা, যার দিকে তাকালে হয়রান হয়ে যেতে হয়। সেগুলোর কোনো কোনোটার দিকে আমরা ইতিমধ্যে ইশারা করেছি, যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি তোমাদের বিভিন্ন আকৃতি দিয়েছেন, অতপর অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি গড়েছেন এবং তিনি পবিত্র খাদ্য ও বস্তু থেকে তোমাদেরকে রেযেক দিয়েছেন।'

এ সকল আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিভিন্ন দানের কথা বলার পর জানানো হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা বলে যাঁকে তোমরা জানো তিনিই তোমাদের রব। সুতরাং বরকতময় (অভাবনীয় কল্যাণময়) আল্লাহ জাল্লা শানুহু, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

সকল প্রকার কমতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র সেই মহান সত্ত্বাই সবকিছুকে পয়দা করেছেন এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন এবং সকল কিছুকে তিনিই পরিচালনা করেন। দুনিয়ায় বসবাস করার সময় তোমাদের সবাইকে তিনিই চালাচ্ছেন এবং তোমাদের জন্যে তাঁর রাজ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান তিনিই নির্ধারণ করে রেখেছেন ..... সেই মহান পরওয়ারদেগারের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বলছেন, 'মহা বরকতময় আল্লাহ তায়ালা।'

অর্থাৎ তাঁর বরকতের ভান্ডার শুধু বাড়ছেই বাড়ছে, যেহেতু তিনি সারা বিশ্বের সবার মালিক।

তিনি একই ভাবে চিরদিন জীবিত আছেন ও থাকবেন। তাঁর নিজের শক্তিতে তিনি চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তাঁর অস্তিত্ব চিরদিন আছে চিরদিন থাকবে। এমন নয় যে, কোনো সময় তাঁর অস্তিত্ব ছিলো না। কিংবা কেউ তাঁর অস্তিত্বকে বাস্তবে এনেছে বা অন্য কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেছে বরং তিনি চিরদিন আছেন, চিরদিন থাকবেন। তাঁর কোন শুরু বা শেষ নেই। তাঁর কার্যক্রমের পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বা তাঁর কাজ কেউ শেষও করে দিতে পারে না। তাঁর কাজের গতি কেউ ঘুরিয়ে দিতে পারে না বা তাঁর কীর্তি কেউ পরিবর্তিতও করতে পারে না। তাঁর চির জীবিত থাকার এই গুণের অধিকারী আর কেউ হতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি একক। এই একত্ব বা একক ভূমিকা। আর কেউ লাভ করতে পারে না।

সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক হওয়া, এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁরই এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ কোনোভাবেই হতে পারে না। কেউ চিরঞ্জীব হতে পারে না। একমাত্র তিনি একাই চিরদিন আছেন-চিরদিন থাকবেন, তিনিই আল্লাহ তায়ালা। তাই এরশাদ হয়েছে,

'সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক, তিনি ছাড়া কেউ নেই।'

অতএব, একমাত্র তাকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্য করতে গিয়ে এবং একমাত্র তাঁরই জীবন বিধানের অনুসারী হয়ে।' .... আর দোয়া প্রার্থনা করতে গিয়ে শুধু তাঁর কাছেই চাও এবং তাঁরই কৃতিত্বের কথা ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর তারীফ করো, বলো। 'আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন (সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টিকূলের প্রতিপালক)।

আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার এসব নিদর্শন এবং তাঁর অবদানের কথা সামনে রেখে, যে সব শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর একত্ব সম্পর্কে তাঁর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এবং তাঁর আইন দাতা হওয়া সম্পর্কে যে সব ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে সব কিছুকে সামনে রেখে এবার রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশ আসছে, যেন তিনি তাঁর জাতির কাছে ঘোষণা দিয়ে দেন যে, তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সে সকল বস্তু ও ব্যক্তির গোলামী করতে, যার বা যাদের সামনে তারা বিনা যুক্তিতে মাথা নত করে। তিনি যেন ওদেরকে আরও জানিয়ে দেন যে, তাঁর প্রতি ইসলাম গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পুরোপুরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসর্ম্পণের জন্যে তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'বলো হে রসূল, আমাকে মানা করা হয়েছে তাদের নিশর্ত আনুগত্য করতে, যাদের তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (সাহায্যের জন্যে) ডাকো। বিশেষ করে যখন আমার কাছে আমার রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এসে গেছে। আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

অর্থাৎ হে রসূল, তুমি ঘোষণা করে দাও সে সকল লোকের কাছে, যারা আল্লাহর আয়াতগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নেয়ামতগুলোকে অস্বীকার করছে, 'বলো তোমাকে সেসব ব্যক্তি বা বস্তুর এবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (সাহায্যের জন্যে) ডাকে এবং তাদেরকে বলে দাও যে, আমাকে মানা করা হয়েছে (অন্য কারো গোলামী করতে) আর যখন আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে গেছে তখন তা আমি কেন করতে যাবো? সুতরাং আমার কাছে (সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্যে এবং সত্যের ওপর টিকে থাকার জন্যে) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে। আমি তার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখি। আর এটাও সত্য যে, এই স্পষ্ট সত্যের পক্ষেই আমি ধৈর্য ধরে টিকে আছি, একে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং এর সত্যতার ঘোষণা করছি; উপরন্তু আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও এবাদাত করা বন্ধ করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে অপরের অন্ধ আনুগত্যের প্রতি সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি বা না সূচক কথা। আমি আরও জানাচ্ছি যে 'ইসলাম' বা আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যেই নির্দিষ্ট। এটাই হচ্ছে ইতিবাচক কাজ, এই দুটি কাজ এক সাথে হলেই তবে আকীদা বিশ্বাসের পূর্ণতা আসে।

জীবন মৃত্যুর পর্যায়ক্রমিক ধারা

এরপর প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর আয়াতগুলোর মধ্য থেকে বা তাঁর শক্তি ক্ষমতার অসংখ্য চিহ্ন সমূহের মধ্য থেকে একটি তাদের কাছে পেশ করা হচ্ছে এবং তা হচ্ছে মানুষের জীবন এবং তার বিচিত্র ব্যবহারগুলো। মানুষকে তার জীবনের মূল তাৎপর্য বুঝার জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে একথা বুঝতে হবে। এই যে জীবন রয়েছে এর থেকেই কিছু নযির বা কিছু তথ্য এগিয়ে দিতে হবে, যেমন,

'তিনি তোমাদেরকে .... হয়ে যাও, ব্যস হয়ে যায়।' (আয়াত ৬৭-৬৮)

ওপরে বর্ণিত কথা এ চিত্র হচ্ছে মানব জীবনের সূচনা লগ্নের অবস্থা। এটা ছিলো মানুষের অস্তিত্ব বাস্তবে আসার প্রাথমিক ইতিহাস। এ সময়ে অন্যান্য যে সব অবস্থা সামনে আসে সেগুলোও আলোচ্য প্রসংগে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আল কোরআন অবতরণের পর এ বিষয়ক আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে, তাও তো বহু শতাব্দী আগের কথা!

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। এটা মানব সত্ত্বার অস্তিত্বের প্রথম কথা। এর দ্বারা আরও জানা যায় যে, পৃথিবীতে সকল জীবনের মূলেই রয়েছে এই মাটি। সব জীবনের মতোই তো মানুষের এই জীবন, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না কেমন করে এ অলৌকিক অবস্থার অবসান ঘটল। এটাও কেউ জানেনা পৃথিবীর ইতিহাসে ও মানব জীবনের ইতিহাসে এতো বড় একটা ঘটনা কেমন করে সংঘটিত হলো। তারপর বৈবাহিক জীবনের পদ্ধতি অবলম্বনে মানব সন্তানদের বৃদ্ধি হতে লাগলো, অতপর মানুষ পুরুষ জীবকোষ নিক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবে আসতে লাগলো, সে জীবকোষ হচ্ছে ডিম্বকোষ এর সাথে শুক্র বীজের সম্মিলন এবং মাতৃ গর্ভাশয়ে রক্তপিন্ড হিসাবে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার অবস্থান গ্রহণ। মানব জীবনের সফর পরিক্রমায় এই রক্তপিন্ড বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে ভ্রূণের আকার নেয়। চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে, জরায়ুর মধ্যে প্রথম জীব কোষের প্রবেশের পর বহু বড় বড় ও দীর্ঘ পর্যায় অতিক্রম করার পর এ শুক্রকীটটি অবশেষে নবজাতক শিশু হিসাবে ভূমিষ্ট হয়। যদি আমরা গভীরভাবে এই ক্রমিক ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাবো যে মানব শিশুর জন্মলগ্ন থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত

তাকে আরও বহু পর্যায় পাড়ি দিতে হয়। শিশুকাল থেকে কৈশোর ও যৌবনকাল এবং এ সময় কাল প্রায় ত্রিশ বছর। এরপর প্রৌঢ়ত্ব ও তৎপরবর্তীকালে বার্ধক্য। এ সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ত্রিশের পূর্বেকার উদ্যম উৎসাহ, শক্তি সাহস ও বলবীর্য কমে আসতে থাকে, অর্থাৎ ত্রিশোর্ধ বয়সের সময়কালের শুরু থেকে নিয়ে এর শেষ পর্যন্ত হচ্ছে দুর্বলতার সময়। এই আয়াতাংশ এই দিকেই ইশারা করেছে, 'এ সময়ের মধ্যে কিংবা তার আগেই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করে) অর্থাৎ এই সব পর্যায়ের সবগুলো অথবা এগুলোর কোনো কোনোটি পর্যন্ত পৌঁছুবার পূর্বেই কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু দেয়া হয়, আবার কাউকে অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হয়। তবে যাই হোক না কেন তা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। এ সময় আসার আগেও কেউ মরবে না এবং এরপরও কারো মৃত্যু আসবে না।

'আর হয়তো (এর থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।'

সুতরাং জরায়ুর মধ্যে থাকাকালীন সফর ও বাচ্চা আকারে পৃথিবীর জীবনে এসে বসবাস করার এই সফরের সময়ের মধ্যে এমন সময় মানুষকে দেয়া হয়, যখন সে চিন্তা করার ক্ষমতা পায় এবং তাকে সুন্দর চরিত্রের বিকাশ ঘটানোর মত সুযোগ দেয়া হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সে তার তাকদীর নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে পারে। এর মধ্যে যে কোনো মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী মানুষেরা চিন্তা করবে, যে ভ্রূণের এই পথ পরিক্রমা অবশ্যই বেশ মূল্যবান এবং এ সময়ে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি এক আজব রহস্য ভরা ব্যাপার। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং ভ্রূণ বিজ্ঞান আমাদেরকে কিছু নতুন জ্ঞান দিয়েছে, কিন্তু প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আল কোরআন আমাদেরকে ইশারায় এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে এমনভাবে জ্ঞান দিয়েছে যে, সেদিকে খেয়াল করে দেখলে আজ আমাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় আর এই কারণেই এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটু ধীর স্থিরভাবে চিন্তা না করে দ্রুত গতিতে কেউ এগিয়ে যাবে তা সম্ভব নয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, ভ্রূণ ও শিশুকালের পর্যায়ক্রমিক পরিক্রমা দুটি মানুষের অনুভূতির জগতে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং যে কোনো পরিবেশে ও জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। অতীতেও দেখা গেছে এ বিষয়ে মানুষ তাদের জ্ঞান গবেষণার উৎকর্ষ অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা করেছে। এ জন্যে সব যুগের সকল মানুষকে লক্ষ্য করে আল কোরআন কথা বলেছে। ফলে মানুষ আজ এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারছে। কিন্তু আশ্চর্য এরপরও কেউ কোরআনের ডাকে সাড়া দিচ্ছে, আর কেউ দিচ্ছে না।

এরপরে জীবিত করা ও মৃত্যু দান করার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে সৃষ্টি ও সবার দুনিয়ার বুকে ব্যাপ্তি সম্পর্কে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি যিন্দা করেন ও মৃত্যুদান করেন, তারপর যখন তিনি কোনো বিষয়ে ফায়সালা করতে চান, বলেন, হয়ে যাও আর অমনি তা হয়ে যায়।'

জীবন ও মৃত্যু, আল্লাহর ক্ষমতার এই দুটি নিদর্শনের ওপর আল কোরআনের বহু ইশারা এসেছে। কারণ এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গভীরভাবে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তারপর তা আমাদের জানায় যে, এই উভয় বিষয়ই সাধারণ মানুষের কাছে এমন এক প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিষয় যা প্রত্যেক মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে এবং এ দুটির ওপর সঠিকভাবে চিন্তা করার মাধ্যমেই মানুষের জীবনে শান্তি ও সৌন্দর্য নেমে আসতে পারে। মানুষের কাছে সর্বপ্রথম এবং সব থেকে

দৃশ্যমান যে জিনিসটি ধরা পড়ে তা হচ্ছে জীবন এবং মৃত্যু। এ জীবনের কতো রং তা ভেবে পাওয়া মশকিল, অনুরূপভাবে মৃত্যুরও রয়েছে বহু ধরণ। বাহ্যিকভাবে ভূমিকে মৃত দেখায় তারপর আবার এই মৃত ভূমির মধ্যে জীবনের স্পন্দন দেখা দেয়। মৌসুমের বিশেষ বিশেষ সময়ে গাছের বহু ডাল এবং পাতা শুকিয়ে যায়। শীতকালে সাধারণভাবে গাছের পাতা ঝরে যায়। তারপর এই জীবন মৃত্যুর ধারা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর আওতায় ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর সকল প্রাণী ও গাছপালা, সবুজ বৃক্ষ-লতা-পাতা। জীবন-মৃত্যুর এ ধারা অব্যাহত থাকায় সবুজ শ্যামল পত্র পল্লবে গোটা পরিবেশ ভরে ওঠে, গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল মূলে ভরে যায় বাগ বাগিচা। এ সব তো জীবনেরই স্পন্দন তাদের জ্যন্ত এবং প্রাণের পরশ।

তারপর নযরে পড়ে পাখীকূলের ডিম, যার থেকে নাদুশ নুদুশ বাচ্চা বের হয়ে আসে। এরপর দেখতে পাই ফলমূল ও গাছপালার বীজ, যার থেকে সবুজ শ্যামল বৃক্ষ বেরিয়ে আসে। অপরদিকে এর বিপরীত পরিক্রমা দেখা যায়, জীবন থেকে মৃত জিনিসের নির্গমন। ঠিক তেমনি করে মৃত জিনিস থেকে জীবন সঞ্চারের রহস্যও এখানে জানা যায়। এ দুটি ধারার সবগুলো মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে। এ রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং এ সব জীবন মৃত্যু ও মৃত্যু জীবন সম্পর্কিত পর্যায়ক্রমিক ধারা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এটা অতীব সত্য কথা যে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অবস্থা থেকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পাওয়া যায়।

জীবন ও মৃত্যুর এই যে পর্যায়ক্রমিক ধারা-এ সবের ওপর চিন্তা ভাবনা করলে কি করে মানুষ পয়দা হলো এবং তার সৃষ্টিকালে কি কি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিলো এগুলো জানার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে এক কৌতুহল উদ্রেক হয়। এ বিষয়ের ওপর সঠিকভাবে একমাত্র আল কোরআন থেকেই আমরা জানতে পারি। আমরা এতটুকু জানতে পারি যে, মহামহিম আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখনই সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন, বলেছেন, 'হয়ে যাও', আর অমনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে গেলো। এইভাবে অন্য যতো কিছুই তিনি করতে চেয়েছেন, শুধু একটি কথাই বলেছেন, 'হয়ে যাও' আর অমনি হয়ে গেছে। বিশ্বজগতের সবখানে ও সব কিছুর মাঝে এই একই সৃষ্টির গতিধারা চলতে থেকেছে। সুতরাং বড়ই বরকতময় আল্লাহ তায়ালা যিনি অতি উত্তম সৃষ্টিকারী।

ভয়ংকর আযাবের কিছু দৃশ্য

মক্কার কোরায়শদের সামনে একাধারে মানবগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি ও তাদের এসব আয় উন্নতি ছিলো, তারা জীবন মৃত্যুর সর্ববোধগম্য দৃশ্য দেখছিলো। মানুষের অগ্রগতি ও আবিষ্কারের তাৎপর্য তারা বুঝতে পারছিলো, এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর আয়াতগুলোর ওপর বিস্ময় প্রকাশ করছিলো এবং তাঁর নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছিলো। তাদের কাজে, কথায় ও আচরণে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছিলো যে তারা রসূলদের কার্যাবলীকে ঘৃণা করতো, তাদের প্রচারের ওপর আশ্চর্যান্বিত হতো এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যে তারা তৎপর ছিলো, এমন কি যাকে পরোপকারী ও ভালো লোক বলে তারা জেনেছে এবং সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে ও ভালোবেসে 'আল আমীন' বলে খেতাব দিয়েছে, তাকেও তারা ধন সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি ও সর্দারী বা নেতৃত্বের খাতিরে জেনে বুঝে মিথ্যাবাদী বানানোর জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে। এ কারণেই তাদের সামনে কেয়ামতের ভয়ানক আযাবের দৃশ্য তুলে ধরে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে,

'তুমি কি দেখনি ...... সুতরাং নিকৃষ্ট সেই অহংকারী ব্যক্তিদের ঠিকানা।' (আয়াত ৬৯-৭৬)

ওপরের আয়াতগুলোতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে সেই সকল মানুষ সম্পর্কে, যারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিভিন্ন শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শনের ওপর তর্ক বিতর্ক করে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'তুমি কি দেখনি সেই ব্যক্তিদেরকে, যারা আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে ঝগড়া করছে? কেমন করে ওদেরকে (সঠিক পথ থেকে) ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

'ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যারা আল কেতাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আর সেই সব জিনিসকে অস্বীকার করেছে যা দিয়ে আমি আমার রসূলদেরকে পাঠিয়েছি'।

ওপরে সব রসূলদেরকেই অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে, অথচ তারা তো একটি কেতাব এবং একজন রসূলকেই অস্বীকার করেছে। আসলে এর অর্থ হচ্ছে রসূলদের মিশন একই, একই দাওয়াত এবং একই সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে তারা সবাই এসেছেন। তাদের সবার আকীদা একই এবং যা কিছু তারা করেছেন তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে শেষ রসূল (স.)-এর ওপর। এ জন্যে একজন রসূলকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সকল রসূলকেই অস্বীকার করা।

এতোসব কথার পরও যখন তারা হঠকারিতা থেকে বিরত হচ্ছে না এবং নবী (স)-এর বিরোধিতা করেই চলেছে, তখন তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।'

তারা কি জানতে পারবে তা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তারা জানতে পারবে যে তাদেরকে যে আযাব দেয়া হবে তার মধ্যে যাবতীয় কষ্টসহ চরম অপমান ও হীনতার গ্লানি থাকবে। শুধু শাস্তিই নয়, বরং

'তাদের গলায় ও হাতে পায়ে হাঁসুলি এবং শেকল থাকবে এবং শৃংখলিত অবস্থায় তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

সামনের দিকে হাটতে অনিচ্ছুক গরু ছাগল ও জীব জানোয়ারকে যেমন করে জোর করে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি করে চরম অপমানের সাথে তাদেরকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কিভাবে তাদেরকে আজ সম্মান দেয়া যেতে পারে! ওরা তো তাদের ওপর থেকে সম্মানের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুলে ফেলে দিয়েছে! এই চরম অপমানের সাথে টেনে হেঁচড়ে, টানতে টানতে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়ার পর তাদের এই যাত্রা শেষ হবে। আল কোরআনে তাদের সেই ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও করুণ অবস্থার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'এরপর গরম পানি ও জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাদের নিক্ষেপ করা হবে।'

অর্থাৎ, বেঁধে ও গ্রেফতার করে তাদেরকে তেমনিভাবে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমন করে কুকুরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের জন্যে সে স্থানটিতে গরম পানি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন থাকবে এবং এইভাবেই তাদের বিচারের সমাপ্তি ঘটবে।

এই কঠিন ও অপমানজনক আযাবের মধ্যেই তাদের প্রতি ধমক ও লজ্জাদায়ক তিরস্কারসমূহ বর্ষিত হতে থাকবে; যেমন 'তারপর তাদেরেকে বলা হবে 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ক্ষমতাবান মনে করতে এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক ভাবতে, তারা আজ কোথায়? তখন তারা বুঝতে পারবে কিভাবে তারা ঠকেছে, চরম লজ্জিত হয়ে ও কাতরকণ্ঠে 'তারা বলবে

(আজ) ওরা আমাদের থেকে সরে গেছে। না, আমরা তো এর আগে কারো পূজা অর্চনা বা অন্ধ আনুগত্য করতাম না।'

অর্থাৎ, সেই কঠিন দিনে মোশরেকরা তাদের পরিচালকদের সম্পর্কে বলবে, আমরা যাদের কথামতো শেরেক করতাম বা যাদেরকে আমরা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার অংশীদার মনে করতাম, তারা সবাই আজ আমাদেরকে এই কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে, আজ তাদের খুঁজে বের করার কোনো উপায়ই আমাদের কাছে নেই। তারাও এগিয়ে এসে তাদের কাছে পৌঁছানোর কোনো পথ আমাদের বাতলে দেবে না। আমরা সেদিন বুঝে-সুঝে যে কারো অনুসরণ করতাম তা নয়, আমাদেরকে সেই সব প্রভাবশালী লোকেরা ভুল বুঝিয়ে এইসব কাজ করিয়েছিলো এবং আমরাও বিভ্রান্তির জালে আটকা পড়ে এমন ধোকা খেয়েছিলাম যে কিছুতেই সত্য কথাটা তখন বুঝতে পারিনি, তাই আজ আমাদের এই দুর্দশা।

তাদের সেই অসহায় মূলক এই জবাবের পর পরই তাদের সবার জন্যে এক চরম ধমক আসবে।

'হাঁ এমনি করেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে সত্য সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেন।'

এরপর আরেকটি ধমক আসবে,

'পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে তোমরা যে ফূর্তি ও অহংকার করেছিলে, তারই পরিণতিতে আজ তোমাদের জন্যে এই (কঠিন সাজার) ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব, জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো। চিরদিন তোমরা সেখানে থাকবে, এই নিকৃষ্ট বাসস্থানই অহংকারীদের সঠিক ঠিকানা।'

কে আছো আজ আমাদের সাহায্যকারী! আজ জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে এবং গলায় বেড়িপরা অবস্থায় আমাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আজ আমাদেরকে উত্তপ্ত পানি ও আগুনের মধ্যে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে হচ্ছে, কেউ আছে কি, আমাদেরকে রক্ষা করার? ওপরের আয়াতটি পড়ে মনে হচ্ছিল, চিরস্থায়ী জাহান্নামে দাখেল হওয়ার পূর্বে তাদের পক্ষ থেকে এই কথাগুলোই বলা হবে।

'অতএব, নিকৃষ্টতম ঠিকামা অহংকারীদের জন্যে।..........'

উক্ত আয়াতে বুঝা যাচ্ছে বড়াই করার জন্যেই তাদের এই অপমানকজনক শাস্তি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, অহংকারের প্রতিদানেই বরাদ্দ হয়েছে এই ঘৃণাব্যঞ্জক কঠিন সাজা!

দাওয়াতী কাজে সবরের অপরিহার্যতা

এই দৃশ্যের সামনে রয়েছে দোযখবাসীদের অপদস্থ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমানের দৃশ্য এবং তাদেরকে প্রদত্ত ভয়ানক আযাবের ছবি, আরও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে তারা যে তর্ক বিতর্ক করতো এবং বুক ভরা অহংকার নিয়ে তারা যে ফুলে ফেঁপে উঠতো, তাদের অপমানজনক পরিণতির দৃশ্য। এ কঠিন পরিণতিকে সামনে রেখেই আলোচনার গতিকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে ফেরানো হচ্ছে। তাঁর জাতি চরম অহংকার করার কারণে তাঁর সাথে যে তর্কে লিপ্ত হচ্ছে, সে অবস্থায় তাঁকে সবর করার জন্যে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে যে, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা সর্বাবস্থাতেই সত্য, সে সাহায্য আসবেই, সে ওয়াদার কিছু অংশকে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি হয়ত পূরণ করবেন, অথবা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে তাঁর কাছে তুলে নেবেন এবং সকল কাজের দায়িত্ব তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে

নেবেন। কী ফয়সালা তিনি করবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স.)-এর দায়িত্ব তো শুধু মানুষের কাছে আল্লাহর কথা পৌঁছে দেয়া, তারপরই তিনি দায়িত্বমুক্ত। সবাইকে অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'অতএব ধৈর্য অবলম্বন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি আমার ওয়াদা করা সাহায্যের কিছু অংশ যদি আমি এখন তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা যদি (তা দেখানোর আগে) তোমাকে আমি আমার কাছে তুলে নেই (সেটা হবে আমার মর্জি) জেনে রেখো, অবশেষে আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে।'

এখানে আমাদের চিন্তাস্রোত একটা মোড়ে এসে থেমে যাচ্ছে, সেখানে বেশ গভীরভাবে তাকে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে এবং খুবই সন্তর্পণে ও যথাসাধ্য ধীরস্থীর ভাবে তাঁকে তার গন্তব্যপথ বেছে নিতে হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সেই রসূল, যাঁকে তাঁর জাতির তরফ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রত্যাখ্যান, দাম্ভিকতা, অমান্যতা ও চরম অবজ্ঞায় কষ্ট পেতে হচ্ছে। এসময়ে তাঁকে যা বলা হচ্ছে তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করো, পরিণতি কী হবে সেটা তোমার ব্যাপার নয়। আল্লাহর পেয়ারা হাবীব (স.) এ হুকুম যথাযথভাবেই তামিল করেছিলেন, যার ফলে এতোসব কঠিন অবস্থায়ও তিনি সান্ত্বনা-বোধ করছিলেন। তাঁর অন্তরের মধ্যে একথা বিরাজ করছিলো যে, তিনি দেখতে পাবেন, সেই উদ্ধত ও প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর অবশ্যই কিছু না কিছু আযাব এসে পড়েছে, বেশীদিন তাঁর অন্তরকে ঝুলিয়ে রাখা হবে না! আল্লাহ রব্বুল আলামীন অবশ্যই তাঁর কাজ করবেন এবং তাঁর কাজ করার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর ওয়াদা তিনি পালন করবেনই এবং তাঁর রাজ্যে তাঁর ক্ষমতা অবশ্যই চলবে। সুতরাং এটা নবীর নিজের কোনো সমস্যা নয় এবং কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া এটা তাঁর ব্যাপারও নয়। সকল কাজই আল্লাহর কাজ এবং তিনি তাইই করেন যা তিনি করতে চান। ইয়া আল্লাহ! হে মহামহিম সম্রাট, হে পরওয়ারদেগারে আলম, হে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-বিধানকারী, তুমি আমাদের আকুল আবেদন শুনো, তোমার সম্মানিত ও পেয়ারা নবীর পদাংক অনুসরণ করে যারা বাতিলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাদের করুণ কণ্ঠের দোয়া কবুল করো, যারা তোমার নবীর পথে থেকে এ দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাদেরকে তুমি সাহায্য করো।

এতোসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা মানুষের জন্যে সত্যিই একটা কঠিন ব্যাপার। এ এমনই এক ব্যাপার যেখানে বড় ধৈর্যের প্রয়োজন, প্রয়োজন বড় শক্ত হৃদয়ের। এখানে যে জিনিসটি মানুষকে তার মিশনে অনমনীয় করে রাখতে পারবে, তা হচ্ছে সকল অবস্থাতেই অবিচল হয়ে থাকা এবং কোনো অবস্থাতেই মুষড়ে না পড়া। এই সবর-এর কথাটাকেই আলোচ্য সূরার মধ্যে বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সবর-এর গুণটি অর্জন করার জন্যে ইতিপূর্বে বারবার বলা হলেও এই সূরার মধ্যে এক নতুন আংগিকে এই মহামূল্য গুণটি পয়দা করার জন্যে বিশেষভাবে তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সত্যের দিকে দাওয়াত দানকারীদের হঠকারী ও আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীর তরফ থেকে যে কষ্ট দেয়া হয়, যে অহংকার প্রদর্শন করা হয় এবং যেভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাতে হয়তো তাদের সবর থেকেও আরও বেশ কিছু কঠিন গুণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই সব মহামূল্যবান গুণের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন যা তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আজ বড় প্রয়োজন!

বিভিন্ন মানবীয় ঝোঁক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির তাড়ন থেকে এ প্রশ্নে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখা এবং দেখতে থাকা যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুশমন এবং তাঁর দাওয়াতের বিরোধীদের সাথে কী ব্যবহার করেন। এটি একটি কঠিন অবস্থা। কারণ মানুষ হিসাবে সেই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে এবং মন চায় যে তাদের প্রতি কঠিন একটা শাস্তি নেমে আসুক। এটা মানুষের প্রকৃতির সাধারণ দাবী। কিন্তু মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবাণী ও তাঁর বিবেচনা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভালোদেরকে খুঁজে বের করেন এবং মন্দের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ভালো কাজে মনোনিবেশ করলে তাদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন। তিনি সকল মহল থেকে ভালো লোকদেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে ভালোর দিকে টানতে উৎসাহিত করেন এবং একথা জানান যে, তাদের মধ্যেও অনেক ভালো লোক থাকা সম্ভব, যদিও দ্বীন-ইসলামের বিরোধিতা করায় ওদের বিরুদ্ধে মন খারাপ হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতগুলো অধ্যয়নকালে অন্তরের মধ্যে যখন এভাবে পরিবর্তন অনুভূত হয় সেই সময় এবং সেই সকল নাযুক মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনারত হৃদয়গুলোকে তার কাছে সোপর্দ করা দরকার। এই নশ্বর পৃথিবীতে আশা আকাংখা, লোভ লালসা ও চাহিদা সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার সময় এই নিবেদিত প্রাণের আকুতিভরা আত্মসমর্পণই মোমেনের একমাত্র রক্ষাকবচ। কেননা এসব অদম্য চাহিদা ও খাহেশ সর্বাগ্রে মানুষকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, আর পরক্ষণেই শয়তান চাহিদা জগতের সীমাহীন হাতছানিতে সাড়া দেয়ার জন্যে তাকে অবিরতভাবে উস্কানি দিতে থাকে তখনই সে আবেগের মহাসাগরবক্ষে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। এই অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্যে মহাদয়াময় পরওয়ারদেগারে হাকীম সর্বকালে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا
جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

৭৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক) নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি, (আবার এমনও আছে) তাদের কথা তোমার কাছে আমি আদৌ বর্ণনাই করিনি; (আসলে) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (সে ফয়সালায়) ক্ষতিগ্রস্ত হবে একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই।

রুকু ৯

৭৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই (মহান) সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার (কতেক প্রকারের) ওপর আরোহণ করতে পারো, আর তার (মধ্যে কতেক প্রকারের) তোমরা গোশত খেতে পারো, ৮০. তোমাদের জন্যে তাতে আরো বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, তোমাদের নিজেদের মনের (ইচ্ছা) ও প্রয়োজনের স্থানে (তাদের নিয়ে) উপনীত হতে পারো, (তোমরা) তার ওপর (যেমনি আরোহন করো তেমনি) নৌকার ওপরও তোমরা আরোহণ করো; ৮১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কুদরতের আরো) নিদর্শন দেখাচ্ছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে (বলো)! ৮২. এরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি, (করলে) তারা অতপর দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিলো; তারা সংখ্যায় এদের চাইতে ছিলো অনেক বেশী, শক্তি ক্ষমতা এবং যমীনে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তারা (ছিলো) অনেক প্রবল, কিন্তু তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি। ৮৩. যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

হাযির হলো, তখন তাদের কাছে জ্ঞানের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে তারা গর্ব করলো এবং (দেখতে দেখতে) সে আযাব তাদের এসে ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ৮৪. অতপর তারা যখন (সত্যি সত্যিই) আমার আযাব আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, হাঁ, আমরা এক আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনলাম, যাদের আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করতাম তাদের আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। ৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখলো, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারেই এলো না; আল্লাহ তায়ালার এ নীতি (হামেশাই) তাঁর বান্দাদের মাঝে (কার্যকর) হয়ে আসছে, আর এখানে কাফেররা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাফসীর
আয়াত ৭৮-৮৫

এইটিই হচ্ছে বিগত অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচিত বিষয়ের সম্পূরক কথা; এইটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স.) ও মোমেনদের হৃদয়কে অস্থিরতা থেকে রক্ষা করে অবিচল ও দৃঢ় আস্থা নিয়ে ঈমানের পথে টিকে থাকার শেষ রক্ষাকবচ। যখন এইভাবে মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং বিগলিত ধারায় তার অশ্রু ঝরাতে থাকে তখনই মহান আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার দেখা দেয়, আর তিনি তার মনকে নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত ও অবিচল বানিয়ে দেন। তখন তাদের জন্যে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয় এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি তাদের প্রাপ্য শাস্তি নেমে আসে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্যে আল্লাহর দেয়া এ ওয়াদা তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হবে, না তাঁর ওফাতের পর মানুষ তা দেখবে– সেটা আল্লাহরই ইচ্ছা। এতে তাঁর কিছু করার নাই, যেহেতু এ বিষয়ে ফায়সালা করা তাঁর নিজের ব্যাপার নয়। তাঁর কাজ হচ্ছে, যে আকীদা নিয়ে তিনি এসেছেন তার প্রচার ও প্রসার ঘটানো, মোমেনদেরকে শিক্ষাদান এবং এ আকিদাকে প্রতিহত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত বিরোধী ও অহংকারী জনগণকে বুঝানোর জন্যে অবিরাম চেষ্টা করে যাওয়া। এ বিষয়ে ফয়সালার মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজেই। তিনিই এ আন্দোলনকে পরিচালনা করতে থাকবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তাঁর নিবেদিত প্রাণ বান্দাদেরকে তাঁর কাজের দিকে অগ্রসর করে দেবেন।

এবারে এখানে নতুন আর একটি বিষয় সংযোজিত হচ্ছে এবং সেই সাথে সূরাটিরও সমাপ্তি টানা হচ্ছে। এ প্রসংগে মূল আলোচ্য বিষয় থেকে সাময়িকভাবে নযরকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ও অতি পুরাতন কাহিনীর অবতারণা করা হচ্ছে, এ কাহিনীর মধ্যে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেটা আসলে পৃথক কোনো বিষয় নয় এবং সেটা মোহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারেই যে শুধু ঘটেছিলো তাও নয়। প্রত্যেক যুগেই মানুষের পক্ষ থেকে রসূলদের কাছে নবুওতের প্রমাণস্বরূপ মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর দাবী করা হয়েছে এবং এসব দাবী দ্বারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তাদের সাথে অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদেরকে এতবেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করেছেন, আহ্ যদি তারা সাথে সাথে সেই রকম বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেখাতে পারতেন! যদি অলৌকিক কোনো ক্ষমতা দ্বারা মিথ্যা আরোপকারীদের নমনীয় করা যেতো! কিন্তু এটা অতীব সত্য কথা যে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়া কারও পক্ষেই কোনো বিশেষ ক্ষমতা দেখানো সম্ভব নয়। তাদের কাজ তো শুধু দাওয়াত পৌঁছানো, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর মাধ্যমে কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করা তাঁদের কাজ নয়। তারা দাওয়াত দেবেন, এ দাওয়াত কে কোনভাবে গ্রহণ করলো, কার অন্তরে এর কী প্রভাব পড়লো এবং এর প্রতিক্রিয়ায় কে কী দাবী করলো সে বিষয়ে তাদের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ দাওয়াতকে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন, চাইলে তাদের কাছে এ দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য বানাবেন, না চাইলে না বানাবেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন গোটা সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশেই মানুষের নযরে এগুলো ছিলো, চাইলে যে কোনো মানুষ এসব থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে পারে, প্রয়োজন শুধু একটা আকাংখী মন! এসব নিদর্শনের মধ্যে এখানে গৃহপালিত পশু এবং সমুদ্রগামী জাহাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর ইশারা করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে সেইসব বিষয়ের দিকে, যেগুলোকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

এরপর সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে অতীতের সেই সকল জাতির সত্য বিরোধী তৎপরতার ইতিহাস উল্লেখের মাধ্যমে, যারা সত্যকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কোনো চেষ্টাকেই কাজে লাগাতে কসুর করেনি। তাদের শক্তি সামর্থ, জ্ঞান বুদ্ধি, স্থাপত্য, কলা কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তর প্রসারের কারণে নিজেদের সম্পর্কে তারা অনেক বেশী চিন্তা করে ফেলেছে। ভুলে গেছে যে, এসবের লয় আছে, ক্ষয় আছে এবং এসবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের কারো হাতেই নেই। সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্যে এসব বিদ্যা বুদ্ধিকে আমানত স্বরূপই তাদেরকে দেয়া হয়েছে, একথা ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অবশেষে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে। 'অতপর, যখন তারা আযাবকে নিজেদের চোখে দেখে নিয়েছে তখন তারা ঈমান এনেছে, কিন্তু তখন তাদের ঈমান আর কোনো কাজে লাগেনি (অর্থাৎ সে ঈমান কবুল করে তাদেরকে আযাব থেকে রেহাই দেয়া হয়নি), বরং আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী সেই কাফেররা চরমভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা

অতীতের সেইসব ঘটনাবলীর উল্লেখের সাথে সূরাটিকে সমাপ্ত করা হচ্ছে। হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের ফয়সালার দৃষ্টান্ত পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং আনুগত্য ও বিদ্রোহাত্মক ব্যবহারের মধ্যে বিরাজমান ঝগড়ারও চূড়ান্ত মীমাংসাও হয়ে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি মহান আল্লাহ, তোমার পূর্বে রসূল পাঠিয়েছি আর সে সময়ে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (আয়াত ৭৮)

এ বিষয়ের জন্যে পূর্বের বহু ঘটনা প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে কাজ করছে, যেগুলোর কিছু কিছু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এই আল-কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার এমনও অনেক ঘটনা আছে সেগুলো সম্পর্কে আল কোরআন কিছুই জানায়নি। আল কোরআন রসূলদের মূখ্য দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছে এবং তাদের জীবনের দীর্ঘ কর্মধারা সম্পর্কেও জানিয়েছে। অতীতের সেই সব ঘটনাবলী থেকেই নবীদের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কোনো পরিবর্তন নেই। সেইসব শিক্ষা থেকে তাদের তাদের দায়িত্বসমূহ ভালোভাবেই জানা যায়, জানা যায় তাদের কাজের সীমাসমূহ সম্পর্কেও।

এ আয়াতটি এমন একটি সত্যের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সত্যাশ্রয়ীর অন্তরের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সত্যের ওপর নির্ভর করার কথা বলছে, যাতে করে মানুষ দৃঢ়তার সাথে সেই সত্যকে মযবুত করে ধরতে পারে; এরশাদ হচ্ছে,

'কোনো রসূলের পক্ষেই আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো আয়াত বা কোনো নিদর্শন আনা সম্ভব নয়।'

কোনো মানুষ এমনকি আল্লাহর কোনো রসূলের পক্ষেও আশা করা বা দাবী করা সম্ভব নয় যে, তিনি তার দাওয়াতকে কার্যকরভাবে মানুষের সামনে পেশ করবেন। অথবা আশা করবে যে অহংকারী ব্যক্তিরা তার দাওয়াতের প্রতি ধাবিত হবে, কিংবা সত্যের পক্ষে এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা তিনি দেখিয়ে দেবেন, যার ফলে অহংকারী ব্যক্তিরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। বরং আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর পছন্দনীয় বান্দারা বিরোধী পরিবেশে এবং প্রতিকূলতার মধ্যে অস্থির না হয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করুক এবং সকল অবস্থার সাথেই তারা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিক; এর ফলে তাদের কাছে একথাটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাদের এখতিয়ারে কিছুই নেই। এখানে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তারা দাওয়াতের কাজ করে যাবে। কোনো অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের মনকে পরিতৃপ্ত করা, তাদেরকে অবিচলিত করা, এটা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান, তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় যতোটুকু সাফল্য আসে তাতেই তারা খুশী থাকুক।

আল্লাহ তায়ালা আরও চান, মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাত (সার্বভৌমত্ব) এবং নবুওতের প্রকৃতিকে অনুধাবন করুক। তারা জানুক যে, নবীরা তাদের মতোই মানুষ এবং তাদের মধ্য থেকেই তাদের আগমন ঘটেছে। তারা আরও জেনে নিক যে, মানুষ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এই বৈশিষ্ট্যও দেয়া হয়েছে যে গোটা মানব মন্ডলীর মধ্য থেকে মানুষের শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে। এজন্যেই তাদের চরিত্রকে নির্মল নিঁখুত বানানো হয়েছে এবং এমন কিছু বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বানানো হয়েছে যেন চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারে যে, তারা মানুষ হওয়া সত্তেও এমন কিছু গুণের অধিকারী হয়, যা ইচ্ছা করলেই কোনো মানুষ নিজে নিজে অর্জন করতে পারে না।

মানুষ স্বভাবতই ব্যস্ত চরিত্রের অধিকারী এবং একারণেই তারা তাড়াতাড়িই নবীর কাছে কোনো অলৌকিক ক্ষমতার দাবী করে। এসব দাবীর মধ্যে আযাব নাযিল করার দাবীও রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে কোনো মোজেযা দেখান না এবং জলদি করে কোনো শাস্তিও

নাযিল করেন না। কারণ তিনি মহা দয়াময় তিনি চান মানুষ একটু চিন্তা করুক এবং তাদেরকে দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সত্য সঠিক পথে এগিয়ে আসুক; সুতরাং মোজেযা দেখাতে বিলম্ব করা প্রকারান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। যেহেতু আগেই এটা জানানো হয়েছে যে, মোজেযা প্রকাশিত হওয়ার পর যদি কেউ সাথে সাথে তাকে গ্রহণ না করে, তাহলে অবিলম্বেই চরম আযাব নাযিল হয়ে যাবে এবং তার থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এজন্যে মোজেযা বা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার সরাসরি নিদর্শন পেশ করতে বিলম্ব করায় বিরোধীদেরকে যে সুযোগ দেয়া হয় তা তাদের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক বিরাট মেহেরবানী। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর যখন আল্লাহর হুকুম এসে যাবে, তখন যথাযথভাবে তিনি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। তখন অবশ্যই বাতেলপন্থীরা ক্ষতিগস্ত হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ যখন এই আযাব এসে যাবে তখন ভালো কাজ করার বা তাওবা করে সংশোধিত হয়ে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আখেরী ফায়সালা এসে যাওয়ার পর পেছনে ফিরে যাওয়ারও আর কোনো উপায় থাকবে না।

মানবজাতির প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা

এরপর সাধারণ মানুষের মনোযোগকে আকর্ষণ করা হচ্ছে। তাদের সেইসব মানুষের দিকে তাকাতে বলা হচ্ছে, যারা চাইছে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনাবলী নাযিল হোক। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে এহসান করে চলেছেন তাই তারা তার কথা ভুলেই গেছে, অথচ তারা একটু চিন্তা করলেই প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর আলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পারতো; এমনকি আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বকেও তারা প্রত্যক্ষ করতে পারতো। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি কাজে অংশীদারিত্ব রাখে বলে যারা দাবী করে তাদের দাবীর অসারতাও তাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে যেতো, এ দাবীও তাদের বাতিল হয়ে যেতো যে, এসব কিছু এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, এর পেছনে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্যে সকল জীব জন্তু বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা সেগুলোতে আরোহন করো এবং তাদের মধ্যে অনেক পশু এমনও আছে যেগুলোর গোশত তোমরা খাও............ সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করছো?' (আয়াত ৭৯-৮১)

এসব জীব জানোয়ারকে মানুষের মতোই অলৌকিক বা আশ্চর্য সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তাদের প্রসার ঘটা, তাদের গঠন প্রক্রিয়া এবং চেহারা ছবি সব কিছুই আশ্চর্যজনক। এগুলোকে মানুষের কাছে অবনমিত করা এবং তাদেরকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করা সবই এক বিস্ময়কর ঘটনা বটে! এমনকি এসব জীব জন্তুর মধ্যে এমন জন্তুও আছে যা মানুষের তুলনায় বহু গুণ বিশিষ্ট দেহের অধিকারী এবং অনেক বেশী শক্তিশালী। বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশু বানিয়েছেন যার ওপর তোমরা আরোহন করো আর যার থেকে তোমরা ভক্ষণও করো'......

এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির কথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, যে বলে এগুলো সব এমনি এমনিই পয়দা হয়েছে। তারপর আপনা থেকেই সব চলছে এবং এমনি এমনিই একদিন সব শেষ হয়ে

যাবে; বরং তারা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার সাথে বলে; এগুলো মানুষের জন্যে এমন আশ্চর্যজনক কিছু নয়! তারা এটাও বলে; এগুলোকে দেখে নাকি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো আন্দাজই করা যায় না। মূলত আল্লাহ তায়ালাই তাদের গড়ে তুলেছেন, তাদেরকে নানারকম বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন এবং এদেরকে মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। এসব আশ্চর্য নিদর্শন ও বড় বড় নেয়ামতের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে,

'যেন তোমরা এগুলোর ওপর আরোহন করো এবং এগুলো থেকে তোমরা খাদ্যও সংগ্রহ করো ...... এদের ওপর তোমরা সওয়ার হও এবং সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহন করে তোমরা সফর করো।'

এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হচ্ছিলো তখন এসব পশুর ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের অন্তরের মধ্যে যে সব কথা ছিলো সে সম্পর্কে মানুষদের তেমন জানা ছিলো না। তখনকার দিনে তো এগুলোকে যান-বাহন হিসেবেই ব্যবহার করা হতো, এমনকি এই চরম বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগেও, যখন ট্রেন, বাস ও বিমানের এতো প্রাচুর্য ও উন্নতি, সে সময়েও বহু দুর্গম পর্বতাঞ্চল এমন আছে যেখানে এসব পশুর ওপর আরোহন করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর নেই এবং ভবিষ্যতেও সেইসব অঞ্চলে এসব পশুকেই যানবাহন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, কারণ সেখানকার পথঘাট এমনই আঁকা-বাঁকা, খাড়াই উৎরাই ও সংকীর্ণ যে সেসব এলাকার সফরে গাধা, খচ্চর ও ঘোড়া ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন কোনো সময়েই উপযোগী নয়। এজন্যেই বলা হয়েছে,

'এগুলোর ওপর তোমরা আরোহন করো এবং জাহাজে তোমাদেরকে সওয়ার করানো হয়।'

এই সব জীব জানোয়াররের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের ব্যবহারের জন্যে কতো নিপুণভাবে এদের উপযোগী বানিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এগুলোকে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। এগুলো কি আল্লাহর মোজেযা বা নিদর্শনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়? অবশ্যই মানুষের জন্যে বরাদ্দ করা নেয়ামতসমূহের মধ্যে এগুলো উল্লেখযোগ্য। আরও ভেবে দেখার বিষয় যে, পানির উপরিভাগ দিয়ে ভ্রমণরত নৌকা ও জাহাজসমূহ অনাদিকাল থেকে মানুষের যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এগুলো আল্লাহর অলৌকিক অবদানসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর শক্তি ক্ষমতার জলজ্যান্ত উদাহরণের নমুনা। এগুলো সবই আল্লাহ তায়ালা এই সৃষ্টির জন্যে কর্ম উপযোগী করে বানিয়েছেন, যেমন করে তিনি বানিয়েছেন এর আকাশ ও পৃথিবী, স্থল ও পানি ভাগ। এ পৃথিবীর প্রকৃতির মধ্যে যেসব বস্তু ও উপাদান রয়েছে সে সবের দিকে একটু খেয়াল করলেই বুঝা যাবে অকুল সাগরে ভাসমান এসব নৌকা ও জাহাজ কতো রহস্যময়, তা পাল তুলেই চলুক, বা বাষ্প ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত হোক অথবা আনবিক শক্তি চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেই চলুক কিংবা এসব ছাড়া আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অন্য শক্তি বা জীব জানোয়ারের সাহায্যেই চালিত হোক, এগুলো সবই আল্লাহর নেয়ামত। তাঁর নেয়ামত হিসাবে সবগুলোই তাঁর নযরে সমান। বিগত সময়ের সেইসব নেয়ামতের সমতুল্য আজকের বহু নেয়ামতও পৃথিবীর বুকে বর্তমান রয়েছে এবং যেগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোনো মানুষই অস্বীকার করতে পারবে না। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিণতি

'তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন; সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কোনো আয়াত (নিদর্শন) গুলোকে তোমরা অস্বীকার করছো?'

উপরের আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে কেউ কেউ এমন আছে যারা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতাকে স্বীকার করে না। এক দল লোক আছে যারা সত্যকে পর্যুদস্ত করার জন্যে যুক্তিহীনভাবে তর্ক বিতর্ক করে, আসলে এরা শুধু বিরোধিতা করার জন্যেই বিরোধিতা করে, অথবা ব্যক্তি স্বার্থ বা অহংকার প্রদর্শন কিংবা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে, সত্য ছাড়া অন্য যে কোনো জিনিস চালু করার হীন উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কূটতর্কের অবতারণা করে।

আবার এমনও কোনো কোনো লোক এ সমাজে আছে যে ব্যক্তি ফেরাউন এবং তার মতোই অন্যান্য বলদর্পীদের মতো নিজের বড়ত্বকে প্রমাণ করা এবং নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে নবী (স.)-এর সাথে ঝগড়া করে, তার ভয় থাকে। যদি লোকেরা নবী (স.)-এর কথা শুনতে শুরু করে দেয় এবং তাঁর প্রাধান্য যদি সত্যিই কায়েম হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে, কারণ তার ক্ষমতা তো নানাপ্রকার ভুল তথ্য ও কল্প-কাহিনীর ওপরই টিকে আছে এবং এর দ্বারাই সে সত্যকে দাবিয়ে রাখছে। এখন সে যদি এক আল্লাহর দাস হয়ে যায় তাহলে তার ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার মসনদ খান খান হয়ে ভেংগে পড়বে।

আবার কেউ কেউ এজন্যেও নবী (স.)-এর আনীত সত্যের বিরোধিতা করে যে, সে যে মত ও পথের ওপর টিকে আছে, সত্য সমাগত হয়ে গেলে তার সে ভুল মতাদর্শ ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। মানুষের অন্তরে আসমানী সত্যের জয়-জয়কার শুরু হয়ে যাওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভেংগে খান খান হয়ে যাবে; যেহেতু এর প্রবক্তারা চেয়েছিলো মানুষকে নিছক পৃথিবীভিত্তিক এক জীব বানাতে, তারা মানুষকে বুঝিয়েছিলো যে, মানুষ পৃথিবীতে নিজে নিজেই এসেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর তারা মরে যাবে এবং পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে তারাও মাটি হয়ে যাবে। এর পরবর্তীতে কিছু নেই, প্রয়োজনও নেই; সতরাং যতোদিন পৃথিবীতে তারা বেঁচে আছে তাদের পেটের চিন্তাই করা দরকার। পেট আছে বলে তাদের ক্ষুধা আছে এবং সেই পেট পূর্তির জন্যে প্রয়োজন খাদ্য আর তা লাভ করার জন্যে প্রয়োজন পরিশ্রমলব্ধ পয়সা রোযগার। তাদের আরও প্রয়োজন আছে জীব-জানোয়ারের মতো ইন্দ্রিয় চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা। অতএব জীব-জানোয়াররা সেগুলো যেমনভাবে মেটায়, তারাও সেইভাবে মেটাবে। এসব চাহিদা মেটানোর জন্যে এসব মানুষরূপী জীব জানোয়াররা যেমন মধ্যযুগে গীর্জার ইতিহাসে কিছুসংখ্যক স্বার্থপর মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম করেছিলো, পরবর্তীতে তাদেরই সন্তানরা সেইসব কুক্ষিগত মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে আর এক চরম পন্থা অবলম্বন করে গীর্জার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, কারণ ওরাও মানুষের মুক্তির দোহাই দিয়ে এক সময় মানুষের কাছ থেকে নিরংকুশ আনুগত্যের দাবী করেছিলো।

এখানে দেখা যায় দু'পক্ষেরই যুক্তি রয়েছে। প্রত্যাখ্যানকারীরা যখন বিরোধী ভূমিকায় নেমে গেছে তখন তারা গীর্জার কর্তৃত্বের দাবীকে তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে। প্রাকৃতিক যুক্তি ছাড়াও এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই গীর্জার প্রভুত্ব খতম হওয়ার পেছনে আরো বহু কারণ ছিলো-তা অল্প বিস্তর আমাদের সবার জানা। আজ বিশ্ব বিবেকের কাছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবক্তাদের প্রচার ও প্রসারের অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে গেছে এবং সাথে সাথে মানব কল্যাণে ইসলামের বলিষ্ঠ ভূমিকাও মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন রাখতে শুরু করেছে।

পরিশেষে এ পর্যায়ের শেষ ও চূড়ান্ত শক্তিশালী যুক্তিটি আসছে,

'ওরা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না কি কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা? তারা তো পৃথিবীর বুকে সংখ্যা ও শক্তিতে এবং প্রভাব প্রতিপত্তিতে

ওদের থেকেও অনেক বেশী ছিলো; কিন্তু .... অবশেষে অস্বীকারকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' (৮২-৮৫)

এধরনের বহু ধ্বংসের কাহিনী মানবজীবনের প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় বিধৃত হয়েছে, যা বিদগ্ধ পাঠকের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্যে যথেষ্ট। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো কোনোটা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ বিধায় আজও মানুষের মধ্যে তা কিংবদন্তী আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। এসবের মধ্যে কোনো ঘটনা মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর পাশাপাশি আল কোরআন মানব প্রকৃতি ও তার বিবেককে লক্ষ্য করে এমনসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলছে, যা প্রকৃতির তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলছে এবং যা তার চলার পথ সম্পর্কে তাকে সঠিক নির্দেশনা দিচ্ছে, তাকে তার অবস্থান সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় হেদায়েত দিচ্ছে। তাদেরকে সেসব সিংহদ্বারের কথাও জানিয়ে দিচ্ছে যা তাদেরকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারে। এই পথে যখন নিবেদিতপ্রাণ মানুষেরা অগ্রসর হবে তখন তাদের জন্যে এগুলো খুলে দেয়া হবে, কোনো কোনোটা হালকা খটখটানির সাথে খুলে দেয়া হবে এবং কোনো কোনোটা খোলা হবে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর। এখানে নানাপ্রকার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেই সময়কার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে পৃথিবীর জীবনকে সহজ সরল বানানো হবে। সেই সফরে মানুষ যেন খোলা চোখে, কম্পমান অনুভূতি নিয়ে এবং দৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর দিয়ে ওখানকার সব কিছুর দিকে তাকায়। ইতিপূর্বে পৃথিবীর জীবনে তারা কি অবস্থায় থেকেছে তা যেন তারা দেখতে পায় এবং সেখানে তাদের ওপর কি ঝড় তুফান সংঘটিত হয়েছে সেগুলোও তাদের সামনে হাযির করা যায়; এরশাদ হচ্ছে;

'ওরা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি সেখানে তাদের পূর্বেকার মানুষের অবস্থা কেমন হয়েছিলো?'

এপর্যায়ে তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হবে সে বিষয়ে বলার পূর্বে সেইসব লোকের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হচ্ছে, যারা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর তাদের এবং নিজেদের অবস্থাকে পাশাপাশি রাখতে বলা হচ্ছে, যেন তাদের পক্ষে তাদের নিজেদের জীবনের পরিমাপ করাটা সহজ হয় এবং তারা সঠিকভাবে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বলা হচ্ছে,

'ওরা সংখ্যায় ওদের থেকে অনেক বেশী ছিলো এবং পৃথিবীর বুকে তারা ছিলো অধিক শক্তিশালী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী।'

এতে জানানো হচ্ছে যে পূর্বেকার মানুষেরা এদের তুলনায় যেমন ছিলো সংখ্যায় বেশী, তেমনি শক্তিসামর্থ উন্নতি অগ্রগতি বিবেচনাতেও তারা ছিলো আরও অনেক বেশী অগ্রসর। সেইসব যুগ এবং সেসব জনপদের বৃত্তান্ত আরবদের সামনেই ছিলো। যাদের অনেকের কাহিনী আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের অনেকের কথাই আরবরা জানতো, কিন্তু সে কথাগুলো সরাসরি আল কোরআনে বর্ণিত হয়নি। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব জাতির ঘটনাবলী আরবরা জানে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেইসব জাতির ধংসাবশেষের পাশ দিয়ে তারা যাতায়াত করতো, কিন্তু পৃথিবীর জীবনে যা কিছু তারা উপার্জন করেছে তা তাদের কোনো কাজে আসেনি অর্থাৎ, তাদের শক্তি, তাদের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের দালান কোঠা যা নিয়ে তারা বড়াই করতো এবং সে সব সুখ সম্পদের বস্তু নিয়ে তারা আখেরাতের চরম পরিণতির কথা ভুলে থাকতো সেসব বস্তুসম্ভার সেই কঠিন দিনে তাদের কোনো কাজেই লাগবে না। বরং সেদিন সেইসব জিনিসই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হবে এবং তাদের সেইসব পার্থিব জাঁকজমক সেদিন তাদের জন্যে চরম ধ্বংস ডেকে আনবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তাদের রসূলরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে তখন তারা তাদের কাছে মজুত থাকা জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগ্যতা নিয়ে এবং তার দ্বারা অর্জিত সুখ সম্পদের বস্তু নিচয় নিয়ে ফুর্তি করতে থেকেছে, আনন্দে মেতে থেকেছে।'

ঈমান ব্যতীত জ্ঞান বিজ্ঞানের যে যোগ্যতা, তা হচ্ছে মূলত এক ফেৎনা (বা বিপজ্জনক বস্তু), তা এমনই বিপজ্জনক জিনিস, যা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয় এবং চরম অহংকারী করে তোলে। এই বাহ্যিক জ্ঞানের যে রং মানুষকে রঞ্জিত করে, তা তখনই মানুষকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দেয় যখন সে মনে করতে থাকে যে, তার জ্ঞান তাকে বিরাট শক্তি ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে দেবে এবং তাকে বহু মর্যাদার অধিকারী বানাবে। এই অনুভূতির ফলেই সে সীমা অতিক্রম করতে থাকে। তার যোগ্যতা, পদমর্যাদা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর সে এতো বেশী আস্থাশীল হয়ে ওঠে যে, নিজের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার অনুভূতিটুকু পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে, তার জীবনের বিরাট লক্ষ্যের কথা সে ভুলে যায় এবং এই বিস্মৃতি তাকে নাদান ও মূর্খ বানিয়ে ফেলে। সে ভুলে যায় যে, তার অস্তিত্ব এ বিশাল প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে বটে, কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির কোনো কিছুর ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই, বরং সে জানেও না বিশ্বের কোথায় কি রয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে যে, মানুষ যে কোনো জিনিসের শুধুমাত্র প্রান্তিক অবস্থাটুকুই জানতে পারে, আর তারই কারণে তার অহংকারের সীমা নেই, আংশিক এতোটুকু জ্ঞানের দম্ভে এমনভাবে সে ফুলতে থাকে যে, সে মনে করে, সে অধিকাংশ রহস্যই বুঝি ভেদ করে ফেলেছে। এই জ্ঞানের দম্ভের ফলে আসলে তার জ্ঞানকেই সে অপমান করে। এই দম্ভের কারণেই সে তার অজ্ঞতার কথা ভুলে যায়। অথচ তার মূর্খতা ও অজ্ঞতা তাৎক্ষণিকভাবে তার কাছে যদি ধরা পড়তো, যদি শুধু সে একটু ভাবতো যে 'কত কম সে জানে, আর কতো বেশী সে জানে না তাহলে এই আংগিকে সে চিন্তা করতে পারতো। যদি সে হিসাব করে দেখতো যে, বিশ্বের কয়টা জিনিসের ওপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে, আর কত শত শত সহস্র জিনিস রয়েছে তার এখতিয়াবের বাইরে, কতোটুকু তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে ধরা পড়েছে আর কতো অসংখ্য জিনিস অজানার অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে, তাহলে তার জানার ওপর অহেতুক অহংকার করাটা থেমে যেতো।

সেই অপরিণামদর্শী মানব সন্তানরাই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্য যেটুকু জানে তাই নিয়েই আনন্দে অস্থির। শুধু তাই নয়, তাদের ঔদ্ধত্য এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরের কোনো কিছু তাদের কাছে পেশ করা হলে তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-মস্কারি ও বিদ্রূপ করতে শুরু করে দেয়। তাই সেই হতভাগা লোকদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে আল কোরআন জানাচ্ছে,

'তাদেরকে তাদের সেই অহমিকাই ধ্বংস করে দিয়েছে, যা নিয়ে তারা (নবী (স.)-এর সাথে) ঠাট্টা-মস্কারি করে।'

তারপর যখন ওরা আল্লাহর আযাব দেখে নিলো তখন তাদের সকল অহমিকা খতম হয়ে গেলো। অতীতে যেসব বিষয় তারা অস্বীকার করেছে তা সবই তারা স্বীকার করলো; তখন তারা আল্লাহর একত্বকে মেনে নিলো এবং তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতো, তাদের সবাইকে অস্বীকারও করলো কিন্তু তখন তো সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তারা আমার আযাব দেখে নিলো, বললো আমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম, যাদেরকে আমরা শরীক মনে করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম, কিন্তু আমার আযাব দেখে নেয়ার পর তাদের ঈমান তো আর কোনো কাজে লাগলো না।'

এ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের চিরন্তন অপরিবর্তনীয় নিয়ম। আল্লাহর আযাব হয়ে যাওয়ার পর আর কারো ঈমান কবুল করা হয় না, কারণ এটা সঠিক ঈমান নয়, এ হচ্ছে ভয়ে ঈমান আনা। এরশাদ হচ্ছে,

'এ হচ্ছে আল্লাহর সেই নিয়ম যা অতীতে তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু থেকেছে আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়ম চিরস্থায়ী, যার পরিবর্তন হয় না। নড়বড়ে হয়ে যায় না এবং সে নিয়ম বাতিলও হয়ে যায় না।' তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কাফেররা, সে সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো।'

এই কঠিন দৃশ্যটি সামনে রাখলেই আল্লাহর সেই আযাবকে কল্পনা করা যায়। এ আযাবই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পাকড়াও করবে। তাদের আযাবের সেই দৃশ্যের মধ্যে যেন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, তারা কাতরকণ্ঠে সাহায্য ভিক্ষা চাইছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থর থর করে কাঁপছে, আনুগত্য করার ওয়াদা করছে এবং আত্মসমর্পণ করবে বলে কথা দিচ্ছে। এসব দৃশ্যের জীবন্ত কিছু ছবি তুলে ধরে সূরাটিতে সম্পর্কিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটানো হচ্ছে। এই সমাপ্তির সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্যাদার কথাও বিশেষভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে, যা ছিলো সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূরাটির বিভিন্ন অংশের আলোচনার মধ্যে আমরা আকীদা সম্পর্কিত অনেক কথা দেখতে পেয়েছি। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবেই এগুলো এসেছে। এ আকীদার মধ্যে রয়েছে এক আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাস (তাওহীদ), মৃত্যুর পর আর এক যিন্দেগী আসবে যা হবে চিরস্থায়ী (আল-বা'সু বা'দাল মওত) এবং মানুষের হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ আল্লাহর পয়গাম (ওহী); কিন্তু এগুলোকে সূরাটির আলোচ্য বিষয় হিসাবে সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়নি, আলোচনার ধারার দিকে তাকালে বাহ্যত দেখা যায়, হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বেশী। আলোচনা এসেছে ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে। সততা ও অহংকারের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সূরাটির যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সবার নযরে ধরা পড়ে তা হচ্ছে, সূরাটির সবটুকু জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন সংঘর্ষের ইতিহাস, আল কোরআনের অন্যান্য সূরা সমূহের মধ্য থেকে এই সূরার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি অনন্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

সূরা হা-মীম আস সাজদাহ

আয়াত ৫৪ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা-মীম, ২. (এ কিতাব) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে। ৩. (এ কোরআন এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে, (তদুপরি এ) কোরআন আরবী ভাষায় এমন একটি সম্প্রদায়ের জন্যে (নাযিল হয়েছে) যারা এটা জানে, ৪. (এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা আর (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারী, তারপরও (মানুষদের) অধিকাংশ (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা (এ কিতাবের কথা) শোনে না। ৫. তারা বলে, যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো তার জন্যে আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা, আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে, সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি। ৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা তাঁর এবাদাতের দিকেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আর দুর্ভোগতো মোশরেকদের জন্যে নির্ধারিত হয়েই আছে, ৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে না। ৮. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে (আখেরাতের জীবনে) নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ

اَنْدَادًا ۖ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ⑨ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ

فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۖ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوٰٓى

اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۖ

قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ⑪ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ

كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۖ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ

الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑫ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ

وَّثَمُوْدَ ⑬ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا

اِلَّا اللّٰهَ ۖ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ⑭

রুকু ২

৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবীকে পয়দা করেছেন এবং তোমরা (অন্য কাউকে) কি তাঁরই সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাও? (অথচ) এই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের মালিক, ১০. তিনিই এ (যমীনের) মাঝে এর ওপর থেকে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে (সবার) আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, (এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন) চার দিন সময়ের ভেতর; অনুসন্ধানীদের জন্যে সেখানে (সবকিছু) সমান সমান (মজুদ রয়েছে)। ১১. অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (তখন) ছিলো ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো– ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি। ১২. অতপর তিনি দুদিনের ভেতর এ (ধূম্রকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার (উপযোগী) আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (তাকে শয়তান থেকে) সংরক্ষিত করে দিলাম, এসব (পরিকল্পনা) অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক (আগে থেকেই) সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছিলো। ১৩. (এর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আযাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র, ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আযাব এসেছিলো আদ ও সামুদের ওপর! ১৪. যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের কাছে আমার রসূলরা এসে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করো না; (জবাবে) তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন, আমরা তাই প্রত্যাখ্যান করলাম।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۹﴾ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۰﴾

১৫. আ'দ (জাতির ঘটনা ছিলো), তারা (আল্লাহ তায়ালার) যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? অথচ ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি, যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল; (আসলে) ওরা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করতো। ১৬. অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর এক প্রচন্ড তুফান প্রেরণ করলাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক একটি শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী অপমানকর; (সেদিন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না। ১৭. আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর অন্ধত্বকেই বেশী পছন্দ করলো, অতপর তাদের (অন্যায়) কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম ১৮. এবং (এ প্রলয়ংকরী) শাস্তির (কষাঘাত) থেকে আমি তাদেরই শুধু উদ্ধার করলাম, যারা ঈমান এনেছে এবং (অপরাধ থেকে) বেঁচে থেকেছে।

রুকু ৩

১৯. (সে দিনটির কথা স্মরণ করো,) যে দিন আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের জাহান্নামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্যে) জড়ো করা হবে, (সেদিন) তারা বিভিন্ন দলে (উপদলে) বিন্যস্ত হবে। ২০. যেতে যেতে তারা যখন তার (বিচারের পাল্লার) কাছে পৌঁছুবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের (যাবতীয়) কাজের ওপর সাক্ষ্য দেবে।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ

كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ

اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ

اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ

وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ

مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২১. (তখন) তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, তোমরা (আজ) আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? (উত্তরে) তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা– যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি (আজ) আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই (যেহেতু) তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাই তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমরা (দুনিয়াতে) কোনো কিছুই (তো এদের কাছ থেকে) গোপন (করার চেষ্টা) করতে না, (এটা ভাবতেও পারোনি) তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া (কখনো) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, বরং তোমরা তো মনে করতে, তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাও (বুঝি) জানেন না। ২৩. তোমাদের ধারণা– যা তোমরা তোমাদের মালিক সম্পর্কে পোষণ করতে, (মূলত) তাই তোমাদের (এ) ভরাডুবি ঘটিয়েছে, ফলে তোমরা (মারাত্মক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছো। ২৪. (আজ) যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করে তাতেও (তাদের কোনো উপকার হবে না), জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা, আল্লাহ তায়ালার কাছে অনুগ্রহ চাইলেও (কোনো লাভ হবে না, কেননা আজ) তারা কোনো অবস্থায়ই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না। ২৫. আমি (দুনিয়ার জীবনে) তাদের ওপর এমন কিছু সংগী (সাথী) বসিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলো (তাদের সামনে) শোভনীয় (এবং লোভনীয়) করে রেখেছিলো, পরিশেষে জ্বিন ও মানুষদের সে দলের সাথে– তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হলো, যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, অবশ্য এরা সবাই ছিলো নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ
الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ
الْخُلْدِ ۭ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا
لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ
الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

রুকু ৪

২৬. যারা কুফরী (পন্থা) অবলম্বন করেছে তারা (একজন আরেকজনকে) বলে, তোমরা কখনো এ কোরআন শোনবে না, (তেলাওয়াতের সময়) তার মাঝে শোরগোল করো, হয়তো (এ কৌশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে। ২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেবো, যে আচরণ তারা (আমার কেতাবের সাথে) করে এসেছে। ২৮. এ (জাহান্নাম)-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের (যথার্থ) পাওনা, সেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী (আযাবের) ঘর থাকবে; তারা যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো, এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল। ২৯. কাফেররা (সেদিন) বলবে, হে আমাদের মালিক, যেসব জ্বিন ও মানুষ (দুনিয়ায়) আমাদের গোমরাহ করেছিলো, আজ তুমি তাদের (এক নযর) আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের (উভয়কে) আমাদের পায়ের নীচে রাখবো, যাতে করে তারা (আরো বেশী) লাঞ্ছিত হয়। ৩০. (অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের মালিক, অতপর (এ ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে (হে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দারা), তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো (এবং আনন্দিত হও)। ৩১. আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখেরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধুই থাকবো), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে (হাযির) থাকবে;

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ

حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

৩২. পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!

রুকু ৫

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদেরই একজন। ৩৪. (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরংগ বন্ধু। ৩৫. আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী। ৩৬. যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আকীদাসংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্বসমূহ তথা তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও দাওয়াতদাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সূরায় আর যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা উক্ত তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সাক্ষ্য প্রমাণের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন, এইসব নিদর্শনকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি, অতীত প্রজন্মসমূহের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং কেয়ামতের দিনে কাফেরদের পরিণতির দৃশ্যাবলী এ সূরার অন্যতম উপাদান। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করে, তারা ছাড়া আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, ও ফেরেশতা ইত্যাদি সমুদয় সৃষ্টি এই সব সত্যকে স্বীকার করে, একমাত্র আল্লাহর সামনে সেজদা করে ও আত্মসমর্পণ করে। তাওহীদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো হলো–

‘বলো, আমি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। তোমাদের সাথে সাথে আমার পার্থক্য হচ্ছে, আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একজন মাবুদ মাত্র।

অতএব, তাঁর ওপর অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর মোশরেকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।'....... 'বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন? আর আ'দ ও সামুদ সম্পর্কে জানান যে, তাদের রসূলরাও তাদেরকে এই একই কথা বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। সূরার মাঝখানে বলা হয়েছে! 'তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের সামনে সেজদা করো না। বরং যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সেজদা করো।' সূরার শেষভাগেও এই একই বিষয়ে বলা হয়েছে; 'যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার শরীকরা কোথায়..........?'

আখেরাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে, 'মোশরেকদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয়না এবং আখেরাতে অবিশ্বাস করে।' শেষ আয়াতে বলা হয়েছে! 'শুনে রাখো, তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। জেনে রাখো, তিনি প্রতিটা জিনিসকে ঘেরাও করে রেখেছেন।' অনুরূপভাবে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্যেও এ বিষয়টার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদ্বারা স্বভাবতই কেয়ামতের দিনে যা যা ঘটবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিটাই এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্যে অধিকতর উপযোগী।

ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে এতো বেশী আলোচনা এসেছে যে, এ বিষয়টাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়। সূরার শুরুতেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেয়া হয়েছে। যথা, হা-মীম-পরম দাতা ও দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ..... (আয়াত ১-৬)

সূরার মাঝখানে রয়েছে মোশরেকরা কোরআনের অভ্যর্থনা কিভাবে করতো তার বিবরণ– 'কাফেররা বললো, তোমরা এই কোরআন শুনো না, বরং এর ভেতরে হৈচৈ করো, হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।' এরপর এই অভ্যর্থনার বিস্তারিত বিবরণ ও এর জবাব রয়েছে। (আয়াত ৪১-৪৪)

আর দাওয়াত ও দাওয়াতকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। (আয়াত ৩৩-৩৬)

এই বিষয়গুলো গভীর আবেগোদ্দীপক বিপুলসংখ্যক আয়াতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বিরাট বিরাট নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগত, বিস্ময়কর গঠন সম্বলিত মানবীয় মনোজগত, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং সর্বশেষে কেয়ামতের লোমহর্ষক কিছু দৃশ্যের বিবরণের মধ্য দিয়ে এ সূরার আকীদা সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সম্বলিত বিশদ বিবরণটা খুবই উপভোগ্য। এ বিবরণটা ৯নং আয়াত থেকে শুরু হয়ে ১২নং আয়াতের শেষে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাতদিন ও সূর্য-চন্দ্রের নিদর্শন এবং ফেরেশতাদের এবাদাত, পৃথিবীর বিনীত এবাদাত ও ভূপৃষ্ঠে জীবনের সমারোহের বিবরণও এ সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ৩৭নং থেকে শুরু করে ৩৯নং আয়াতে এই বিবরণ বিস্তৃত। আর মানুষের মনমানসসংক্রান্ত তথ্যাবলী খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৪৯-৫১)

অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের বিবরণ থেকে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে আ'দ ও সামুদের ধ্বংসযজ্ঞ। (আয়াত ১৫-১৮)

এ সূরায় কেয়ামতেরও অনেক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ১৯-২০)

অনুরূপভাবে, দুনিয়াতে যারা প্রতারিত হয়েছিলো, তারা প্রবঞ্চনাকারীদের ওপর যে ক্রোধ প্রকাশ করবে। সে দৃশ্যও এর আওতাভুক্ত। এ দৃশ্যটা রয়েছে ২৯ নং আয়াতে।

এভাবে ইসলামী আকীদা বিষয়ক তত্ত্বগুলো অত্যন্ত আবেগোদ্দীপক ভাষায় এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এদ্বারা সমগ্র সূরার পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রভাব কেমন তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকাশ ও পৃথিবীর সুবিশাল সাম্রাজ্যে, নিজের মনোজগতের গভীর থেকে গভীরতর প্রকোষ্ঠে, অতীতের আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের ইতিবৃত্তে ও কেয়ামতের জগতে বিচরণ করতে থাকে এবং মনের ওপর এসবের গভীর প্রভাব পড়ে।

সূরাটা তার সমস্ত আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য উদ্দীপনাময় উপদেশসমূহ সহ দুটো পর্বে বিভক্ত, যার উভয়টা পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত।

প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছে কোরআন নাযিল হওয়া, তার প্রকৃতি ও তার প্রতি মোশরেকদের ভূমিকা দিয়ে। এর পরপরই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৃত্তান্ত, অতপর আ'দ ও সামুদের কাহিনী, তারপর আল্লাহর শত্রুদের পরকালের দৃশ্য এবং তাদের চামড়া, চোখ ও কান কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের দৃশ্য। এখান থেকে প্রসংগ পাল্টে গিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিভাবে তারা এতো বিপথগামী হলো তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে কিছু অসৎ লোককে তাদের সংগী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংগীরা তাদের সামনের ও পেছনের সব কাজকে সুন্দর ও শোভন করে দেখাতো। এর ফলে তারা পরস্পরকে বলতো যে, 'তোমরা কোরআন শুনোনা, বরং হৈ চৈ করো। তাহলে হয়তো জয় লাভ করতে পারবে।' এরপর এইসব সংগী তাদের সাথে ধোঁকাবাজী করার কারণে তারা কেয়ামতের দিন তাদের ওপর যে ক্রোধ ঝাড়বে, তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে রয়েছে তারা, যারা বলেছে! আমাদের প্রভু আল্লাহ এবং তারপর এই ঘোষণায় অবিচল থেকেছে। এদের ওপর কোনো খারাপ সংগী নয়, বরং ফেরেশতারা নাযিল হবে। এই ফেরেশতারা তাদেরকে আশ্বাস দেবে, সুসংবাদ দেবে এবং নিজেদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে তার সাথী বলে জানাবে। এর অব্যবহিত পরই রয়েছে দায়ী ও দাওয়াতদাতা সংক্রান্ত আলোচনা এবং এখানেই এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

এরপরই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব। এর শুরুতেই রয়েছে রাত ও দিন। সূর্য ও চন্দ্র, এবাদাতরত ও অনুগত ফেরেশতারা বিনয়াবনত পৃথিবী এবং পৃথিবীতে অজন্মার পর জীবন ও উদ্ভিদের সমারোহ সংক্রান্ত আলোচনা। তারপর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে ও তার কেতাবে বক্রতা অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ে বক্তব্য এসেছে। এই পর্যায়ে কোরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপরই উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসার কেতাব ও তা নিয়ে তার জাতির মতবিরোধের প্রসংগ। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে কেয়ামত সম্পর্কে কথা এসেছে এবং বলা হয়েছে যে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। একমাত্র তিনিই জানেন ফলের ঝুঁড়িতে কত ফল এবং মায়ের পেটে কি সন্তান রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক বানাতে, তারা কোথায় গেলো। এরপরই এসেছে মানুষের নিজ সত্ত্বা সংক্রান্ত বক্তব্য। বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের এত কল্যাণকামী হয়েও তার ব্যাপারে সতর্ক হয় না, বরং কুফরি করে ও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়, যার ফলে তার জন্য আযাব ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণার মাধ্যমে যে, তিনি মানুষের নিজ সত্ত্বা ও বাইরের প্রকৃতি সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী তথা তথ্যাবলী তার কাছে উন্মোচিত করবেন, যাতে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়। (শেষ আয়াত দুটো দেখুন।)

তাফসীর

আয়াত ১-৩৬

হা-মীম........., (আয়াত ১-৯)

কয়েকটা সূরার শুরুতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার উপস্থিতি নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর বারংবার এর পুনরাবৃত্তি ও অযৌক্তিক কিংবা বেমানান কিছু নয়। এটা কোরআনের সাধারণ রীতির সাথে সংগতিশীল। কোরআন যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের মনমগযে বদ্ধমূল করতে চায়, সেগুলোকে সে বারংবার উল্লেখ করে থাকে। কেননা মানুষের মনের প্রকৃতিই এ রকম দাবী জানায় যে, তাকে বারংবার সতর্ক করা হোক। নচেৎ তাকে একবার যা বলা হয়েছে তা একটু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেই সে ভুলে যায়। কোনো আবেগজনিত সত্যকে তার মনে বদ্ধমূল করতে হলে প্রাথমিকভাবে সে চায়, ওটাকে বিভিন্ন ভংগীতে পুনরাবৃত্তি করা হোক। কোরআন মানুষের মনকে তার যাবতীয় সহজাত বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও যোগ্যতা সহকারেই গ্রহণ করে। মনের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক তার সম্পর্কে যা কিছু জানেন, তদনুসারেই তাকে কোরআন বুঝার কাজে লাগান।

কোরআনের আহবান উপেক্ষা করার অজুহাত

'হা-মীম, পরম দাতা ও দয়ালুর কাছ থেকে এর অবতরন।'

কথাটা যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে মনে হয়, যেন 'হা-মীম' এই সূরার বা কোরআনের নাম। কেনন 'হা-মীম' সেইসব বর্ণমালারই অংশ, যা দিয়ে শাব্দিকভাবে এই কোরআন রচিত হয়েছে। আর এই 'হা-মীম' যেন উদ্দেশ্য এবং 'পরম দাতা ও দয়ালুর কাছ থেকে এর অবতরন' বিধেয়।

আর কেতাব নাযিলের বিষয়টা উল্লেখ করতে গিয়ে 'পরম দাতা ও দয়ালু'র কথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, এই কেতাব নাযিল করার পেছনে আল্লাহর যে গুণটার সর্বাধিক অবদান রয়েছে, তা হচ্ছে দয়া বা করুণা। বস্তুত এ কেতাব যে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্যে রহমত বা করুণা হিসেবে এসেছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। রহমত শুধু কোরআনের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যই নয়, বরং অন্যদের জন্যেও বটে এবং শুধু মানুষের জন্যই নয়, বরং সকল প্রাণীর জন্যেও বটে। কেননা এই কোরআন জীবন-যাপনের এমন বিধান ও কর্মসূচী দেয়, যা সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এ কোরআন মানব জাতির জীবনে, তার চিন্তাধারায়, তার কর্মকান্ডে ও তার উপলব্ধিতে স্বতন্ত্র ছাপ রেখেছে। এ ক্ষেত্রেও তার প্রভাব শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার প্রভাব বিশ্বময় ও চিরন্তন। যার ন্যায়বিচার ও সততার সাথে মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করেন এবং এর ব্যাপক মানবিক অর্থে ও সকল মানবীয় তৎপরতার নিরীখে অধ্যয়ন করেন তারা এ তত্ত্বটাকে যথাযথভাবে হৃদয়াংগম করেন এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হন। এ ধরনের অনেক ব্যক্তি তাদের এ উপলব্ধি ও স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

'এটা এমন কেতাব, যার আয়াতগুলোকে বিস্তারিতভাবে ও জ্ঞানী লোকদের জন্যে আরবী কোরআন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।'

বস্তুত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভেদে, পাঠকদের স্বভাবপ্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধির বিভিন্নতার আলোকে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে এবং মনস্তাতাত্ত্বিক অবস্থা ও তার রকমারি প্রয়োজনের দাবিতে এক একটা বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা। এ কেতাবের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। এইসব দাবী ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই এ নিদর্শনগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য আরবী কোরআন হিসাবে। কেননা জ্ঞানী লোকদেই জানা ও চেনার যোগ্যতা রয়েছে।

এই কোরআন 'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে তার ভূমিকা পালন করে থাকে।'

সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে সুসংবাদ দেয়, আর প্রত্যাখ্যানকারী ও অসৎকর্মশীলদেরকে সতর্ক করে। এই সতর্কীকরণ ও সুসংবাদের কারণ সে প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় বিশ্লেষণও করে। যাদের মাতৃভাষা আরবী, তাদের কাছেই সে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু এতদসত্তেও তাদের অধিকাংশই কোরআনকে গ্রহণ করেনি।

'তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো, তারা শুনলো না।'

তারা নিজেরা তো মুখ ফিরিয়েই থাকতো এবং কার্যত কোরআনের কিছুই শুনতো না, যাতে তাদের মনে কোরআনের প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে। এই সাথে তারা জনগণকেও কোরআন শুনতে মানা করতো।

কখনো কখনো তারা শুনলেও তা কার্যত না শোনার মতই হতো। কেননা তাদের মনে এর প্রভাব পড়াকে তারা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতো। তাই তারা বলতে গেলে বধির ছিলো, শুনতে পেতো না।

'তারা বলতো, আমাদের হৃদয়ে এমন পর্দা রয়েছে, যা তোমাদের আহবানকে ভেতরে আসতে দেয় না। আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে অন্তরায়। কাজেই তুমি যা করছো করতে থাকো, আমরা ও আমাদের যা করা উচিত তা করে যাবো।'

তারা চরম হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি সহকারে এ কথা বলতো, যাতে রসূল (স.) তাদেরকে আর দাওয়াত না দেন। কেননা তারা নিজেদের অন্তরে রসূল (স.)-এর কথার প্রচন্ড প্রভাব অনুভব করতো। অথচ সচেতনভাবে তাদের সিদ্ধান্ত ছিলো, কোনোক্রমেই তারা ঈমান আনবে না। তাই তারা বলতো; 'আমাদের অন্তর পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। তাই সেখানে তোমার কথাবার্তা পৌঁছে না। আর আমাদের কান বধির হয়ে গেছে। তাই তোমার দাওয়াত আমরা শুনতে পাই না। আমাদের ও তোমার মাঝে আড়াল রয়েছে। ফলে আমাদের ও তোমার মাঝে কোনো সংযোগ নেই। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দাও। আর তুমি নিজেও নিজের ইচ্ছামত কাজ করো।' অথবা তারা বেপরোয়াভাবে বলে থাকবে; 'আমরা তোমার কথা ও কাজের ধার ধারি না। তোমার হুঁশিয়ারি ও হুমকিরও পরোয়া করি না। তুমি চাও তো তোমার পথে তুমি চলতে থাকো। আর আমরা আমাদের পথে চলছি। তোমার কোনো কথা আমরা শুনবো না। তুমি যা করতে পারো করো। তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও, তা পারলে নিয়ে আসো। আমরা ও সবের ভয় পাই না।'

সত্যের পথে আহ্বানকারীদের অবিচল অবস্থান

রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতেন, এ হচ্ছে তার কিছু নমুনা। এসব সত্তেও তিনি তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতেন। দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত হতেন না। চরম নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতেও হতাশ হয়ে দমে যেতেন না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও হুমকিকে কাফেরদের কাছে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তিনি ক্রমাগত ঘোষণা করতেন যে, আল্লাহর আযাবের হুমকি কার্যকরী করার ক্ষমতা তার নেই। তিনি কেবল ওহীপ্রাপ্ত একজন মানুষ মাত্র। তিনি সেই ওহী প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাত্র। মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই তার কাজ। এই পথে তিনি অবিচল থাকবেন এবং আল্লাহর আদেশ মোতাবেক তিনি মোশরেকদের সতর্ক করতেই থাকবেন। এরপর সব কিছু আল্লাহর হাতে সমর্পিত। 'তাঁর হাতে কিছুই নেই, তিনি আল্লাহর আজ্ঞাবাহী একজন মানুষ ছাড়া কিছু নন। (আয়াত ৬)

ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, কী বিরাট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং কত মযবুত ঈমান ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা এখানে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণের অর্থ কী দাঁড়ায়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সব রকমের শক্তি ও ক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হওয়ার পরিণাম কী হয় এবং এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রত্যাখ্যান ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উপেক্ষার পরও এই ধৃষ্টতা প্রকাশকারী কাফেরদেরকে প্রতিহত করার মতো আযাব ত্বরান্বিত করার আবেদন না জানিয়ে ধৈর্যধারণে যে কতো মানসিক যাতনা ভোগ করতে হয়, সেটা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। নবীরা প্রায়ই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন বলেই তাদেরকে এতো বেশী ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেয়া হতো। বস্তুত ইসলামের দাওয়াতের পথটাই দীর্ঘ ধৈর্যের পথ। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিজয় ও সাফল্যের আকাংখ্য যতো প্রবল হয়, বাস্তবে বিজয় ততোই বিলম্বিত হয়। এ কারণেই ধৈর্য, সন্তোষ ও আত্মসমর্পণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।'

মোশরেকদের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের মোকাবেলায় রসূল (স.)-কে সর্বোচ্চ যে কাজটা করার আদেশ দেয়া হতো তা ছিলো তাঁর এ কথা বলা'–

'যে মোশরেকরা যাকাত দেয় না ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।'

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখের একটা উপলক্ষ অবশ্যই ছিলো, যা আমরা এখনো ভেবে দেখিনি। এ আয়াতটা মক্কী যুগের। অথচ যাকাতের আয়াত মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে নাযিল হয়েছিলো। অবশ্য যাকাতের মূলনীতিটা মক্কায় থাকা কালেই সবাই জানতো। মদিনায় কেবল যাকাতের হার এবং একটা সুনির্দিষ্ট ফরয দান হিসেবে তা আদায়ের নির্দেশই জারী হয়েছিলো। মক্কায় এটা ছিলো একটা সাধারণ ঐচ্ছিক দান, যার কোনো পরিমাণ নির্ধারিত ছিলো না। লোকেরা কেবল বিবেকের তাড়নায় স্বেচ্ছায় যতোটা মনে চাইতো দিতো। তবে আখেরাত অবিশ্বাস করাটা আসল ও চরম কুফরি এবং এর ফলে আযাব ও দুর্ভোগ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে যাকাত দ্বারা ঈমান বুঝানো হয়েছে, যা শেরক থেকে পবিত্রতা অর্জনের নামান্তর। এ ধরনের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যাটাও গ্রহণযোগ্য।

পরবর্তী আয়াতে দ্বীনের পথে আহবানকারীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তারা যেন শেরক ও কুফরির ন্যায় অপরাধের নিন্দা ও তার জঘন্যতা বিশ্লেষণ করা অব্যাহত রাখে, তাদেরকে মহাবিশ্বের বিশাল দিগন্ত পরিদর্শন করায়, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতকে পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানায়– যার সামনে তারা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। এই বিশাল বিশ্বজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে তাদের কাছে মহান আল্লাহর সেই অসীম ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে যাবে, যা দ্বারা তিনি এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তারা এই বিশ্বজগতেরই অংশ আর এর অংশ হয়েও তার সৃষ্টি ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্য পর্যবেক্ষণ করলে তারা তাদের সেই সংকীর্ণ গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, যেখান থেকে তারা ইসলামের দাওয়াতকে বিচার-বিবেচনা করে থাকে। এই ক্ষুদ্র গন্ডীতে বসে তারা নিজেদেরকে অনেক বড় দেখতে পায়। নিজেদেরকে এত বড় দেখার কারণেই তারা বুঝতে পারে না তাদেরকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল হিসাবে নিয়োগ করার যৌক্তিকতা কোথায়। তাদের নিজেদের মান-মর্যাদা ও স্বার্থকে তারা অত্যধিক বড় করে দেখার কারণে তারা সেই বিরাট ও মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, যা রসূল (স.) নিয়ে এসেছেন এবং যার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের মূলে রয়েছে এই কোরআন। এটা সেই মহাসত্য, যা আকাশ ও পৃথিবীর চেয়েও বড়, যা সর্বকালের ও সকল প্রজন্মের মানবজাতির উপযোগী ও কল্যাণকর, যার অবস্থান সকল স্থান, কাল ও ব্যক্তির উর্ধে এবং যা সমগ্র সৃষ্টি জগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও কোরআনের তথ্য ও বিজ্ঞান

'বলো, তোমরা কি সেই মহান সত্ত্বাকেই অস্বীকার করছো, যিনি দু'দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন........।' (আয়াত ৯-১২)

অর্থাৎ হে রসূল, তুমি ওদেরকে বলো; তোমরা যখন কুফরি করছো, যখন এই ভয়ংকর কথাটা চরম ধৃষ্টতার সাথে ছুঁড়ে দিচ্ছ, তখন তোমরা একটা সাংঘাতিক অপকর্ম করছো, একটা চরম অবাঞ্ছিত কাজ করছো, তোমরা সেই মহাশক্তিধর সত্ত্বাকে অস্বীকার করছ, যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তার স্থানে স্থানে পাহাড় পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, পৃথিবীকে কল্যাণময় করেছেন, তাতে তার খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা করেছেন যিনি আকাশকেও সৃষ্টি করেছেন ও সুশৃংখল করেছেন, সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সজ্জিত করেছেন, বিশেষও নিরাপত্তার খাতিরে এবং যার কাছে আকাশ ও পৃথিবী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করেছে? অথচ তোমরা এই পৃথিবীর কিছু অধিবাসী অস্বীকার করছো ও দম্ভ প্রকাশ করছো?

তবে কোরআন এই তত্ত্বগুলোকে এমন একটা পদ্ধতিতে তুলে ধরে যে, তা অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যায় এবং মনকে প্রবল জোরে ঝাঁকি দেয়। আমরা এই পদ্ধতিটা সবিস্তারে ও পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি;

'বলো তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি দু'দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তার জন্যে শরীক সাব্যস্ত করো? তিনিই সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতরাজি স্থাপন করেছেন এবং তাতে প্রবৃদ্ধি নিহিত রেখেছেন। আর চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, যা গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্যে।' (আয়াত ৯-১০)

এ দুটো আয়াতে দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টির তথ্য দেয়া হয়েছে।

তারপর পৃথিবীর অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণনা করার আগে এই তথ্যের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। পৃথিবীর কাহিনীর প্রথমাংশ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, তিনিই সারাজাহানের প্রতিপালক।' অথচ তোমরা কিনা তাঁরই সাথে কুফরি করছো এবং তাঁর সাথে শরীক বানাচ্ছ। আর যে পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করছো, তাকে তিনিই সৃষ্টি করছেন। তাহলে ভেবে দেখো, এটা কতোবড় ঔদ্ধত্য, কতোবড় ধৃষ্টতা এবং কতো জঘন্য কাজ! তাহলে দিনের সংখ্যা কতো? দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। দু'দিনে পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছেন, খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতে বরকত বা প্রবৃদ্ধি নিহিত রেখেছেন। এভাবে চারদিন পূর্ণ হয়।

নিসন্দেহে এ দিনগুলো আল্লাহর সেসব দিন, যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমরা পৃথিবীতে যে দিনের সাথে পরিচিত, তা পৃথিবীর জন্মের পরে সৃষ্ট কালমাত্র। পৃথিবীর যেমন দিন রয়েছে, যা সূর্যের কক্ষপথ প্রদক্ষিণকালে নিজের চারপাশে একবার আবর্তনের ফলে জন্মে, তেমনি অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রেরও দিন রয়েছে, যা পৃথিবীর দিনের সমান নয় কোনোটা এর চেয়ে বড়, কোনোটা ছোট।

প্রথম যে দিনগুলোতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, তারপর যে দিনগুলোতে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে দিনগুলো অন্য পরিমাপক দিয়ে মাপা দিন। আমরা এর সঠিক পরিমাণ জানি না। তবে এটা জানি যে, পৃথিবীর বর্তমান প্রচলিত দিনের চেয়ে অনেক বড়ো।

মানবীয় বিজ্ঞান বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার আলোকে আমরা যতোদূর অনুমান করতে পারি, তাতে মনে হয়, পৃথিবী তার জন্মের পর প্রাথমিক স্তরগুলো অতিক্রম করে আসতে যে যুগগুলো কাটিয়ে এসেছে, তার এক একটা যুগকেই এখানে দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এই স্তরগুলো অতিক্রম করে আসার পর পৃথিবী স্থীতিশীল হয়েছে, ভূ-পৃষ্ঠ শক্ত হয়েছে এবং আমাদের পরিচিত এই জীবনের উৎ াত্তি ও বিকাশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই প্রক্রিয়ায় যে সময় লেগেছে, তা এ যাবত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের আলোকে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান বছরের দু'হাজার মিলিয়ন বছর।

আর এই পরিসংখ্যানটা নিছক বৈজ্ঞানিক অনুমান। প্রাপ্ত পাথরগুলোর ওপর গবেষণা চালানোর মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স অনুমানের ফলে এটা পাওয়া গেছে। আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এই সব অনুমানকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে ধরে নিতে পারি না। কেননা এগুলো বাস্তবেই তেমন নয়। এগুলো নিছক গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য, যা সব সময়ই রদবদলযোগ্য ও সংশোধনযোগ্য। তাই আমরা কোরআনকে এসব তথ্যের ওপর নির্ভরশীল করতে পারি না। আমরা যখন দেখবো, এসব তথ্যের মাঝে ও কোরআনের বক্তব্যের মাঝে অনেকখানি মিল রয়েছে, এবং এসব তথ্যকে নির্দ্বিধায় কোরআনের তাফসীরের উপযোগী মনে করতে পারবো, কেবল তখনই এগুলো বিশুদ্ধ হতে পারে বলে ধারণা করতে পারবো। কেবল এরূপ অবস্থায়ই আমরা বলতে পারবো যে, অমুক বা তমুক তত্ত্ব কোরআনের বক্তব্যের কাছাকাছি হওয়ার কারণে বিশুদ্ধতার অধিকতর নিকটবর্তী।

প্রাপ্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে সূর্য যেমন একটা জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড, এক সময় পৃথিবীও তদ্রূপ ছিলো। অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য হলো, পৃথিবী মূলত সূর্যেরই একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশ। এই বিচ্ছিন্নতার সর্বসম্মতভাবে অনুমিত কোনো কারণ এখনো জানা যায়নি। আরো জানা যায় যে, এই জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড বা সূর্যের কাল অতিবাহিত হয়েছে। পৃষ্ঠদেশ ঠান্ডা ও শক্ত হবার পরও ভূগর্ভ এখনও গলিত তরল অবস্থায় রয়েছে। কেননা সেখানে এতো প্রবল উত্তাপ বিরাজমান যে, কঠিনতম শীলাগুলিও তাতে গলে যায়।

ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা হবার পর জমাট ও শক্ত হয়ে যায়। প্রথম দিকে তা ছিলো কঠিন শীলাময় ও কংকরময়। ভূগর্ভ ছিলো একটার পর একটা শীলাময় স্তর দিয়ে গঠিত। এক অতীব প্রাচীন যুগে হাইড্রোজেন ২ মাত্রা ও অক্সিজেন ১ মাত্রায় একত্রিত হয়ে পানির সৃষ্টি হয়ে সাগর মহাসাগর গঠিত হলো।

ডক্টর আহম্মদ বাকী 'মায়াল্লাহে ফিস্ সামা' (মহাশুন্যে আল্লাহর সাথে) নামক গ্রন্থে বলেন;

পানি ও বায়ু আমাদের এই পৃথিবীতে শীলাগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করা, স্থান থেকে স্থানান্তরে বহন করে নেয়া ও নিম্নতর স্তরে নিয়ে স্থাপন করার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিলো। এর ফলে সৃষ্টিকাজের উপযোগী মাটির উৎপত্তি ঘটতে পেরেছিলো। অনুরূপভাবে বায়ু ও পানি সহযোগিতা করেছিলো পাহাড় ও উচ্চভূমিকে ধ্বসিয়ে নীচু করা এবং নিম্নভূমিকে ভরাট করার কাজেও। ফলে পৃথিবীতে আগে থেকে বিদ্যমান অথবা পরে উদ্ভূত এমন কোনো বস্তুই পাওয়া যাবে না, যা ধ্বংস ও নির্মাণকে প্রভাবিত করে না।

ভূপৃষ্ঠ সার্বক্ষণিকভাবে চলমান ও পরিবর্তনশীল। তরংগের কারণে সমুদ্র আলোড়িত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠকে প্রভাবিত করে এবং সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। সূর্যের কিরণ সমুদ্রের পানিকে বাষ্পে পরিণত করে। এ বাষ্প আকাশে উঠে যায় এবং মেঘে পরিণত হয়ে মিষ্টি পানি বর্ষণ করে। এই পানি পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে নামে। ফলে স্রোত ও বন্যা হয়, এবং নদ নদীর আকারে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। ভূ-পৃষ্ঠের শীলা ও পাথরকে প্রভাবিত করে এবং এক ধরনের পাথরকে অন্য ধরনের পাথরে পরিণত করে। এরপর নদনদীর স্রোতে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় এবং শত শত ও লক্ষ কোটি বছরে ভূপৃষ্ঠ

পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের জমাট বরফ সেই ভূমিকা পালন করে, যা করে প্রবহমান পানি। অনুরূপভাবে পানি ভূপৃষ্ঠে যে কাজ সমাধা করে, বায়ুও তাই করে। আর সূর্যের কিরণ ভূপৃষ্ঠে সেই কাজ করে, যা পানি ও বাতাস করে। এদ্বারা ভূপৃষ্ঠে আগুন ও আলোর বিস্তার ঘটে। আর ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণীকূলেও পরিবর্তন আসে এবং ভূগর্ভ থেকে উৎসারিত আগ্নেয়গিরিতেও পরিবর্তন আসে।

ভূ-পৃষ্ঠের শীলা ও পাথর সম্পর্কে যাদি কোনো ভূ-তত্ত্ববিদকে প্রশ্ন করেন, তাহলে সে বহুরকমের শীলার নাম বলবে। তন্মধ্যে প্রধান শীলা তিন রকমের।

'প্রথমত আগ্নেয় শীলা, যা ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভার আকারে বেরিয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়ে এবং পরে ঠান্ডা হয়ে যায়। এই শীলা তিন রকমের যথা, গ্রানাইট, বাস্যালট এবং সাদা, লাল ও কালো এই তিন বর্ণের ক্রিষ্টাল পাথর। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন, এই তিন রকমের ক্রিষ্টাল পাথরের প্রত্যেকটাতেই এক একটা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ এবং প্রত্যেকটারই একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা রয়েছে। এই শীলাগুলো মিশ্র পদার্থ এবং এইসব আগ্নেয় শীলা ও অনুরূপ অন্যান্য পদার্থ সহযোগেই সেই আদিমকালে গড়ে উঠেছে আমাদের এই পৃথিবী। এরপর পৃথিবীতে আকাশ থেকে বর্ষিত, ভূ-পৃষ্ঠে প্রবহমান অথবা বরফ গলা পানি নিজের ভূমিকা পালন করেছে। ভূমিকা পালন করেছে বায়ূ ও রোদ। সব কিছু মিলে এইসব শীলার মূল প্রকৃতি ও রাসায়নিক উপাদান পাল্টে দিয়েছে। এভাবে এই শীলাগুলো থেকে সম্পূর্ণ নতুন শীলা জন্ম নিয়েছে। এই নতুন শীলা ও পুরানো শীলা দেখতেও অন্যরকম, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করলেও দুটোর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভূ-তাত্ত্বিকেরা আরো একশ্রেণীর বৃহত্তর শীলার সন্ধান দিয়েছেন, যার নামকরণ তারা করেছেন কঠিন শীলা বা ঘনশীলা। পানি, বায়ু ও রোদের প্রভাবে অথবা ভূ-গর্ভের অধিকতর প্রাচীন ও মৌল শীলার প্রভাবে এ শীলাগুলোর রূপান্তর ঘটেছে। এগুলোর নামকরণ 'কঠিন শীলা' করা হয়েছে এজন্যে যে এগুলোকে তার পূর্বতন স্থানে পাওয়া যায় না। পূর্বতন শীলাগুলো থেকে রূপান্তরের পর অথবা রূপান্তরের প্রক্রিয়াধীন থাকাকালে তা স্থানান্তরিত হয়। পানি অথবা বাতাস তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়, তারপর তা মাটির নীচে ঢুকে যায়, কঠিন হয়ে যায় এবং মাটির সেই স্তরে স্থায়ীভাবে জেঁকে বসে।

ভূতত্ত্ববিদরা মিসরের মুকাত্তাম পর্বতের প্রধান উপাদান চুনাপাথরের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এটা এক ধরনের রাসায়নিক যৌগিক, যা কার্বনাইট ক্যালসিয়াম বলে পরিচিত। এটা ভূগর্ভের রাসায়নিক অথবা জৈবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত। এই মুকাত্তাম পর্বতের পাথর দিয়ে কায়রোর ভবনগুলো তৈরী হয়ে থাকে। তারা বালুর উদাহরণও দিয়ে থাকেন এবং বলেন, বালুর বেশীর ভাগ উপাদানই হলো সেলসিয়াম অক্সাইড। এটাও রূপান্তরিত। আরো একটা উদাহরণ দিয়ে থাকেন কুমোরের কাদা মাটি ও শুকনো ঠনঠনে দো-আঁশ মাটির। এগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে তার পূর্বতন উৎস থেকে।

কঠিন শীলার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আগ্নেয়শীলা। আদিম যুগে যখন পৃথিবীর উপরিভাগ তরলাবস্থা থেকে জমাট রূপ ধারণ করে, তখনই তা মাটিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। তখন জমাট বাঁধা এই ভূ-পৃষ্ঠে আগ্নেয়শীলা ছাড়া আর কোনো পদার্থ ছিলো না। এর পরে এলো পানি। সৃষ্টি হলো সমুদ্র। তারপর আগ্নেয়শীলার সাথে পানির প্রক্রিয়াকরণ শুরু হলো। তার সাথে যোগ দিলো বায়ু, যোগ দিলো প্রক্রিয়াধীন রকমারি প্রাকৃতিক গ্যাস, যোগ দিলো ঝঞ্জা বায়ু এবং সূর্যের

আলো ও উত্তাপ। এই সমস্ত উপাদান, নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ শুরু করলো। অবশেষে কঠিন অনুপকারী আগ্নেয়শীলা এমন উপকারী শীলায় পরিণত হলো, যা ঘরবাড়ী নির্মাণে ও খনিজ পদার্থ উত্তোলনে কাজে লাগে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর চেয়েও চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সেই কঠিন আগ্নেয়শীলা, যা জীবনের অস্তিত্ব ও স্থীতির উপযোগী নয়, তা থেকে মাটির উৎপত্তি ঘটলো। আর এই মাটি পৃথিবীর উপরিভাগে স্থীতিশীল হয়ে জীবনের অস্তিত্ব ও রকমারি সৃষ্টির উদ্ভবের পথ সুগম করলো।

গ্রানাইট চাষাবাদ, উদ্ভিদ জন্মানো কিংবা পানি প্রবাহের উপযোগী নয়। তবে তা থেকে যে নরম ও উর্বর মাটি জন্মে, তা খুবই উপকারী ও কার্যোপযোগী। এই মাটির উৎপত্তি হয়েছে বলেই উদ্ভিদ জন্মেছে এবং উদ্ভিদের কল্যাণেই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। আর এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির সেরা মানুষের বাসোপযোগী হয়েছে।

সৃষ্টির এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার যে বিবরণ আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে, এ দ্বারা আমরা চারদিনে পৃথিবীর সৃষ্টি, তার ওপর পাহাড় পর্বত স্থাপন, তার কল্যাণময়তা ও প্রবৃদ্ধিশীলতা এবং তার খাদ্যের ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য বুঝতে পারি। আল্লাহর সে দিনগুলো কেমন, কতো বড় তা আমরা না জানলেও এটা বুঝতে পারছি যে, সেসব দিন আজকের পৃথিবীর দিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পরবর্তী আয়াতে যে আকাশের বিবরণ আসছে, সে ব্যাপারে আলোচনা করার আগে এ আয়াতের প্রতিটা ব্যাক্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'তিনি তার উপরিভাগে কিলকসমূহ স্থাপন করেছেন।' পাহাড়পর্বতকে প্রায়শ 'রাওয়াসী' অর্থাৎ কিলক বা নোঙর নামকরণ করা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কিলকগুলো স্থাপনের কারণ দর্শানো হয়েছে এই বলে 'যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে নুয়ে না পড়ে।' অর্থাৎ এগুলো পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে। ফলে পৃথিবী নড়বড় করে না বা কোনো দিকে ঝুঁকে পড়ে না। অতীতে মানুষ মনে করতো যে, পৃথিবী খুবই মযবুত স্তম্ভসমূহের ওপর স্থাপিত এবং সুরক্ষিত। তারপর এখন অন্য যুগ এসেছে, যখন বলা হচ্ছে যে, এই পৃথিবী একটা গোলাকার জিনিস। যা মহাশুন্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে এবং কোনো কিছুর ওপর এটা দাঁড়িয়ে নেই। এ কথা যারা প্রথম শুনেছে, তারা হয়তো আঁতকে উঠেছিলো এবং হয়তো বা ডানে বামে ভয়ে ভয়ে তাকাতো যে, পৃথিবী এই বুঝি কাত হয়ে পড়লো বা মহাশূন্যে কোথাও কখন যেন উল্টে পড়ে যায়! কিন্তু কোরআনের এই আশ্বাসে তাদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে কোনো দিকে কাত হওয়া বা পড়ে যাওয়া থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। কেননা আকাশ ও পৃথিবী পড়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তাকে সামাল দিতে পারবে না। এজন্যেও আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে, যে প্রাকৃতিক নিয়মবিধি এই সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা অত্যন্ত শক্ত ও অটুট। কেননা এগুলো স্বয়ং মহাশক্তিধর আল্লাহরই সৃষ্ট।

পাহাড় পর্বতের কথা বলছিলাম। পাহাড় পর্বতকে কোরআনে 'রাওয়াসী' বলা হয়েছে, যার অর্থ কিলক, পেরেক বা নোঙর কেননা এগুলো পৃথিবীকে কাত হওয়া বা নড়াচড়া করা থেকে রক্ষা করছে। আমরা এই তাফসীরের অন্যত্র বলেছি যে, এসব পাহাড় পর্বত সমুদ্রের তলদেশ ও পৃথিবীর উচ্চ ভূমিগুলোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করছে, ফলে কোনোটাই ঝুঁকে পড়ে না বা উল্টে যায় না।

ডক্টর আহমাদ যাকী 'মহাশুন্যে আল্লাহর সাথে' গ্রন্থে আরো বলেন; পৃথিবীতে যে ঘটনাই ঘটুক ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে, যেখানেই ঘটুক না কেন, তার প্রভাবে কিছু বস্তু একস্থান থেকে

অন্যস্থানে স্থানান্তরিত না হয়ে পারে না এবং এই স্থানান্তরের ফলে পৃথিবীর গতিবেগ দ্রুততর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর গতিবেগকে শুধু জোয়ার ভাটাই প্রভাবিত করে না। (আর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি করে না)। এমনকি নদ-নদী পৃথিবীর এক পাশ থেকে আর এক পাশে যে পানি সরিয়ে নেয়, তাও পৃথিবীর গতিবেগকে প্রভাবিত করে । সমুদ্রের তলদেশে কোনো কিছুর পতন অথবা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো কিছুর উদ্ভবও পৃথিবীর গতিবেগকে প্রভাবিত করে। এমনকি বিভিন্ন কারণে পৃথিবী যখন ঈষৎ সংকুচিত বা প্রসারিত হয়, তখন তাও পৃথিবীর গতিবেগকে প্রভাবিত করে, যদিও এই সংকোচন বা সম্প্রসারণের পরিমাণ কয়েক ফুটের চেয়ে বেশী হয় না।'

যে পৃথিবীর স্পর্শকাতরতা এতো তীব্র, তার ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়পর্বত যে কার্যকর অবদান রাখবে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। কোরআন প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এ কথাই তো বলেছে যে, 'যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে কাত হয়ে না পড়ে।'

'আর এতে তিনি কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি নিহিত রেখেছেন এবং তার অধিবাসীদের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।'

এই বাক্যটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে বর্ধনশীল ফসলাদির চিত্র এবং আল্লাহ তায়ালা ভূগর্ভে সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাকার যেসব উপকারী দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ করেছেন, তার চিত্র তুলে ধরেছিলো, আর আজকাল আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে যে বিপুল সম্পদ সম্ভার ও খাদ্য শস্যের সন্ধান দিয়েছেন, তাতে করে এ বাক্যটা আমাদের মনমস্তিস্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী প্রাচুর্যের ছবি ফুটিয়ে তোলে।

আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি, কিভাবে বায়ূর উপাদানগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি উৎপাদন করে এবং পানির বাতাস ও রোদের সহযোগিতায় কিভাবে কৃষিযোগ্য উর্বর মাটি তৈরী হয়। আমরা দেখেছি কিভাবে বাতাস, পানি ও রোদের সহযোগিতায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, আর এই বৃষ্টিই হয়ে থাকে ভূ-পৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের মিষ্টি পানির উৎস। সেই মিষ্টি পানি থেকেই পুকুর, ঝর্ণা ও নদীনালার সৃষ্টি হয়। এসবই খাদ্য ও বরকতের উৎস।

এ ছাড়াও রয়েছে বাতাস, যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উৎস ও শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ামক।

ড. আহমাদ বাকী আরো বলেন, পৃথিবী নামক গোলাকার গ্রহটা একটা শীলাস্তর দিয়ে ঢাকা। এই শীলাস্তরের বেশীর ভাগ রয়েছে পানির স্তর পরিবেষ্টিত। আর এই শীলা ও পানির স্তরের সবটা মিলে বায়ূর একটা স্তর গঠিত। এই স্তরটা সমুদ্রের ন্যায় একটা বিশাল ঘন গ্যাসের আস্তরণে আচ্ছাদিত। এই সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অসংখ্য স্তর। আমরা মানবসন্তান, জীবজগত, উদ্ভিদজগত এই সমুদ্রের তলদেশে সানন্দে বসবাস করছি।'

'বাতাসের অক্সিজেন থেকে আমরা শ্বাস নেই। আর এই বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড থেকে গঠিত ও পুষ্ট হয় উদ্ভিদের দেহ। একেই রসায়ণবিদরা দ্বিতীয় কার্বনডাই অক্সাইড বলে থাকেন। এই অক্সাইড থেকে উদ্ভিদ নিজেদের দেহ গঠন করে। আমরা সেসব উদ্ভিদ খাই। যে সব জীবজন্তু এইসব উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে, সেসব জীবজন্তুও আমরা খাই। এই উভয় খাদ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেহ গঠন করি। বাতাসের উপাদানের মধ্য থেকে অবশিষ্ট রইলো নাইট্রোজেন। এর উদ্দেশ্য অক্সিজেনকে বিশুদ্ধ করা, যাতে আমরা নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাসে পুড়ে না যাই। তারপর অবশিষ্ট রইল পানির বাষ্প, যা বাতাসকে আর্দ্র রাখে। এ ছাড়া আরো কিছুসংখ্যক গ্যাস অবশিষ্ট থাকে, যার পরিমাণ খুবই কম থাকে। এগুলোর মধ্যে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন অন্যতম। এগুলোর বেশীর ভাগ পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির পর থেকে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।'

আর যেসব জিনিস আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, যেগুলো দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে নানাভাবে উপকৃত হই, তার সবই ভূ-গর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে বিরাজমান মৌলিক উপদানগুলো দ্বারা গঠিত। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যে চিনি খাই তা কঠিন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমষ্টি। অনুরূপভাবে আমরা যতো খাদ্য, পানীয়, পোশাক বা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করি, তার সবই পৃথিবীতে সংরক্ষিত বিভিন্ন মৌলিক উপাদানেরই সমাহার। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আয়াতে যে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা কেবল আমরা যা কিছু পেটে দেই, শুধু তাই বুঝায়না; বরং খাদ্যের অবস্থান আরো ব্যাপক।

এসব তথ্য থেকে বরকত ও চার দিনের খাদ্য ব্যবস্থাপনা কি রকম, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে যুগ যুগ কাল ধরে। তাই এ দিনগুলো অর্থাৎ এই যুগগুলো কতো বড়, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।

'তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন.............।' (আয়াত ১১-১২)

'ইস্তাওয়া' শব্দের অর্থ এখানে ইচ্ছা করা বা মনোনিবেশ করা। আর আল্লাহর ইচ্ছা করা বা মনোনিবেশ করার অর্থ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন। এখানে 'ছুম্মা' বা অতপর শব্দটা দ্বারা সময়ের ধারাবাহিকতা বুঝানো হয়নি, বরং চেতনাগত ধারাবাহিকতা বুঝানো হয়েছে। কেননা চেতনা ও অনুভূতিতে আকাশ পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চতর। সাধারণ প্রচলিত ধারণা এই যে, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির আগে শূন্যে এক ধরনের ঘন কুয়াশা বা ধূয়া বিরাজ করতো।

ডক্টর আহমাদ বাকী আরো বলেন; 'গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির পরে যে গ্যাস ও ধুলোবালি মহাকাশে বিরাজ করছিলো, কুয়াশা বলতে তাকেই বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, ছায়াপথ কেবল গ্যাস ও ধুলোবালি দ্বারা গঠিত ছিলো। এইসব গ্যাস ও ধুলোবালির কিছু অংশ ঘনীভূত হয়ে গ্রহ-নক্ষত্র গঠিত হয়। আর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট অংশ থেকে কুয়াশার সৃষ্টি হয়। সেই অবশিষ্ট অংশ থেকে খানিকটা গ্যাস ও ধুলোবালি এই বিশাল ছায়াপথে ছড়িয়ে পড়ে। যে অংশ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা এই অংশের সমান। গ্রহ নক্ষত্র মন্ডলী এই কুয়াশা থেকে আকর্ষণ ক্ষমতা অর্জন করে এবং ছায়াপথের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এইসব গ্রহ নক্ষত্র আকাশকে ঝাড় দিয়ে পরিস্কার রাখে। তবে মহাশূন্য এতো বিশালায়তন এবং এতো ভয়াবহ যে, এই ঝাড়ুদাররা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্তেও এ কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

ড. বাকীর এ তথ্য সঠিকও হতে পারে। কেননা এটা কোরআনের সেই বক্তব্যের নিকটতম, যাতে বলা হয়েছে! 'অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা এখনো ধোঁয়াটে।' তা ছাড়া আকাশ যে দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর দুদিন লেগেছে, এই সত্যটাও উক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সঠিক প্রমাণিত করে।

আল্লাহর অবাধ্যতাই হচ্ছে প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া

এরপর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার;

'অতপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, 'ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তোমরা উভয়ে এসো।' তারা উভয়ে বললো; আমরা অনুগত হয়েই এলাম।'

এই মহাবিশ্ব যে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের অনুগত এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত যে তার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও হুকুমের আজ্ঞাবহ, সে ব্যাপারে এ আয়াতে চমকপ্রদ ইংগিত রয়েছে। এথেকে বুঝা গেলো, মহাবিশ্বে একমাত্র মানুষই এমন প্রাণী, যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই আল্লাহর

প্রাকৃতিক নিয়মের আনুগত্য করে। সে অনিবার্যভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী। কারণ সেটা অনুসরণ করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না। এ বিশাল সৃষ্টিজগতে সে একটা ক্ষুদ্র প্রাণী। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো তার ওপর কার্যকরী হয়ই, তা সে পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক। কিন্তু একমাত্র সেই আকাশ ও পৃথিবীর মতো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আনুগত্য করে না । সে সহজ ও সরল পথ থেকে বিপথগামী হবার চেষ্টা করে। আর এটা করতে গিয়ে সে প্রাকৃতিক বিধানগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

জানা কথা যে, প্রাকৃতিক বিধান তার ওপর কর্তৃত্বশীল থাকবেই। এই বিধান তাকে ধ্বসংও করে দিতে পারে। তাই সে বাধ্য হয়েই অনুগত হয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আল্লাহর সেই সব বান্দা, যাদের হৃদয় দেহ, চাল চলন, চিন্তা ভাবনা, ইচ্ছা আকাংখা, কামনা বাসনা, ও ঝোঁক সব কিছুই আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংগতিশীল। ফলে তারা আল্লাহর বিধান স্বেচ্ছায় মেনে চলে এবং প্রকৃতির চাকার সাথে সমন্বয় রক্ষা করে চলে। এরূপ পরিস্থিতিতেই বিস্ময়কর ও আলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে। কেননা প্রকৃতির সাথে সে সংগতিশীল। সে প্রকৃতির শক্তি থেকেই শক্তি অর্জন করে। সে প্রকৃতিরই অংশ এবং আল্লাহর পথে সে প্রাকৃতিক নিয়মের আওতাধীন থেকেই চলতে বাধ্য।

আমরা আল্লাহর বিধান বাধ্য হয়ে মেনে চলি। যদি স্বেচ্ছায় মেনে চলতাম, তাহলে খুবই ভালো হতো। যদি আকাশ ও পৃথিবীর মতো স্বেচ্ছায় আল্লাহর হুকুম মানতে পারতাম, খুবই ভালো হতো। তাহলে প্রকৃতির আত্মার সাথে আমাদের আত্মার মিল হতো। প্রকৃতির মতোই আমরাও বিশ্বপ্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত হয়ে যেতাম।

আমরা কখনো কখনো খুবই হাস্যকর কান্ড করে বসি। প্রকৃতির গাড়ী যখন নিজ পথে, নিজের গতিতে ও নিজের গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে এবং প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে সমগ্র প্রকৃতি তাকে পরিচালিত করছে, তখন আমরা তার বিপরীত দিকে তার চেয়ে দ্রুতগতিতে অথবা শ্লথগতিতে চলতে চাই। এতে আমরা গোটা সৃষ্টির বিশাল মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এই মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নানা চিন্তা-ভাবনা, কামনা বাসনা, আগ্রহ ও অনীহা পোষণ করি এবং এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি। এই বিচ্ছিন্নতা ও বিপরীতমুখী গতির কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই ও কষ্ট পাই, কখনো আহত হই, কখনো ধ্বংস হয়ে যাই। অথচ সৃষ্টির মিছিল স্রষ্টার বিধান অনুসারে অপ্রতিহত গতিতে আপন গন্তব্যের দিক এগিয়ে যেতে থাকে। আর আমাদের সকল চেষ্টাসাধনা ও শক্তি বিফল ও বৃথা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আমাদের অন্তরাত্মা ও মনমগজ যখন যথার্থই ঈমানদার হয়, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং গোটা সৃষ্টি জগতের আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন আমরা আমাদের আসল ভূমিকা কী হওয়া উচিত, তা বুঝতে পারি, আমাদের কর্মকান্ডকে গোটা সৃষ্টিজগতের কর্মকান্ডের সাথে সুসমন্বিত করতে পারি। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রয়োজনীয় দ্রুততার সাথে তৎপর হতে পারি এবং যে পর্যায়ে ও যে মানে তৎপর হওয়া দরকার, হতে পারি। এরূপ অবস্থায় আমরা মহান স্রষ্টারও সাহায্য পেতে পারি এবং অনেক বড় বড় কৃতিত্ব দেখাতে পারি। অথচ কোনো দম্ভ বা অহংকার আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেননা কোন উৎস থেকে শক্তির যোগান পেয়ে আমরা এসব বড় বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছি, তা আমরা জানি। আমরা বুঝতে পারি যে, এ কৃতিত্ব আমাদের নিজস্ব নয়। শুধু সর্বোচ্চ শক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণেই আমরা এ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছি। আর তখনই আমরা চরম ও পরম সুখ, সৌভাগ্য সন্তোষ, তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করতে পারে। কেবল তখনই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহর

অনুগত এই গ্রহে আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা আমরা তখন দেখতে পাই যে, এ পৃথিবী সর্বতোভাবে ও পরিপূর্ণ সমন্বয়ের সাথে আমাদেরকে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহর ঈপ্সিত গন্তব্যের দিকে ধাবমান রয়েছে, এমন একটা বন্ধুপ্রতিম বিশ্বে বসবাস করায় যে কতো শান্তি ও তৃপ্তি, তা বলে শেষ করা যায় না, যে বিশ্ব তার প্রভু ও প্রতিপালকের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পিত, আমরাও তার সাথে আত্মসমর্পিত, আমাদের এক পাও বিপরীত দিকে চলে না, আমরাও তার বিরুদ্ধে চলিনা, সেও আমাদের বিরুদ্ধে চলে না। কেননা আমরা তার সমমনা ও সহযাত্রী।

'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের বিষয় নিষ্পত্তি করে ফেললেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আকাশে তার হুকুম পাঠালেন....।'

এই দু'দিন সেই দু'দিনও হতে পারে- যখন কুয়াশা থেকে নক্ষত্ররাজি জন্মেছে, অথবা যখন আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছে। 'প্রত্যেক আকাশে হুকুম পাঠানোর মর্মার্থ হলো, সেখানে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রাকৃতিক বিধান চালু করা। 'আকাশ' শব্দটা কী বুঝায়, সে ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে, দূরত্বের পরিমাণকেই আকাশ নাম দেয়া হয়েছে। আবার এক একটা ছায়াপথকেও আকাশ বলা হয়ে থাকতে পারে। বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ছায়াপথগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে আকাশ বলাও বিচিত্র নয়। এ ছাড়া এর আরো বহু সম্ভাব্য অর্থ হয়তো রয়েছে।

'আর আমি সর্বনিম্ন আকাশকে জ্যোতিষ্কসমূহ দ্বারা সজ্জিত করেছি (শয়তান থেকে) নিরাপত্তার খাতিরে'

সর্বনিম্ন আকাশেরও কোনো নির্দিষ্ট একটামাত্র অর্থ নয়। হতে পারে এটা আমাদের নিকটতম ছায়াপথ, যার দূরত্বের পরিমাণ এক লক্ষ মিলিয়ন আলোক বর্ষ। এ দ্বারা অন্য কিছুকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যার ভেতরে হয়তো গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে এবং প্রদীপের আকারে আমাদেরকে আলো বিতরণ করছে।

'নিরাপত্তার খাতিরেও' এর অর্থ হলো, শয়তান থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে। কোরআনের অন্যান্য স্থানের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বক্তব্য থেকেও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। শয়তান কে, সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছু বলতে পারি না। কোরআনে যে সংক্ষিপ্ত কথাগুলো এসেছে, সেগুলো ছাড়া আর কিছুই নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই।

'এ হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর (আল্লাহর) ব্যবস্থাপনা।

বস্তুত এতো সব জিনিসের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সেই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া আর কি কারো পক্ষে সম্ভব, যিনি একাই যাবতীয় সম্পদ সম্ভার সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত?

আপোষের প্রস্তাবে আল্লাহর রসূলের জবাব

এই বিশাল বিশ্বজগতে এতবড় তত্ত্বানুসন্ধানী অভিযান পরিচালনা করার পর আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারীদের ভূমিকা কেমন? যেখানে আকাশ ও পৃথিবী তাদের প্রতিপালকের কাছে নতি স্বীকার করে বলে; 'আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে এসেছি' সেখানে এই ক্ষুদ্র ও অক্ষম মানুষ কিনা আল্লাহর সাথে কুফরি করার ধৃষ্টতা দেখায়? এই ধৃষ্টতা ও স্পর্ধার শাস্তি কী হওয়া উচিত? মহান আল্লাহ আ'দ ও সামূদের ইতিহাস বর্ণনা করে এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন;

'এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে আ'দ ও সামূদের ন্যায় দুর্যোগ থেকে সাবধান করে দিয়েছি। (আয়াত ১৩-১৮)

'তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে আ'দ ও সামূদের ন্যায় দুর্যোগ থেকে সাবধান করে দিয়েছি'- এই ভয়ংকর সতর্ককারী কাফেরদের ধৃষ্টতা ও অপরাধের ভয়াবহতার সাথে সংগতিপূর্ণ। সূরার শুরুতেই তাদের এই অপরাধ ও ধৃষ্টতার উল্লেখ রয়েছে। সেই সাথে মানবজাতির মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা যে গোটা সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে কথাও জানানো হয়েছে এই সতর্কবাণী উচ্চারণের আগে।

এই সতর্কবাণী কি পরিবেশে উচ্চারিত হয়েছিলো, সে সম্পর্কে ইবনে ইসহাক একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটা হলো,

'বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন কোরায়শদের একটা বৈঠকে বসেছিলো। সে সময় রসূল (স.) মসজিদুল হারামে একাকী বসেছিলেন। ওতবা বললো, 'শোনো কোরায়শ বংশধররা! যদি আমি মোহাম্মদের (স.) কাছে গিয়ে একটু কথা বলি এবং তার কাছে আপসের কিছু প্রস্তাব দেই সেটাকে তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করো না? সে হয়তো এসব প্রস্তাবের কোনো কোনোটা গ্রহণ করবে, এবং আমরা তার মধ্যে যা যা তাকে দেয়া পছন্দ করি দেবো। এর বিনিময়ে সে হয়তো আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকবে।' উল্লেখ্য যে, এ সময়ে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূল (স.)-এর সাথীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। লোকেরা ওতবাকে বললো, ঠিক আছে, আপনি গিয়ে আলোচনা করুন। ওতবা রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে বললো, শোনো ভাতিজা, তুমি আমাদের গোত্রের মধ্যে কতটা মর্যাদা রাখো, তা তুমি ভালো করেই জানো। কিন্তু তুমি তোমার এমন একটা গুরুতর বাণী নিয়ে এসেছে, যা দ্বারা তুমি তাদের ঐক্যে ভাংগন ধরিয়েছো, তাদের সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিয়েছো, তাদের উপাস্যদের ও তাদের ধর্মের খুঁত বের করেছো, এবং তাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদেরকে বিধর্মী আখ্যায়িত করেছো। এমতাবস্থায় আমি তোমার কাছে কয়েকটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তুমি তা মন দিয়ে শোন ও বিবেচনা করো। হয়তো তুমি এগুলোর ভেতরে অন্তত কিছু না কিছু গ্রহণ করতে পারবে। রসূল (স.) তাকে বললেন, আচ্ছা বলুন, আমি শুনবো। সে বললো! ভাতিজা, তুমি যে বাণী নিয়ে এসেছো, তা দ্বারা তুমি যদি অর্থ উপার্জন করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে দেবো, যাতে তুমি আমাদের ভেতরে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও, তাহলে আমরা তোমাকে নেতা বানিয়ে নেবো। কোনো কাজই তোমাকে বাদ দিয়ে করবো না। আর যদি তোমার রাজা হবার সখ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানাবো। আর যদি ব্যাপারটা এমন কিছু হয়ে থাকে যে, তোমার কাছে যে অশরীরী আত্মা আসে, তাকে তুমি দেখতে পাও, কিন্তু তুমি ঠেকাতে পারো না, তাহলে আমরা তোমার জন্যে ডাক্তার কবিরাজ ডাকবো, এবং যতো টাকা লাগুক, খরচ করবো। তবু তোমাকে সুস্থ না করে ছাড়বো না।

জানি, এমন ঘটনাও কখনো কখনো ঘটে যে, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অনুগত বানাতে চায়, সে নিজেই তার কাছে পরাভূত হয়ে যায় এবং চিকিৎসা না করালে সে আর তা থেকে মুক্তি পায় না। এ পর্যন্ত বলে ওতবা যখন কথা শেষ করলো, তখন রসূল (স.) বললেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, হাঁ। আমার কথা শেষ,' রসূল (স.) বললেন, এখন তাহলে আমি যা বলি শুনুন। সে বললো, বলো। রসূল (স.) 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে এই সূরার শুরু থেকে পড়তে শুরু করলেন। ওতবা চুপচাপ করে পিঠের পেছনে হাত দুখানা রেখে তার ওপর ভর

দিয়ে শুনতে লাগলো। রসূল (স.) যখন সেজদার আয়াতে পৌঁছলেন, অমনি সেজদা করলেন। তারপর বললেন, যা শুনলেন, তাতো শুনলেনই। এখন আপনি ভেবে দেখুন কী করবেন। ওতবা উঠে লোকজনের কাছে চলে গেলো। ওতবাকে আসতে দেখে কোরায়শরা বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহর কসম, ওলীদের বাবা যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো, এখন আর সে চেহারা নেই। ওতবা তাদের কাছে এসে বসলো সবাই তাকে বললো, আপনার কী হয়েছে। সে বললো, কী আর হবে? আমি আজ যে বাণী শুনেছি, তেমন বাণী আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এটা যাদুও নয়। কবিতাও নয়, জ্যোতিষীর বাণীও নয়। হে কোরায়শ, তোমরা আমার কথা শোনো এবং এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, এই লোকটা যা করছে করুক। ওর পথ থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও। তার যে কথাবার্তা আমি শুনেছি, তার কিছু না কিছু ফল ফলবেই। আরবরা যদি তার ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের কিছু করতে হলো না। তোমরা নিজেরা কিছু না করেই তার কবল থেকে রেহাই পেয়ে গেলে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে। তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হবে। তোমরা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী জাতি। তারা বললো, আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ, সে তার কথা দিয়ে তোমার ওপর যাদু করেছে। ওতবা বললো, এ হলো আমার মত। এখন তোমরা যা ভালো বুঝ করো।

ইমাম বাগাওয়ী বর্ণনা করেন, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন যে, রসূল (স.) আ'দ ও সামুদের বিবরণ সম্বলিত আয়াত পড়তে শুরু করা মাত্রই ওতবা তার মুখ চেপে ধরলো, তাঁর করুণা ভিক্ষা করলো এবং কোরায়শদের বৈঠকে ফিরে না গিয়ে সোজা নিজের বাড়ীতে চলে গেলো এবং কোরায়শদের থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে লাগলো।

পরে যখন ওরা এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো তখন ওৎবা বলতে শুরু করলো, 'আমি সংগে সংগে তার মুখের ওপর হাত রেখে দিলাম এবং তার জাতির ওপর রহম করার জন্যে তাকে অনুরোধ করলাম। তাকে মিনতি করে বললাম, যেন সে থেমে যায়। অতপর সে বললো, তোমরা তো জানই যে মোহাম্মদ যখন যা কিছু বলেছে কখনই মিথ্যা কথা বলেনি। এ জন্যে আমার ভয় হলো যে অবশ্যই তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হয়ে যাবে।'

এটা ছিলো একটা বাস্তব ঘটনা, তারা জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে রসূল (স.)-এর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলে তা কখনো মিথ্যা হয় না। যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি তার অন্তরেও এ কথাটা জাগ্রত ছিলো। এ বর্ণনাটিকে আমরা আরও একটু গভীরভাবে বুঝতে চাই। বাহ্যিক দিক দিয়ে যে কথাগুলো বুঝা যাচ্ছে তার ওপরেই আমরা কথাটাকে ছেড়ে দিতে চাই না। আসুন আমরাও আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এর চেহারার সামনে একবার দাঁড়াই। ওৎবা যখন এই কথাগুলো বলছিলো এবং সেই ছোট্ট ঘটনাটি উল্লেখ করছিলো, তখন তার চেহারাতে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিলো তার থেকে তার অন্তরের অবস্থা ছিলো আরও বেশী প্রভাবিত, যার কারণে তার মুখ দিয়ে সেই কথাগুলোই বের হচ্ছিলো। তার হৃদয় মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো যার চিহ্ন তার চেহারাতে ফুটে উঠছিলো। কিন্তু রসূল (স.) ধীর স্থিরভাবে ও নির্লিপ্ত মনে এই অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন, প্রশান্ত বদনে তার কথাগুলো শুনছিলেন। সত্যের মধুর পরশে তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। তিনি ছিলেন ধীর স্থির ও দরদী। তিনি ওতবার সাথে কথা বলার সময় কোনো ব্যস্ততা প্রদর্শন করছিলেন না। তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে এবং পুরোপুরিই শুনছিলেন ও শান্তভাবে তার জবাব দিচ্ছিলেন। ওৎবার কথা শেষ হলে তখন অত্যন্ত শান্তভা ও দৃঢ়কণ্ঠে খুবই শালীনতার সাথে বললেন, 'আবু ওয়ালীদ আপনার কথা শেষ হয়েছে কি?' সে বললো, 'হাঁ, তখন রসূল (স.) বললেন, 'তা হলে এবার আমার কথা শুনুন। এরপর নবী (স.) নিজের থেকে আর কোনো কথা না বলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও গভীর আবেগের সাথে আলোচ্য সূরাটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন।

প্রশান্ত বদনে ও মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত মহান আল্লাহর বাণী দিগন্ত বলয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ছড়িয়ে পড়ছিলো। 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, হামীম....... ওতবার ভীত প্রকম্পিত বিহ্বল চিত্তে উচ্চারিত সেই আয়াতগুলো মধুর পরশ, বুলিয়ে দিলো। সে শুনছিলো আর তার মন ডেকে বলছিলো আহা, একি মধুর বাণী, অপূর্ব এর সুর লহরী, কী মায়াভরা কথা, কী সম্মোহনী মমতা বহন করছে এ বাণীর প্রতি ছত্র। সে আপনহারা হয়ে শুনছিলো আর ভাবের আবেগে দুলছিলো। হাঁ, এ বাণী চিরদিন সকল শ্রোতার হৃদয়ে মধু ঝরায়। যারা এ বাণী উপেক্ষা করে, ঠাট্টা মস্কারি করে, কিন্তু এ বাণী শোনার পর তাদের হঠকারী হৃদয়েগুলোও বিগলিত হয়ে যায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন রহমত বর্ষণ করুন আপন নবীর ওপর, মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন রেসালাত কার কাছে নাযিল করতে হয়।'

অহংকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত আদ ও সামুদ জাতি

এই ছোট্ট ঘটনাটি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমরা পুনরায় পাক পরওয়ারদেগারের মহান বাণী আল কোরআনের আলোচ্য আয়াতগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করি,

'(হে রসূল) এরপরও যদি ওরা ফিরে যায় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদেরকে সেই ভীষণ আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা' আ'দ ও সামূদ জাতির ওপর নেমে এসেছিলো ....।'

ওপরের আয়াতে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার দ্বারা অতীতের গযবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সম্মিলিত রাজ্যের ক্ষমতা কার হাতে রয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিশাল এ সাম্রাজ্য সম্পর্কে যখন সে ক্ষমতাগর্বী ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা চিন্তা করে তখন তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহর রসূলরা তাদের কাছে তাদের সামনে থেকে ও পেছন থেকে এসেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও এবাদত করো না।'

এই একটি কথা এবং একই দাওয়াত নিয়ে সকল রসূলরা এসেছেন, এই একই কথার ওপর তাদের দাওয়াতের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে।

'ওরা বললো, যদি আল্লাহ তায়ালা (আমাদের ঈমান গ্রহণ করাটা) চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি কোনো ফেরেশতা নাযিল করতেন, সুতরাং তোমরা যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা আমরা মানি না।'

সকল রসূলকেই তাদের জাতির কাছ থেকে এসব সন্দেহের কথা শুনতে হয়েছে। কেননা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ রসূল পর্যন্ত যতো রসূল এসেছেন সবাই মানুষ হিসেবেই এসেছেন। জনগণ তাদেরকে চিনতো এবং তারাও দেশবাসীকেও চিনতেন। মানুষ দেখেছে সবার দাওয়াত যেমন এক, তেমনি সবার উদ্দেশ্য ও আদর্শও এক। প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে একই পথের দিকে আহবান করেছেন। আ'দ ও সামূদ জাতি তাদের নিজ নিজ নবীকে এই কথা বলে অস্বীকার করার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলো যে, তাঁরা মানুষ ছিলেন–ফেরেশতা নয়, কারণ তারা মনে করতো ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ রসূল হতে পারে না।

এই কারণেই দেখা যায় কি ভয়ংকর হয়েছিলো তাদের পরিণতি! উভয় জাতির একই পরিণতি হয়েছিলো। একটি নির্দিষ্ট সময় পর তাদেরকে বজ্রাঘাত পাকড়াও করেছিলো। এরপর তাদের প্রত্যেকের কাহিনীকে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'আ'দ জাতির অবস্থা হচ্ছে এই যে তারা পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিলো এবং বলেছিলো কে আছে আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী?'

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বান্দারা আল্লাহর কাছে নত হয়ে থাকবে এবং কখনও পৃথিবীতে অহংকার করবে না। যদি সত্যি সত্যিই কেউ কোনো দিক দিয়ে সামান্য একটু বড় হয়েও থাকে, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বড়ত্বের কাছে তার কী প্রাধান্য থাকতে পারে! আসলে জগতে যে যতো দিক দিয়েই নিজেকে বড় মনে করতে চাক না কেন, সবাই তা অকারণেই করে। এ জন্যে দেখা গেছে, যখনই কেউ অহংকার করেছে সে তখন চরম ধোঁকা খেয়েছে। কি ঔদ্ধত্যই না আ'দ ও সামূদ জাতির লোকেরা দেখিয়েছে! 'তারা বলেছে, আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী আর কে আছে?' বরাবরই পৃথিবীর অহংকারী ব্যক্তিরা এই অলীক দম্ভে লিপ্ত থাকে। এ হচ্ছে এমন এক চেতনা যা কারো মনে থাকলে সে কাউকে কেয়ার করে না এবং তার থেকে বড় বা বেশী শক্তিশালী কেউ আছে এটা সে চিন্তাই করতে পারে না, এধরনের ব্যক্তিরা তাদের সীমাবদ্ধতা ভুলে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি দেখছে না যে আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টিকারী তিনি কি ওদের থেকে বেশী শক্তিশালী নন?'

এই কথাটাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ কথা .... যিনি প্রথম তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অবশ্যই তিনি তাদের থেকে বেশী শক্তিশালী, যেহেতু তিনিই তাদেরকে সেই সীমাবদ্ধ শক্তি সামর্থ ও মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু অহংকারী মানুষেরা চিন্তা করে না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'আমার আয়াত (আমার ক্ষমতার নিদর্শন) গুলোকে তারা অস্বীকার করতো।'

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাদেরকে আমি আমার সৃষ্টির সেরা বানিয়েছি, তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক, শক্তি ও সামর্থ দিয়েছি। তাদেরকে আমার নিজ মেহেরবানী বলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দিয়েছি, এসব কিছুই আমি দিয়েছি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। কিন্তু এ সব হিসাব নিকাশ না করে তারা আমার সামনে অহংকার দেখায়। আমার সামনে তাদের পেশী শক্তি প্রদর্শনী করে? কোন শক্তির প্রদর্শনী তারা করে? তাহলে সেই অর্বাচীন, অপরিণামদর্শী, অকৃতজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা নাফরমান মানুষগুলো পারলে আমার শাস্তিকে প্রতিরোধ করুক, সেসব আযাবকে ঠেকিয়ে রাখুক যার বর্ণনা পরে আসছে।

'অতপর তাদের ওপর আমি কতিপয় দুর্লক্ষুণে দিনে প্রচন্ড এক তীব্র বাতাস পাঠালাম। (যাতে করে) তাদেরকে আমি দুনিয়ার বুকে অপমানজনক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতে পারি।'

অর্থাৎ এক ভয়ংকর দিনে তাদের ওপর দিয়ে যে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত করা হয়েছিলো তাতে তারা সবাই হালাক হয়ে গিয়েছিলো, এ ঘটনা পৃথিবীর মানুষের কাছে অজানা নয়। কোনো জাতির জন্যে এটা এক তুলনাহীন ও নযীরবিহীন অপমান। শক্তিদর্পী, অহংকারী ও নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারকারী মানুষের জন্যে এটাই সমুচিত শাস্তি। তারপরও–এ তো গেলো দুনিয়ার জীবনের শাস্তি, আর আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে,

'আখেরাতের শাস্তি আরও বেশী অপমানজনক এবং সেদিন তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না।'

'সামূদ জাতির কথাও (একবার চিন্তা করা দরকার।) আমি তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর তাদের জাহেলিয়াতকে প্রাধান্য দিলো, সঠিক পথে চলার তুলনায় ভুল পথকেই ভালোবাসলো।'

তাদের কাছে উটনীর নিদর্শন পাঠানো হয়েছিলো। এখানে ইংগিত করা হচ্ছে সেই ঘটনার দিকে এবং যা এসে যাওয়ার পরও তাদের সঠিক পথ প্রাপ্তির প্রশ্নে আর কোনো বাধাই ছিলো না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার সুস্পষ্ট এই নিদর্শন এসে যাওয়ার পরও এ দাওয়াতকে তারা প্রত্যাখ্যান করলো এবং এরপরও তারা কুফরী করলো। আর এটা সত্য কথা যে, হেদায়াতের ওপর অন্ধত্বকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হেদায়াত লাভ করার পর গোমরাহী পছন্দ করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব!

'এর ফলে তাদেরকে তাদের শাস্তিস্বরূপ অপমানের আযাব পাকড়াও করলো।'

সেই হতভাগাদের জন্যে এই অপমানই হলো অধিকতর উপযোগী অবস্থা। এটা শুধু আযাব বা ধ্বংসই নয়, বরং ঈমানের নেয়ামত লাভ করার পর অন্ধত্বকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে তাদের এমন এক অপরাধ যার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তির সাথে ভীষণ অপমানও দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা ঈমান এনেছিলো এবং তাকওয়া হাসিল করেছিলো।'

এ আ'দ ও সামূদ জাতির ইতিহাস বর্ণনার সাথে এ পর্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হচ্ছে। অতপর তাদেরকে ভয়ানক আযাবের সংবাদ শুনিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। তাদের সামনে আল্লাহর ক্ষমতার কথা পেশ করা হচ্ছে, যাঁর শক্তি ক্ষমতাকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না। কোনো দূর্গ এমন নেই যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তাঁর আযাব থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে। তাঁর আযাব এসে যাওয়ার পর কোনো অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি সে আযাবকে খন্ডনও করতে পারে না।

আল্লাহর দরবারে মানুষের অংগ প্রত্যংগের সাক্ষ্য

এতোটুকু আলোচনার পর আমরা বুঝতে পারছি যে, সেই হঠকারী ব্যক্তিদের কাছে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহরর ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মানব জাতির যে ইতিহাস আমাদের সামনে আজ রয়েছে, তার থেকে পরিষ্কারভাবে আমরা আল্লাহর ক্ষমতার কথা বুঝতে পারি। এ ইতিহাস থেকে আমরা এও জানতে পারি যে, মানব জাতির মধ্যে কেউ এমন নেই, যে বলতে পারে যে, তার নিজের শরীরের ওপর তার সামান্য কর্তৃত্ব রয়েছে; বরং তার প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ সদা সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে। আল্লাহর ইচ্ছা এখতিয়ার উপেক্ষা করে কেউ নিজেদের শরীর বাঁচাতে পারে না। এমনকি তাদের কান, তাদের চোখ, তাদের শরীরের ত্বক সবই সদা-সর্বদা একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মেনে চলে এবং তাঁর নিয়মের বাইরে এদের চালাতে চাইলে তারা সাথে সাথেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ায় এদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাতে চাইলে কেয়ামতের দিন এরা সবাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন আল্লাহর দুশমনদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে .... তারা নিজেদের দোষ খন্ডন করতে চাইবে। তখন তারা কাউকে দোষারোপ করে নিজেদের দোষ মুক্তির কোনো সুযোগ পাবে না।' (১৯-২৪)

সেই কঠিন দিনে হঠাৎ করেই মানুষ আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যাবে। তখন তাদের সেই শরীর যার প্রত্যেকটি অংগ প্রত্যংগের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে। তারা তাঁরই আনুগত্য করবে এবং তাঁর হুকুমই তারা পালন করতে থাকবে। আর এই অংগ-প্রতংগগুলো মানুষদেরকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলবে যে, অবশ্যই তারা আল্লাহর দুশমন। আল্লাহর এসব দুশমনদের যায়গা আর কোথায় হবে? অবশ্যই ওদেরকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, তাদেরকে সেনা বাহিনীর মতো একত্রিত করা হবে, আনা হবে প্রথম দলকে পরবর্তী দলের ওপর এবং পরবর্তী দলকে প্রথম দলের ওপর। কোন দিকে নেয়া হবে তাদেরকে? দোযখের (আগুনের) দিকে! সেখানে জীবিত অবস্থাতেই তাদেরকে হাযির করা হবে এবং তাদের বিচার শুরু হয়ে যাবে। যারা

তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে কিন্তু কোনো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না এবং তাদের থেকে কোনো হিসাবও নেয়া হবে না। সেদিন তাদের জিহ্বাকে বেঁধে দেয়া হবে, সেগুলো সেদিন কথা বলতে পারবে না, কারণ এই জিহ্বাগুলোই একদিন তাদের অস্থায়ী মালিকের গোলামী করতে গিয়ে মিথ্যা কথা উচ্চারণ করেছে, অপরকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং সত্যপন্থীদেরকে ঠাট্টা-মস্কারি করেছে। আজ তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের রবের প্রতি আনুগত্যবোধ নিয়ে ও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করবে। সেই সময়ে সে গোপনে যেসব চিন্তা ভাবনা করেছে সেগুলোও আজ আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনে তারা তাদের মনের মধ্যে অনেক কথা লুকিয়ে রাখতো এবং আল্লাহর থেকে সেই বিষয়গুলোকে আড়াল করে রাখতো, আর ভাবতো যে তিনি ওগুলো দেখতে পাচ্ছেন না। কোনো সময়েই তো তারা তাদের ইচ্ছা ও অপরাধগুলোকে আল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারতো না। দুনিয়াতে তাদের চোখ, কান ও ত্বক থেকেও তো সেগুলো গোপন রাখতে পারতো না! এ অংগ-প্রত্যংগের কী সম্পর্ক ছিলো তাদের সাথে? বরং আরও বলা যায়, শরীরের কেমন অংশ ছিলো? আজকে ওরা বুঝবে যে, গোটা সৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে যতোই তারা আড়াল করে রাখুক না কেন এবং রব্বুল আলামীন থেকে ওরা যতোই আত্মগোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, সেই কঠিন দিনে তা ওদেরকে লজ্জিত করেই ছাড়বে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই গোপন ক্ষমতার পরিধি কতো বিশাল। তাঁর সর্ববিজয়ী ক্ষমতা তাদের সকল অংগ প্রত্যংগের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সুতরাং তাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে, আজ সময় থাকতেই তারা মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে এবং সাথে সাথে তাঁর হুকুম পালনে এগিয়ে আসবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা তাদের জিহবাসমূহকে বলবে, আমাদের বিরুদ্ধে কেন তোমরা সাক্ষ্য দিলে?'

দুনিয়ার জীবনে তাদের কাছে যেসব তথ্য ছিলো গোপন সেগুলো আজ সঠিকভাবে ও সরাসরি তাদের মুখের ওপর এসে হাযির হবে। এখানে কোনো ধোঁকাবাজি বা কারো কোনো তোষামোদি ভূমিকা থাকবে না। এ জন্যে জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

'ওরা বলবে, আমাদের কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যিনি সকল কিছুকে কথা বলার যোগ্যতা দিয়েছেন।

'তিনি এ ছাড়া আরও অনেক কিছু করতে সক্ষম (যা আমরা জানি না) অবশ্যই তিনি সবাইকে কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন', তিনি বলেছেন,

'তিনিই প্রথমবারে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'

অর্থাৎ, যিনি অস্তিত্ব দান করেছেন, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তাঁর পাকড়াও থেকে প্রথমে বা পরে কেউ পালাতে পারবে না। আজকে তারা যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে যেগুলোকে অস্বীকার করছে, কেয়ামতের দিন তাদের গায়ের চামড়াও সেগুলোরই সত্যতা জানাবে।

তাদের সম্পর্কে আল কোরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে তা চিরদিন মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে, আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই অদ্ভুত আচরণের ওপর কী চমৎকারভাবে মন্তব্য করা হয়েছে, ওদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে,

'আর তোমরা তো (পৃথিবীতে থাকাকালে) কিছুতেই তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া থেকে তোমাদের অপকর্মগুলোকে গোপন রাখতে পারতে না এবং এ নিশ্চয়তা লাভ করতে পারতে না যে তারা কোনোদিন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না।'

অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনে তোমাদের মনে একথা কখনও জাগেনি যে, তোমাদের নিজেদের শরীরের অংগ প্রত্যংগ কোনো সময়ে তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, আর সত্যিকারে বলতে কি,

চাইলেও তোমাদের নিজেদের শরীরের কাছে কোনো কিছু গোপন রাখা অবশ্যই তোমাদের সাধ্যের বাইরে ছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বরং তোমরা ধারণা করছিলে যে, তোমরা যা কিছু করছো তার অধিকাংশই আল্লাহ তায়ালা জানেন না।'

দুনিয়ার জীবনে তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ ও অপরাধজনক এই ধারণাটাই তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছিলো এবং তাই তোমাদেরকে আজ জাহান্নামের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওটাই ছিলো তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা, যা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো, অতপর তোমরা পরবর্তীতে এক ক্ষতিগ্রস্ত জনপদে পরিণত হয়ে গিয়েছিলে। এরপর আসছে শেষ মন্তব্য,

'এমতাবস্থায় তারা যদি সবর করে তাহলেও দোযখই হবে তাদের ঠিকানা।'

হায়, অদৃষ্টের কী পরিহাস! এখানে সবর বলতে বুঝানো হয়েছে দোযখের মধ্যে ধৈর্য ধরে অবস্থান করা। যদিও এসবর সে সবর নয়, যার পর প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা সুন্দর প্রতিদান আসতে পারে। কিন্তু যে সবরের পরিণাম দোযখের স্থায়ী আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। এ সবর মানুষকে এক চরম নিকৃষ্ট স্থানে আশ্রয় নিতেই বাধ্য করবে।

'ওরা যদি এটা ওটা ওযর দিয়ে দোষ স্খলন করতে চায় তাহলেও তাদেরকে ছাড়া হবে না, তাদের কোনো ওযরও তখন কবুল করা হবে না।'

অর্থাৎ, সে স্থানটি এমন কঠিন হবে যে, সেখানে (সংশোধনের জন্যে) বারবার তিরস্কার করা হবে না, অথবা বারবার তাওবা করার সুযোগও দেয়া হবে না। সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, যেখানে তিরস্কার রয়েছে সেখানে ক্ষমা সন্তোষও রয়েছে। অর্থাৎ তিরস্কার ও শাস্তির পরই অন্যায়কারীর অন্যায় ও তার শাস্তি লাঘব হয়ে যায়। কিন্তু কেয়ামতের সে ভয়ংকর দিনে এমন কোনো দোষারোপ করা হবে না যে, এর তার পরবর্তীতে ক্ষমা প্রাপ্তির কোনো সুযোগও থাকবে।

পাপীদের সামনে অপরাধকে শোভনীয় করে তোলা

এ আলোচনার পরপরই সেই ব্যক্তিদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার কথা জাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ দুনিয়ার জীবনে তারা ঈমান আনেনি আর এই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা শাস্তিস্বরূপ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা তাদের মনের বিশৃংখল অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছে। তাদের পেছনে তিনি জ্বিন ও মানব শয়তানদেরকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন যারা তাদের মন্দ কাজগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরতো, অবশেষে তারা এমন কাজ করতো, যার পরিণতিতে তারা চরম ক্ষতির ভাগী হয়ে যেতো এবং তাদের জন্যে আযাব আসার কথাটা নির্ধারিত হয়ে যেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদের পেছনে কিছু সাথী, লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনে থেকে ও পেছন দিক থেকে এসে তাদের (অসৎ) কাজগুলোকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখাতো। এর ফলে তাদের ওপর শাস্তির কথা তেমনি করেই বাস্তবায়িত হয়েছিলো যেমন করে তাদের পূর্বে অনেক জ্বিন ও মানুষের ব্যাপারে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।'

সুতরাং আজ যারা অহংকারের কারণে তাঁর এবাদত থেকে দূরে থাকতে চাইছে তাদের চিন্তা করা দরকার যে তারা যখন আল্লাহর কবজার মধ্যে গিয়ে পড়বে তখন কি নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীনই না তারা হবে! কি ভয়ানক অবস্থা তাদের হবে যখন তাদেরকে আল্লাহর আযাব ও চরম

ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আজ তাদের পেছনে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু সাথী লাগিয়ে দিয়েছেন যারা তাদেরকে সদা সর্বদা ওয়াসওয়াসা দিয়ে চলেছে এবং তাদের সামনে তাদের সকল কাজকে ওরা এমনভাবে সুন্দর করে তুলছে যে, তারা কতোটা অন্যায়ের মধ্যে ডুবে রয়েছে তা টেরই পাচ্ছে না। মানুষের জন্যে সব চাইতে বড় ক্ষতিকর জিনিস হচ্ছে, সে অন্যায় কাজ করে চলেছে অথচ সে যে অন্যায় করছে তা বুঝতেই পারছে না অর্থাৎ অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বরঞ্চ এসব অন্যায় করার পরও তার নযরে মনে হয়, যা সে করেছে বা করছে তা সবই সুন্দর। অতএব তার জন্যে এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় ধ্বংসাত্মক অবস্থা এবং এই অনুভূতিই তাকে ধ্বংসের চরম গহবরে ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর মানুষের কাছেও সে নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়ে যায়। তারা সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ ও জ্বিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যাদের ওপর পূর্বেই কঠিন আযাব নাযিল হয়েছে ও তাদেরকে নিস্ত-নাবুদ করে দেখা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

'অবশ্যই ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।'

বিপথগামী নেতা ও তাদের অনুসারীদের পরিণতি

আর সেই নিকৃষ্ট সাথীদের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হচ্ছে, ওরা তাদের সাথীদেরকে আল কোরআনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে সদা-সর্বদা উস্কানি দিতে থাকে। কেননা তারা আল কোরআনের সম্মোহনী ক্ষমতা অনেক সময় তাদেরকে সত্যের পথে টেনে আনতে চায়। বলা হয়েছে,

'কাফেররা বলে ওঠে, এ কোরআন তোমরা শুনো না, গন্ডগোল করো, এতেই হয়তো তোমরা বিজয়ী হবে।'

কোরায়শ সর্দাররা পরস্পরকে এইভাবে উস্কানি দিতো এবং সাধারণ মানুষকে এসব কথা বলে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিতো। অথচ বাস্তবে কী হয়েছে? আল কোরআনের প্রভাব থেকে তারা না নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছে—আর না সাধারণ মানুষকে তারা আল কোরআনের প্রভাব বলয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই জন্যেই রসূল (স.)-এর মিশনকে ব্যর্থ করতে গিয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা বলে উঠলো,

'তোমরা এ কোরআন শুনো না'

আল কোরআনের সম্মোহনী শক্তি এমন ছিলো যে এর কারণে তারা নিজেরা বশীভূত হয়ে যেতো এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যেতো। তারা অনুভব করতো, আল কোরআন তাদের কায়েমী ও সুবিধাবাদী সমাজকে ওলট পালট করে দিচ্ছে। পিতা ও পুত্রের এবং স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। অবশ্যই আল কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করছিলো, সঠিক পথ ও বেঠিক পথের মধ্যে পার্থক্য মানুষদের জানিয়ে দিচ্ছিলো। আল কোরআন অবতরণের ফলে তাদের অন্তরে নিষ্ঠা পয়দা হচ্ছিলো এবং মানুষ অনুভব করছিলো আল কোরআনের ভিত্তিতে গড়া সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কই টেকসই নয়—মূলত এইই ছিলো আল কোরআনের পার্থক্য নির্ণয়কারীর ভূমিকা। আর এই কারণেই ওরা বলতো। 'গন্ডগোল করার মাধ্যমে হয়তো তোমরা জয়ী হবে।'

এটা ছিলো নবী (স.)-এর জন্যে একটা ভীষণ কঠিন অবস্থা। বাধ্য হয়ে তারা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলো, কেননা কোরআন তাদের আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত হেনেছিলো। তাই তারা সঠিক যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা আল কোরআনের মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম হওয়ার কারণে অবশেষে এই কূট-বুদ্ধি অবলম্বন করেছিলো এবং দর্পভরে ঈমান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছিলো।

আল কোরআনের মহা আকর্ষণ থেকে দূরে থাকার ও অপরকে দূরে রাখার দুরভিসন্ধি নিয়ে তারা মালেক ইবনে নাদরের অপচেষ্টার মতো, ইসকানদারিয়া ও রুস্তমের বহু কল্প কাহিনী রচনা করেছিলো, কেননা সেইগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখা যায়। আল কোরআন থেকে মানুষের মনোযোগ দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে তারা ছোট বড় ছন্দময় বহু কবিতাও রচনা করে ফেলেছিলো। সেগুলো খুব সুর দিয়ে গাইতো, কখনও নবী (স.)-এর প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করতো। কিন্তু এ সব অপচেষ্টা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো এবং আল কোরআন তার মায়াময় মহিমায় আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয় ও আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে মানুষের কাছে তার মধুময় আবেদন রাখতে সক্ষম হলো। আল কোরআনই ছিলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রেরিত কেতাব। এ কেতাব এসেছে সত্যসহ এবং এ কেতাবের মাধ্যমে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, তাই বাতিলপন্থীরা একে পর্যুদস্ত করার জন্যে যতো চেষ্টাই চালাক না কেন তা ব্যর্থ হবেই। অতপর তাদের অপ্রিয় কথাগুলো রদ করে দিয়ে তাদের প্রতি কঠোর ধমক আসছে। বলা হচ্ছে,

'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো। যে অন্যায় কাজ তারা করেছে তার নিকৃষ্ট প্রতিদান দেবো।'

শীঘ্রই আমরা তাদেরকে দোযখের আগুনের মধ্যে দেখতে পাবো এবং দেখবো ধোকা খাওয়ার কারণে আজ তারা কতো ভীষণভাবে অপমানিত হচ্ছে। এদেরকে এদের সাথীরা সামনে এবং পেছন থেকে এসে এদের পাপ কাজগুলোকে সুন্দর করে দেখিয়েছে, আজকের এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে এদের সদা সর্বদা ধোঁকার মধ্যে রেখেছে এবং বলেছে, পরকাল বা হিসাব নিকাশ কিছুই হবে না, মরে গেলে তো সবই শেষ হয়ে যাবে। তাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে জানানো হচ্ছে,

'আর কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে জ্বিন ও মানবজাতির সেসব লোকদের দেখিয়ে দাও, যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। যাতে করে আজ আমরা তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে মাড়াতে পারি, যাতে করে তারা সব থেকে অপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।'

ওপরের আয়াতে কেয়ামতের দিন তারা কতো ভীষণভাবে রেগে যাবে তারই একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে, প্রতিশোধের আগুণে কিভাবে তারা জ্বলবে তার একটি জীবন্ত দৃশ্যের চিত্র আঁকা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'পায়ের নীচে ফেলে মাড়িয়ে মারবো' 'যাতে করে তারা সব থেকে নিকৃষ্ট এক প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায়।'

এই ভীষণ আক্রোশের ফলে তাদের নিকট থেকে তারা ঝরে পড়বে, যারা এককালে তাদের বড়ই আপনজন ছিলো, ভালোবাসার পাত্র, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরংগ বন্ধু-খায়েরখাহ ছিলো। যারা অন্যায় কাজে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং তাদের মন্দ কাজ ও আচরণগুলোকে সুন্দর করে দেখিয়েছে।

মোমেনের মাপকাঠি

আজ তারা সবাই এর উচিত প্রতিদান পাবে, পাবে সেই সকল প্ররোচনা ও ধোঁকাবাজির বদলা যা দুনিয়ার জীবনে শুভাকাংখী হিসাবে সর্বদা তারা করেছে। তাদের কুমন্ত্রণা ও মিথ্যা শুভেচ্ছা প্রদর্শনের প্রতিশোধ পাবে। অপর দিকে বলা হচ্ছে, তারাই হচ্ছে সত্যিকারে মোমেন, যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর মযবুত হয়ে সেই সুন্দর সমুজ্জ্বল পথে অবিচল থাকে, যা তাদেরকে ঈমান ও তদনুযায়ী ভাল কাজসমূহের দিকে আহ্বান জানায়। এমন লোকদেরকে যাবতীয় খারাবী থেকে আল্লাহ রব্বুল ইযযত হেফাযত করবেন এবং কিছুতেই তাদের পিছনে

নিকৃষ্ট জ্বিন ও নিকৃষ্ট মানুষদেরকে লাগিয়ে দেবেন না। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী ফেরেশতাদেরকে হিসাবে নিয়োগ করে দেবেন। তারা তাদের অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দেবেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ দেবেন সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়ে ছিলো। দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই তারা বন্ধু হিসাবে তাদের সংগে সংগে থাকবেন। নীচের আয়াতে এই কথাটাই জানানো হয়েছে,

'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, ... তাদের মেহমানদারী করা হবে ক্ষমার মালিক মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে।' (৩০-৩২)

অর্থাৎ আল্লাহকে প্রতিপালক, মনিব ও শাসনকর্তা মানার পর যেভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার সেভাবেই মযবুত হয়ে টিকে থাকা। কোনো সংকট ও ভয়ভীতির কাছে নতি স্বীকার না করা। এই দৃঢ়তার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝা, বুঝে সুঝে সচেতনভাবে ও বিবেক বুদ্ধি নিয়ে জীবন পথে পাড়ি দেয়া এবং এ পথে চলতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবী বাধার সামনে অবিচল হয়ে থাকার নাম হচ্ছে 'এসতেকামাত', যে কোনো কঠিন দায়িত্ব আসুক না কেন তা যথাযথভাবে পালন করা, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে থাকা– এ সবকটি অর্থই 'এসতেকামাত' শব্দের মধ্যে রয়েছে। এই দৃঢ়তা অবলম্বন করার জন্যে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো বড় সন্দেহকে মনে জায়গা না দেয়া এবং সকল কঠিন অবস্থাতেই অবিচল থাকাও হচ্ছে, 'এসতেকামাত'-এর তাৎপর্য। এই দৃঢ়তার জন্যেই আল্লাহর কাছ থেকে বড় পুরস্কার দেয়ার অংগীকার করা হয়েছে। ফেরেশতাদের সাথে থাকা বলতে কী বুঝানো হয়েছে এবং তাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বলতেই বা কী বুঝায় এ কথাগুলো তাদের কথায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তারা তাদের মোমেন বন্ধুদের বলে,

'ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না, সুসংবাদ গ্রহণ করো জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও।'

তারপর তাদের জন্যে ওয়াদা করা জান্নাতের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং তাঁর সত্যিকারের বন্ধু তাদের জন্যে তাদের পাওনা বুঝে দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে তাই, যা তোমাদের অন্তর চাইবে এবং যার দাবী তোমরা করবে। এরপর তাদের জন্যে সৌন্দর্য ও সম্মান বৃদ্ধি করা হবে। এটা হবে ক্ষমার মালিক মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আতিথেয়তা। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আপ্যায়ন করা হবে এবং এর সাথে থাকবে তাঁর ক্ষমা ও মেহেরবানী ......এর থেকে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে।

আল্লাহর পথে আহবানকারীদের জন্যে কোরআনের নির্দেশনা

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রকৃতি বর্ণনা করার সাথে এই অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে। দাওয়াতের মূল কথা ও তার শব্দাবলী সম্পর্কে জানান হচ্ছে, এ বিষয়ে প্রথম রসূল (স.)-কে এবং তাঁর উম্মতের অন্যান্য দাওয়াত দানকারীদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তাদের সাথে করা দুর্ব্যবহার, অহংকারপূর্ণ ব্যবহার ও তাঁদেরকে যে নানাভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। এ সব কিছু জানিয়ে রসূলদেরকে এই কথাটিই বুঝানো হয়েছে যে পৃথিবীর অহংকারী ও দুনিয়া কেন্দ্রিক মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যে, তাদের কর্তৃত্বে আঘাত পড়ে-এমন কথা যার তরফ থেকেই এসেছে। চিরদিন তাদের সাথে এই একই আচরণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

এরশাদ হচ্ছে, 'তার চেয়ে ভালো কথা আর কার হবে .... নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, তিনি জানেন। (আয়াত ৩৩-৩৬)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে প্রধান যে কথাগুলো ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে, সকল যামানাতেই আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং হঠকারিতার মোকাবেলা করা যায়। মানুষের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সীমাবদ্ধ বয়স, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে নিজেদের বুদ্ধিতে চলতে চাওয়া এবং নিজেদের জীবন ব্যবস্থা নিজেরাই রচনা করার প্রবণতা এবং নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে চাওয়া অবশ্যই একটা বড়ো গোমরাহী এবং নিজেদেরকে নিজেদের ভালো মন্দের মালিক মনে করারও কোনো ক্ষমতা তাদের নাই। এই প্রবণতাকে দমন করে এক আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল লক্ষ্য। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা সবার সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর নযরে সবাই সমান। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিকে আহ্বান জানানোর কাজটি মোটেই সহজ নয়। বরং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সকল বিরোধিতার মোকাবেলায় টিকে থাকা এবং মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত করার কাজ অবশ্যই বড় কঠিন এক দায়িত্ব। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তার চেয়ে ভালো কথা আর কার হবে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, নিজেও ভালো কাজ করে এবং (প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিতে গিয়ে) বলে, অবশ্যই আমি মুসলমান দলের একজন সদস্য।'

এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, কালেমার দিকে দাওয়াত দেয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কথা। এ পবিত্র কথা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাঁর রাজ্যে তাঁর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রদত্ত আহ্বানের কথাগুলো অবশ্যই তিনি শুনেন ও তার মূল্যায়ন করেন, কিন্তু এ দাওয়াত ঐকান্তিকভাবে তখনই আল্লাহর জন্যে (নিবেদিত) হয়, যখন এ দাওয়াতের সাথে ভালো কাজের যোগ হয়, যেহেতু দাওয়াত দানকারীর দায়িত্ব তো শুধু তাবলীগ করাই নয়; বরং তা নিজের জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই দাওয়াত দানকারী যখন নিজেও যদি ভালো কাজ করে, তাহলেই তার দাওয়াত জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং হঠকারী ও বিরোধীদের অন্তরে, (তাদের অজান্তেই) এর একটা প্রভাব পড়তে থাকে।

কোনো দাওয়াত দানকারীর জন্যে কড়া কথা বলা অথবা অপ্রিয় ও অশোভন কথা বলা মোটেই উচিত নয়, তার কর্তব্য হচ্ছে সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কথা ব্যবহার করা, যেহেতু সে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হিসাবে মর্যাদাবান মানুষ, সাধারণ মানুষ থেকে তার পজিশন অনেক ওপরে। অন্যরা কটু কথা বলতে পারে বা দুর্ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ইসলামের পতাকাবাহী, সত্যের প্রতি আহ্বানকারী কোনো ব্যক্তি এমন অশোভণ আচরণ কোনো অবস্থায়ই করতে পারে না। তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'ভালো আর মন্দ কখনও সমান হতে পারে না।'

কারো মন্দ কথা বা আচরণের জওয়াবে মন্দ কথা বলা বা মন্দ ব্যবহার করা তার কাজ নয়। যেহেতু মন্দ আচরণের প্রতিক্রিয়া যা, ভালো আচরণের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তা নয়, যেমন মন্দের মূল্য আর ভালো মূল্য এক নয়। সাধারণভাবে মন্দ ব্যবহারের বদলে মানুষ মন্দ ব্যবহারই করে থাকে- এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির ওপর মানুষ যখন জয়ী হয় এবং সবর ও ক্ষমাশীলতার গুণাবলী দ্বারা যখন কোনো প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোমুখী হয় তখন সেই অহংকারী

ব্যক্তি থমকে যায় এবং তার মনটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে, মার্জিত ব্যবহারের ফলে তার মনের মধ্যে এই ব্যক্তির প্রতি আস্থার সূচনা হতে শুরু করে। তখনই তার মন গলতে শুরু করে এবং তার বিবদমান সত্ত্বা পরিবর্তিত হয়ে অন্তরংগ বন্ধুররূপ গ্রহণ করে– চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। অহংকার দূরীভূত হয়ে সেখানে বিনম্রতা আসে। এরশাদ হচ্ছে,

'ভালো (আচরণ) দিয়েই মন্দ (আচরণ) প্রতিহত করো। তার ফল দাঁড়াবে এই যে, যার সাথে তোমার চরম শত্রুতা রয়েছে সে তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে।'

আমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাকে সামনে রাখলে এ কথার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। আমরা যদি আল কোরআনের এ শিক্ষাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে, ক্রোধের বদলে আসবে শান্তি ও সান্ত্বনা, অহকার রূপান্তরিত হয়ে যাবে লজ্জাবনত মনোভাবে, কর্কশ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে সেখানে প্রিয় ও মধুর বচন আসবে, কণ্ঠের উগ্রতা মোলায়েম হয়ে যাবে, রূঢ় চেহারাতে মিষ্টিমধুর হাঁসির রেখা ফুঁটে উঠবে এবং ক্রুদ্ধ ও সীমাহীন অহংকারী ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবে যদি তারই ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার করা হয়, তারই মতো মেযাজ ভাষা ও ভংগী ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ ব্যবহার করা হয় তাহলে বিরাজমান বিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে চরম শত্রুতার রূপ নেবে, ক্রোধ, অহংকার ও বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী বাড়বে। সেখানে লজ্জা শরম, দূর হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যায় অহংকার দানা বেঁধে উঠবে।

তবে এটা ঠিক যে, যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ আক্রমণ করে এবং যদি এমন কোনো কারণে কেউ দুর্ব্যবহার করে বসে, যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে অবস্থায় ধৈর্য ধরা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় ক্ষমা করার জন্যে প্রয়োজন বড় প্রশস্ত হৃদয়ের, যার মধ্যে দরদ মহব্বত ও ক্ষমাশীলতার মহান গুণাবলী থাকবে, আর তখনই প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা সম্ভব হবে। কিন্তু ক্ষমার সুফল পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন এমন হৃদয়ের ঔদার্য এবং এমন আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যার বর্ণনা উপরোক্ত আয়াতে এসেছে। এর ফলে অন্যায়কারীর অন্তরে অপমানের অনুভূতি আসবে, আসবে পরাজয়ের গ্লানি। সেখানে মানবীয় গুণের বিজয় হবে, প্রতিপক্ষের মধ্যে মানবতা ও মহানুভবতা জাগবে, যেমন করে একটি ল্যাম্পের আলো থেকে হাজারো ল্যাম্প জ্বালানো হলেও প্রথম ল্যাম্পের বাতি এতো টুকু কম হয় না, অথচ অন্যান্যরা অনেকেই এর থেকে আলো পেয়ে ধন্য হয়। এইই হচ্ছে ক্ষমাশীলতার মহান মর্যাদা।

বিশ্বাসগত কারণে বা ঈমান আকীদার পাথর্ক্যের কারণে দুর্ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তা মোমেনরা অনেক সময় সহ্য করে। কিন্তু বস্তুগত কারণে বা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের সংঘাতে যদি কোনো আঘাত বা অবমাননা পেতে হয়, সেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোনো একটা সুন্দর সমাধান না দেয়া পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করা, ভালো কাজের ওপর অবিচল থাকা এবং অন্যায়ের প্রতিদানে ভাল কিছু দিতে পারাটা অবশ্যই বড় মহৎ গুণ। বিলম্বে হলেও এ গুণের সুফল আসবেই।

এইটিই হচ্ছে সেই মহান মর্যাদা, যা অন্যায়কে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার দ্বারা অর্জিত হয়। প্রচন্ড আক্রোশ থামিয়ে দেয়, ক্রোধ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবকে দমন করে। এই মহান ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার পলিসি সবার জীবনেই ভারসাম্য আনে। এই ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা ও ভালো দিয়ে মন্দের প্রতিদান দেয়ার মনোভাব মানুষকে সত্যিই এ মহান মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়, যা সকল মানুষ পেতে পারে না। এ মহান মর্যাদা লাভ করার জন্যে কঠিন সবরের প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এই মহাগুণের মাধ্যমেই সেসব

মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেন। ফলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সেই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সদা সর্বদা সবর করে চলেছে তারা ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারবে না। আরো পারবে তারা, যারা মহা সৌভাগ্যশালী। (আয়াত ৩৫)

এটা হচ্ছে এমন এক উঁচু মর্যাদার স্তর যে পর্যন্ত রসূল (স.)-ই সঠিকভাবে পৌছুতে পেরেছেন। তিনি তো ছিলেন এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের জন্যে বা ব্যক্তিগত কারণে কখনও রাগ করেননি। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে যখন তিনি রাগ করেছেন, তখন আবার এতো বেশী রাগ করেছেন যে অন্য কেউ এইভাবে রাগ করতে পারে না। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর মতো অন্যান্য সকল দাওয়াত দানকারীদের সম্পর্কে আল কোরআনে একই কথা এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি কোনো উস্কানি অনুভব করো তাহলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই তিনি শুনেন এবং জানেন।'

এখানে বুঝা যাচ্ছে ক্রোধ এমন এক অবস্থা যেটা আপনা থেকে আসে না। কোনো বাহ্যিক কারণেই এর উদ্রেক হয় এবং এ অবস্থা আসে তখন যখন কোনো দুর্ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ সহ্য করতে গিয়ে সবরের কমতি দেখা যায়। অথবা ক্ষমার প্রশ্নে কারো বুক সংকীর্ণ হয়ে যায়। সে অবস্থায় শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্যে মরদূদ শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া দরকার। যাতে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই মানবীয় অন্তরের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই অন্তরের মধ্যে প্রবেশের সকল দরজা এবং এর মধ্যে চলাচলের সকল গোপন পথ তিনি জানেন। শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্যে তিনি তার শক্তি ও যোগ্যতাও জানেন, তিনি জানেন কোত্থেকে শয়তান তার কাছে আসে। তিনিই দাওয়াত দানকারীর অন্তরকে তাঁর দিকে রুজু করে রাখতে সক্ষম, তিনিই তাদেরকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্যে নিরাপত্তাদান করতে পারেন। তিনি তাকে ক্রোধের উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আর তিনিই সহিষ্ণু লোকদেরকে সেসব ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারেন, যা ক্রোধের কারণে মানুষকে স্পর্শ করে।

এই ক্রোধকে দমন করার পদ্ধতি বড়ই কঠিন। এটা হচ্ছে কু-প্রবৃত্তির গোপন সুড়ংগ পথ, কন্টকাকীর্ণ গিরি সংকট এবং জংগলে ভরা কঠিন উপত্যকা। এই সব পথ দিয়ে দ্বীনের দাওয়াতদানকারীদেরকে জান্নাতে যাওয়ার পথ অতিক্রম করতে হয়, এভাবেই বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে তারা গন্তব্য স্থানে এবং সফরের শেষ প্রান্তে পৌছে যায়!

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَاِنِ

اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا

يَسْئَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ (সাজদা) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِعْمَلُوْا مَا

شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۚ

৩৭. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত দিন, সূর্য ও চন্দ্র (হচ্ছে কয়েকটি নিদর্শন মাত্র); অতএব তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না– চাঁদকেও নয়, বরং তোমরা সাজদা করো (সেই) আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি এর সব কয়টিকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদাত করতে চাও (তাহলে এটাই হবে একমাত্র করণীয়)। ৩৮. অতপর (হে নবী), এরা যদি অহংকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না), যারা তোমার মালিকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যাচ্ছে, তারা (বিন্দুমাত্রও এতে) ক্লান্ত হয় না। ৩৯. তাঁর (কুদরতের) আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তুমি যমীনকে দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক (ও অনুর্বর হয়ে পড়ে আছে,) অতপর তার ওপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি তখন সহসাই তা শস্য শ্যামল হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে, অবশ্যই যে (আল্লাহ তায়ালা) এ (মৃত যমীন)-কে জীবন দান করেন তিনি মৃত (মানুষ)-কেও জীবিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক শক্তিমান। ৪০. যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা কিন্তু কেউই আমার (দৃষ্টির) অগোচরে নয়; তুমিই বলো, যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে ভালো– না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে (আমার সামনে) হাযির হবে সে ভালো? (এরপরও চৈতন্যোদয় না হলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তবে মনে রেখো), তোমরা যাই করো আল্লাহ তায়ালা তা অবলোকন করছেন। ৪১. যারা (কোরআনের মতো একটি) স্মরণিকা (গ্রন্থ) তাদের কাছে আসার পর তাকে অস্বীকার করে (তারা অচিরেই তাদের পরিণাম টের পাবে), মূলত সেটি হচ্ছে এক সম্মানিত গ্রন্থ, ৪২. এতে বাতিল কিছু (অনুপ্রবেশের আশংকা) নেই– তার সামনের দিক থেকেও নয়, তার পেছনের দিক থেকেও নয়;

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۖ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

(কেননা) এটা বিজ্ঞ, কুশলী, প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে। ৪৩. (হে নবী,) তোমার সম্পর্কে (আজ) সেসব কিছুই বলা হচ্ছে যা তোমার আগে (অন্যান্য) নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিলো; নিসন্দেহে তোমার মালিক (যেমনি) পরম ক্ষমাশীল, (তেমনি) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা (-ও বটে)। ৪৪. আমি যদি এ কোরআন (আরবী ভাষার বদলে) আজমী (অনারব ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না (তারা বলতো, এ কি আজব ব্যাপার); এটা (নাযিল করা হয়েছে) আজমী (ভাষায়), অথচ এর বাহক হচ্ছে আরবী; (হে রসূল,) তুমি বলো, তা (গোটা কোরআন) হচ্ছে (মূলত) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত (গ্রন্থ) ও (মানুষের যাবতীয় রোগ ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা (এর ওপর) ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কোরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা, এ কারণেই সত্য কথা শোনা সত্ত্বেও তারা এর সাথে এমন আচরণ করে); যেন তাদের অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না)।

রুকু ৬

৪৫. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মূসাকেও একটি কেতাব দান করেছিলাম, তাতে (বহু) মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিলো; অতপর তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (কেয়ামত সংক্রান্ত) ঘোষণা যদি না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাব এসে) এদের মাঝে (চূড়ান্ত একটা) ফয়সালা হয়ে যেতো, এরা (আসলে) এ (কোরআন) সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে (নিমজ্জিত) আছে। ৪৬. যে কোনো ব্যক্তিই নেক কাজ করবে– (মূলত) সে (তা) করবে (একান্ত) তার নিজের (কল্যাণের) জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে (তার অশুভ ফল একান্ত) তার ওপরই গিয়ে পড়বে; তোমার মালিক তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কখনো যালেম নন।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا

آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ

وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ

وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ

مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ

رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ

أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৪৭. কেয়ামত (সংক্রান্ত) জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হয়, কোনো একটি ফলও নিজের খোসা ছেড়ে বাইরে বেরোয় না, কোনো একটি নারীও নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে না– না সে সন্তান প্রসব করে, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (মজুদ) থাকে না; যেদিন আল্লাহ তায়ালা ওদের ডেকে বলবেন, কোথায় (আজ) আমার অংশীদাররা, তারা বলবে (হে মালিক), আমরা তোমার কাছে এ নিবেদন করছি, (আজ) আমাদের মাঝে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউই মজুদ নেই, ৪৮. এরা আগে যাদের ডাকতো তারা (আজ) হারিয়ে যাবে, এরা বুঝতে পারবে, তাদের জন্যে আর উদ্ধারের কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই। ৪৯. মানুষ কখনো (বৈষয়িক) কল্যাণ লাভের জন্যে দোয়া (করা) থেকে ক্লান্তি বোধ করে না, অবশ্য যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। ৫০. যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে অনুগ্রহের (স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন আবার সে বলে, এ তো আমার (প্রাপ্য) ছিলো, আমি এটাও মনে করি না, (সত্যি সত্যিই) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, (তাছাড়া) যদি আমাকে (একদিন) মালিকের কাছে ফেরত পাঠানোই হয়, তাহলে আমার জন্যে তাঁর কাছে শুধু কল্যাণই থাকবে, আমি (সেদিন) কাফেরদের অবশ্যই বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তারা কি কি করতো, অতপর (সে অনুযায়ী) আমি তাদের কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো। ৫১. আমি যখন মানুষের ওপর কোনো অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্টো দিকে ফিরে যায়, আবার যখন তাকে কোনো অনিষ্ট এসে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোয়া নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হয়।

قُلۡ اَرَءَیۡتُمۡ اِنۡ کَانَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ثُمَّ کَفَرۡتُمۡ بِهٖ مَنۡ اَضَلُّ مِمَّنۡ هُوَ فِیۡ شِقَاقٍۭ بَعِیۡدٍ ﴿۵۲﴾ سَنُرِیۡهِمۡ اٰیٰتِنَا فِی الۡاٰفَاقِ وَ فِیۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَقُّ ؕ اَوَ لَمۡ یَکۡفِ بِرَبِّکَ اَنَّهٗ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدٌ ﴿۵۳﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ فِیۡ مِرۡیَةٍ مِّنۡ لِّقَآءِ رَبِّهِمۡ ؕ اَلَاۤ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍ مُّحِیۡطٌ ﴿۵۴﴾

৫২. (হে নবী, মানুষদের) বলো, তোমরা কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কোরআন (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসে থাকে (এবং এ সত্ত্বেও) তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তার চাইতে বেশী গোমরাহ আর কে হবে- যে ব্যক্তি (এর) মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে। ৫৩. অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কোরআনই মূলত) সত্য; (হে নবী, তোমার জন্যে) একথা কি যথেষ্ট নয়, তোমার মালিক (তোমার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। ৫৪. জেনে রেখো, এরা কিন্তু এদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারেই সন্দিহান; আরো জেনে রেখো, (এদের) সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।

তাফসীর

আয়াত ৩৭-৫৪

এরপর আর একটি অধ্যায় আসছে , যেখানে বলা হচ্ছে,

'তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে, রাত দিন, সূর্য ও চাঁদ .... শোনো, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুকে আয়ত্তে রাখার মালিক। *(২৭-৫৪)*

এখানে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে মানবীয় অন্তরের সাথে বিজড়িত আর একটি অধ্যায় আসছে। এ অধ্যায়ের বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান নানাপ্রকার নিদর্শন নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে, যেমন রাত দিন, সূর্য ও চাঁদ। সাথে সাথে সেসব মোশরেকদেরকে নিয়েও কথা আসছে, যারা আল্লাহর সাথে সূর্য ও চাঁদকে সেজদা করে। এ উভয়টি তো আল্লাহরই সৃষ্টি। এই নিদর্শনগুলো পেশ করার পর পরই বলা হচ্ছে, সেসব মোশরেকরা অহংকারের কারণে আল্লাহর এবাদত থেকে দূরে রয়েছে। তারা নিরংকুশভাবে আল্লাহরই একনিষ্ঠ দাসত্ব করায় বিশ্বাসী নয়। তারা মনে করতো তাদের থেকে বেশী নেককার ও যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ হলেও আল্লাহর বেশী প্রিয় এবং তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। এরপর রয়েছে এই বিশাল পৃথিবী, এর সবটুকু এবং সব কিছু আল্লাহর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের মত এরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পেয়েছে, কিন্তু এরা তো আল্লাহর কাছে মাথানত করে না। এইভাবে অর্থহীন কথা বলে এরা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান বস্তুনিচয় সম্পর্কে সঠিক চিন্তা থেকে দূরে সরে যায়। উপরন্তু তারা কোরআনের আয়াতগুলোকে ভুল প্রমাণিত করার জন্যে যুক্তিহীনভাবে তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ তারা নিজেরাই দেখছিলো আল কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, কোনো অনারবীয় ভাষার মিশ্রণ এ গ্রন্থে নেই।

এরপর আল কোরআন তাদের সামনে কেয়ামতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরছে। তাদের সামনে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যে বিরাজমান দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরছে। এসব গ্রন্থ তাদেরকে তাদের পরিবর্তনশীলতা ও প্রকৃতিগত ভুল ভ্রান্তির অবস্থা জানাচ্ছে, তারপর তাদের দৃষ্টিকে সকল প্রকার কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করছে। দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাদের ঘাবড়ে যাওয়ার প্রকৃতি সম্পর্কেও জানিয়ে দিচ্ছে। এতদসত্তেও তারা তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করছে না এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে গিয়ে এসব ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যে যে আযাব ভোগ করতে হবে, তার থেকে বাঁচার জন্যেও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আল্লাহর এ ঘোষণার সাথে এই সূরাটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে যে, তিনি তাদের সামনে দিগন্তব্যাপী তাঁর শক্তি ক্ষমতার বিভিন্ন নিদর্শনাবলী খুলে দেবেন এবং সেসব রহস্যকে উন্মোচিত করবেন, যা তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই বিরাজ করছে, যা দেখে তারা পরিষ্কারভাবে বুঝবে যে, তিনি সত্য এবং তখন তাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান যাবতীয় সন্দেহ সংশয় আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে।

সৃষ্টিজগতের দিকে মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা যদি একটু চোখ তুলে তাকাই, তাহলে দেকতে পাবে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন সবার চোখের সামনেই রয়েছে। এগুলো শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই দেখতে পায়। এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জানলেও মানব হৃদয়ে এর একটা প্রভাব পড়ে। কারণ, এসবের মাঝে ও মানবজাতির মাঝে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেয়েও অধিক গভীর। উভয়ের মধ্যকার সেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে-এর উৎপত্তিকে প্রকৃতিকেও এর গঠন প্রণালীকে কেন্দ্র করে। এ হিসেবে মানবজাতি গোটা সৃষ্টিজগতেরই একটা অংশ অপরদিকে সৃষ্টিজগতও মানবজাতি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। উভয়ের গঠনপ্রণালী অভিন্ন, উভয়ের উপাদান অভিন্ন, উভয়ের প্রকৃতি অভিন্ন, উভয়ের নিয়ম নীতি অভিন্ন এবং উভয়ের সৃষ্টিকর্তা ও মাবুদও অভিন্ন। তাই মানুষ যখন গভীর দৃষ্টি ও অনুভূতি নিয়ে এই সৃষ্টিজগতের দিকে তাকায় তখন এর শাশ্বত আবেদন তার মাঝে সাড়া জাগায় এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

সে কারণেই পবিত্র কোরআন মানব হৃদয়কে বার বার এই সৃষ্টি জগতের দিকে আহ্বান করে এবং অচেতনতার নিদ্রা থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে। মানুষের মাঝে এই অচেতনতা সৃষ্টিজগতের সাথে দীর্ঘ দিনের পরিচিতি ও মাখামাখির কারণে জন্ম নেয়, আবার কখনো দীর্ঘ দিনের জমে ওঠা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বাধার কারণে জন্ম নেয়। পবিত্র কোরআন এই প্রতিবন্ধকতা দূর করে, মনের এই অচেতনতাকে দূর করে। ফলে তার মাঝে এক নতুন ও সচেতন মন জন্ম নেয়, যে মন এই বন্ধুসুলভ প্রকৃতিকে আপন করে নেয় এবং পুরনো ও গভীর সম্পর্কের তাড়নায় তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

বিপথগামিতা ও ভ্রষ্টতার একটা চিত্র আলোচ্য আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, চন্দ্র-সূর্যকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় বিশেষের অতিভক্তি ও বিকৃত অনুভূতি। আল্লাহর নৈকট্য লাভের নামে তারা এর উপাসনায় লিপ্ত হয়। পবিত্র কোরআন এই বিপথগামিতা থেকে বিশ্বাসে জমে ওঠা আবিলতা ও পংকিলতা দূর করতে চায়। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর এবাদাত করতে চাও তাহলে চন্দ্র-সূর্যকে সেজদা করে না। বরং 'যে আল্লাহ তায়ালা এসবকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে সেজদা করো' কারণ, একমাত্র স্রষ্টার প্রতিই গোটা সৃষ্টিজগত মনোনিবেশ করে, তাঁর প্রতিই ধাবিত হয়। এই চন্দ্র সূর্যও তোমাদের মতোই নিজ স্রষ্টার প্রতি ধাবিত হয়। কাজেই তাদের সাথে তোমরাও একমাত্র সেই একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার এবাদাতে আত্মনিয়োগ করো যিনি এবাদাত বন্দেগীর একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। আলোচ্য আয়াতে চন্দ্র সূর্যের জন্যে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের সাথে সাথে অন্যান্য

গ্রহ নক্ষত্রকেও বুঝানো হয়েছে। আর একটা দিক লক্ষণীয়, তা হচ্ছে এসব গ্রহ নক্ষত্রের জন্যে প্রাণী বাচক বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেইগুলোকে জীবন্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন বলে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন সেই সবের নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা রয়েছে।

এই সুস্পষ্ট নিদর্শন ও বর্ণনার পরও যদি তারা অহংকারী মানসিকতার পরিচয় দেয় তাহলে তাতে কিছুই আসে যাবে না এবং তাতে কারো লাভ বা ক্ষতি হবে না। কারণ, আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করার জন্যে আরো অনেক সৃষ্টজীব আছে। তারা বিনা অহংকারে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করে আসছে। তাই বলা হচ্ছে, অতপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা তোমার পালনকর্তার কাছে আছে। তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।' (আয়াত ৩৮)

'যারা তোমার পালনকর্তার কাছে আছে' এই বাক্য দ্বারা প্রথমেই ফেরেশতাদের কথা মনে আসে। তবে ফেরেশতা ছাড়া হয়তো আল্লাহর আরও কোনো প্রিয় বান্দা থাকতে পারে যাদের সম্পর্কে আমরা হয়তো জানি না। মোটকথা, যারা আল্লাহর কাছে রয়েছে তারা খুবই সম্মানিত, খুবই মর্যাদাবান খুবই আদর্শবান। তাদের মাঝে সেই অহংকার ও আত্মম্ভরিতা নেই যা পৃথিবীতে বসবাসকারী বিপথগামী ও ভ্রষ্ট লোকদের মাঝে আছে। তারা আল্লাহর খুব কাছে থেকেও তাদের মাঝে কোনো আত্মশ্লাঘা নেই। তারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকেও ক্লান্তি বোধ করে না, অস্বস্তি বোধ করে না। তাহলে তাদের সাথে পৃথিবীতে বসবাসকারী আল্লাহর এবাদাতবিমুখ লোকদের তুলনা কোথায়?

এই যে ধরণী যা মানুষকে মায়ের মতো আহার যোগাচ্ছে। যে ধরণী থেকে তারা জন্ম নিয়েছে এবং তার মাঝেই আবার মিশে যাবে। এই ধরনীর বুকে তারা পিঁপিলিকার ন্যায় বিচরণ করছে এবং এর মধ্য থেকেই খাদ্য আহরণ করছে, পানীয় আহরণ করছে। এই ধরণী আল্লাহর সামনে নতশীরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর কাছ থেকেই জীবনীশক্তি লাভ করছে। বলা হয়েছে,

'তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়.............। (আয়াত ৩৯)

প্রতিটি স্থানে পবিত্র কোরআনের যে সূক্ষ্ম বর্ণনাভংগি তা লক্ষ্য করার মতো। এখানে ভূমির 'বিনয় ও নম্রতা' বলতে বৃষ্টিপাতের পূর্বে এর যে অবস্থা হয়, তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পূর্বে ভূমি থাকে নীথর ও নিশ্চল। কিন্তু যখনই তার ওপর বৃষ্টিপাত হয় তখনই তাতে সৃষ্টি হয় জীবনের স্পন্দন ও চাঞ্চল্য। এই স্পন্দন ও চাঞ্চল্য যেন কৃতজ্ঞতা ও আরাধনার প্রতীক। কারণ যে পটভূমিতে আলোচ্য আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে তা মিনতি, প্রার্থনা ও পবিত্রতা বর্ণনার পটভূমি। এই পটভূমির দৃশ্যের অন্যান্য চরিত্রের মাঝে ধরণীকেও অন্যতম চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তার মাঝেও চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবেগ ও ক্রিয়া কলাপ আরোপ করা হয়েছে।

কোরআনের শৈল্পিক বর্ণনাভংগী

পবিত্র কোরআনের এই সূক্ষ্ম বর্ণনাভংগির মাঝে যে শৈল্পিক সংগতি ফুটে উঠেছে তার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে আমরা 'কোরআনের শিল্পগত চিত্র' নামক গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি। এই গ্রন্থের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'বৃষ্টিপাতের পূর্বে এবং শস্যশ্যামল হওয়ার আগে ভূমির যে অবস্থা হয় তাকে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'পতিত' এবং আর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'অনুর্বর'। অনেকেই মনে করে যে, এখানে শুধু শব্দের পার্থক্য, অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু

যে দুটো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে শব্দদু'টো উল্লেখ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলেই আমরা উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারবো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, 'পতিত' শব্দটি যে প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই, 'হে লোকসকল। যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।' (সূরা আল হজ্জ ৫)

অপরদিকে 'অনুর্বর' শব্দটি যে প্রেক্ষাপটে এসেছে তা হলো, তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী সূর্য ও চন্দ্র.............। (আয়াত ৩৭-৩৯)

'এই প্রেক্ষাপট দুটো সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই 'পতিত' ও 'অনুর্বর' শব্দ দুটোর মধ্যকার সংগতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম প্রেক্ষাপটে উত্থান, পুনর্জীবন এবং উৎপাদনের একটা পরিবেশ বিরাজ করছিলো। তাই সেই পরিবেশের সাথে সংগতি রক্ষা করতে গিয়ে ভূমিকে পতিত বলে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এর পর এর সজীবতা, উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটের পরিবেশ ছিলো উপাসনা, আরাধনা ও প্রার্থনার। তাই এই পরিবেশের সাথে সংগতি রক্ষা করার লক্ষ্যে ভূমিকে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'বিনয়ী অনুর্বর বলে।

'আর একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটে ভূমির আন্দোলন ও শস্যশ্যামলতায় অতিরিক্ত আর কিছু বলা হয়নি। এখানে সজীবতা ও উৎপাদনশীলতার কথা বলা হয়নি। কারণ, উপাসনা আরাধনার পরিবেশের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া এখানে আন্দোলিত ও শস্যশ্যামলতা সেই উদ্দেশ্যে আসেনি যে উদ্দেশ্যে প্রথম প্রেক্ষাপটে এসেছে। এখানে ভূমির বিনয়ের পরে গতিময়তাকে দেখানো হয়েছে। এই গতিময়তাই এখানে কাম্য। কারণ এখানে দৃশ্যের আড়ালে যে চরিত্রগুলো দেখতে পাই তার প্রতিটির মাঝে এই গতিময়তার গুণ রয়েছে। আর এই গতিময়তা হচ্ছে উপাসনা আরাধনাকে কেন্দ্র করে। তাই, ভূমি এককভাবে নিশ্চল ও নিথর থাকুক এটা সুন্দর দেখায় না বা চরিত্রের সাথে মানানসই নয়। সেই কারণেই সে আন্দোলিত হয়ে উঠছে যেন দৃশ্যের অন্যান্য চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের উপাসনা আরাধনায় শরীক হতে পারে। ফলে দৃশ্যের প্রতিটি চরিত্রকেই গতিময় বলে দেখাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে কল্পিত গতিময়তার সংগতির সূক্ষ্ম বর্ণনা যা মানবীয় চিন্তা ও ধারণার অনেক উর্ধে।'

এখন আমরা আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। আয়াতের শেষাংশে মৃতকে জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। আর এটাকে প্রমাণ করার জন্যে মৃত ভূমিকে উজ্জীবিত করার দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি মৃতদেরকেও জীবিত করবেন,' (আয়াত ৩৯)

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনে বার বার এসেছে এবং এগুলোকে পরকালে মানুষকে পুনরায় জীবিত করার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে এগুলোকে আল্লাহর অপার

কুদরতের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবনের যে অস্তিত্ব তা প্রতিটি মানুষ অনুধাবন করতে পারে, বুঝতে পারে। কারণ এই জীবন বিবেক বুদ্ধিকে নাড়া দেয়ার আগে হৃদয় মনকে নাড়া দেয়। আর জীবনের উন্মেষ যখন মৃত্যুর মধ্যে থেকে ঘটে তখন তা সৃজনশীল শক্তির পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরে যা অনুভূতির গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়, আর এভাবেই পবিত্র কোরআন স্বভাবধর্মকে তার নিজস্ব ভাষায় এবং অত্যন্ত সরল পন্থায় আহ্বান করে।

আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করার পরিণতি

জাগতিক নিদর্শনাবলীর গভীর অনুভূতিপূর্ণ এই দৃশ্যের পাশাপাশি সেই সকল লোকদের জন্যে নিন্দা ও হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারিত হচ্ছে যারা সেইসব প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে সেগুলোকে অস্বীকার করে অথবা সেগুলোর মাঝে ক্রটি বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়। বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়........। (আয়াত ৪০)

এখানে হুঁশিয়ারবাণীটি প্রত্যক্ষভাবে না আসলেও অত্যন্ত ভীতিকররূপে এসেছে। বলা হয়েছে, 'তারা আমার কাছে গোপন নয়' অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানের সামনে তারা উন্মুক্ত। তাই তারা যতোই বাকা রাস্তায় চলুক, যতোই ক্রটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াক, যতোই ছিদ্রান্বেষণ করুক আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রেহাই পাবার নয়, আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে পাকাড়ও করেই ছাড়বেন। ওরা হয়তো মনে করেছে, ছল-চাতুরী করে মানুষের হাত থেকে ওরা যেভাবে রেহাই পেয়ে যায় সেভাবেই আল্লাহর হাত থেকেও রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু, তা হবার নয়।

এরপর সুস্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না– সে ব্যক্তি ভালো যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে?'

আলোচ্য আয়াতে ওদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, ওদেরকে জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে, পক্ষান্তরে মোমেন বান্দারা এই জাহান্নাম থেকে সহি-সালামতে থাকবে।

আয়াতের শেষাংশে আর একটি হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে,

'তোমাদের যা মনে চায় করো, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কাজকাম প্রত্যক্ষ করছেন'......

কি মারাত্মক ব্যাপার যে, একজন লোককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে করে সে আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করতে পারে, আর আল্লাহ তায়ালা তার এসব ক্রিয়া-কলাপ দেখবেন ও লক্ষ্য করবেন। পরবর্তী আয়াতে সেই সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা কোরআনের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ কোরআন হচ্ছে এমন একটি মযবুত ও সুরক্ষিত গ্রন্থ যার মাঝে অসত্যের অনুপ্রবেশ ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, (তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে)........।' (আয়াত ৪১-৪৪)

আলোচ্য আয়াতে কেবল এতোটুকু বলা হয়েছে যে, 'যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে,' কিন্তু তারা কি এবং তাদের পরিণতি কি, সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ 'কোরআন আসার পর যারা তা অস্বীকার করে' তারা এমনই একটি দল যাদের অপকর্মের জন্যে উপযুক্ত কোনো বিশেষণ নেই। কারণ, এই অপকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য প্রকৃতির অপকর্ম। সেই জন্যে

এখানে উদ্দেশ্য বলার পর 'বিধেয়' এর কোনো উল্লেখ নেই। বরং পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

'এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' (আয়াত ৪১-৪২)

এই মহাগ্রন্থে মিথ্যার অনুপ্রবেশ কিভাবে ঘটতে পারে? কারণ, এটা তো মতাসত্য আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, সত্যের ঘোষণা দিচ্ছে এবং সেই আদি সত্যের সাথে জুড়ে আছে যার ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে আসমান ও যমীন। এতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ কেন ঘটবে? কারণ এটা তো সম্মানিত একটি গ্রন্থ, আল্লাহর নির্দেশে সুরক্ষিত একটি গ্রন্থ এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর হেফাযতের নিশ্চয়তা দান করেছেন। এ মর্মে তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কোরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই হচ্ছি এর রক্ষক।'

যারা গভীর দৃষ্টি নিয়ে এই কোরআন অধ্যয়ন করে তারা এতে সত্যের সন্ধান পাবে। সত্যের সন্ধান পাবে এর প্রতিটি বক্তব্যে এবং এর সহজ সরল বর্ণনা ভংগিতে। এই সত্য স্বাভাবিক সত্য, সন্তোষজনক সত্য। এই সত্য বিবেকের গভীরে রেখাপাত করে এবং এক অব্যক্ত প্রভাবের সৃষ্টি করে।

এই কোরআন 'প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্ত্বার কাছ থেকে অবতীর্ণ' কাজেই এই প্রজ্ঞার পরিচয় পাই কোরআনের গঠনে, এর নির্দেশনার মাঝে, এর অবতরনের পদ্ধতিতে এবং মানব হৃদয়কে রোগমুক্ত করার এর সংক্ষিপ্ত পন্থার মাঝে। কাজেই যে আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন, তিনি অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার ও উপযুক্ত। কেননা এই কোরআনের মাঝেই এমন কিছু রয়েছে যা হৃদয়কে আল্লাহর অধিক প্রশংসার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

শাশ্বত ঐতিহ্যবাহী ঈমানী কাফেলা

পরবর্তী আয়াতে কোরআনকে পূর্ববর্তী অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের সাথে এবং রসূল (স.)-কে পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল নবী রসূলদের সাথে একীভূত করা হয়েছে, যেন তাঁরা একই পরিবারভুক্ত, একই প্রভূর কাছ থেকে বাণীপ্রাপ্ত, তাঁর সাথেই তাঁদের হৃদয় মন সংযুক্ত এবং তাঁদের পথ ও দাওয়াত তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। ফলে একজন মুসলমান অনুভব করতে পারে যে, সে এমন একটি বৃক্ষের শাখা যার শেকড় গভীরে প্রোথিত এবং সে এমন একটি পরিবারের সদস্য যার রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও শাশ্বত ঐতিহ্য। বলা হয়েছে,

'তোমাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হতো পূর্ববর্তী রসূলদেরকে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার কাছে যেমন ক্ষমা রয়েছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও রয়েছে। (আয়াত ৪৩)

অর্থাৎ ওহীর উৎস অভিন্ন, বাণী অভিন্ন, আকিদা অভিন্ন। তাই মানবজাতির পক্ষ থেকে এর গ্রহণের পদ্ধতিও অভিন্ন এবং অভিযোগের পদ্ধতিও অভিন্ন। এই হিসেবে নবী রসূলরা যেন একটিমাত্র বৃক্ষ, একটি মাত্র পরিবার। তাদের দুঃখ-বেদনা এক, তাদের অভিজ্ঞতা এক, চূড়ান্ত লক্ষ্য এক এবং পথ ও আদর্শ এক। এই বাস্তব সত্যটি সত্য আদর্শের ধারক, বাহক ও প্রচারকদের মনে এক অদ্ভূত সহানুভূতি, শক্তি, ধৈর্য ও সংকল্পের জন্ম দেবে। তখন তারা অনুভব করতে পারবে যে,তারা সেই একই পথের পথিক, যে পথ পূর্বে পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন নুহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মোহাম্মদ (স.) সহ সব নবী রসূল।

এর ফলে সত্য আদর্শের প্রচারকদের মনে এক অপূর্ব মর্যাদাবোধ, গর্ববোধ এবং সহনশীলতা জন্ম নেবে। চলার পথে সকল বাধা বিপত্তি, দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ হাসিমুখে সহ্য করে নেবে এবং মনে করবে যে, তাদের সম্মানিত মহাপুরুষরাও এই পথে চলতে গিয়ে অনুরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গেছেন। তাঁরা ছিলেন মূলত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

'তোমাকে তাই বলা হয়েছে, যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদেরকে বলা হয়েছে'.... এটা একটা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটি মোমেনদের অন্তরে গেঁথে যাওয়ার পর যে প্রভাবের সৃষ্টি হবে, তা হবে অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের একটা অমরকীর্তি। অর্থাৎ সেই জাতীয় মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত করার পর তা হৃদয়পটে গেঁথে দেয়। তাই বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী রসূলদেরকে যা কিছু বলা হয়েছে, শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-কেও ঠিক তাই বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে,

'নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'.......। এই সান্ত্বনাবাণী শোনার পর মোমেনদের অন্তর শান্ত হবে, সুস্থির হবে এবং তারা আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের আশা পোষণ করবে, মোমেনদের অন্তরে কখনও হতাশা-নিরাশা জন্ম নেবে না। সাথে সাথে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে এবং ভীত থাকবে, সে কখনও আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন থাকবে না। এটাই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি যা ইসলামেরই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের টালবাহানা

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়েই আরবী ভাষায় এই পবিত্র কোরআন তাদের জন্যে অবতীর্ণ করেছেন। সাথে সাথে তাদের গোঁয়ার্তুমি, বক্রতা, তর্ক-বিতর্ক ও জালিয়াতি প্রবণতার প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'আমি যদি একে অনারবীয় ভাষায় নাযিল করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলতো, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? এ কি আশ্চর্য, কেতাব অনারবীয় ভাষায় আর রসূল আরবী ভাষায়!' (আয়াত ৪৪)

আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হওয়া সত্তেও ওরা এর বক্তব্য শুনতে চায় না। বরং ওরা আশংকা বোধ করে যে, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এর বক্তব্য আরবদের মনে গেঁথে যাবে। তাই তারা বলে, 'তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।' (আয়াত ২৬)

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি এটাকে অন্য কোনো ভাষায় অবতীর্ণ করতেন, তাহলে তারা আপত্তি জানাতো এবং বলতো বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কেন অবতীর্ণ করা হলো না। আর যদি এর কিছু অংশ আরবী ভাষায়, আর কিছু অংশ অনারবীয় ভাষায় অবতীর্ণ করা হতো তাহলেও তারা আপত্তি জানাতো এবং বলতো, কি অদ্ভুত ব্যাপার। আরবী আর অনারবী এক সংগে? মোটকথা, ওরা ঝগড়াটে ও বক্র স্বভাবের মানুষ। ওরা তর্কের জন্যেই তর্ক করে।

এই বিতর্ক থেকে যে সত্যটি বের হয়ে আসছে তা হলো, এই মহাগ্রন্থ মোমেনদের জন্যে হেদায়েত ও আরোগ্যস্বরূপ। তাই মোমেনদের হৃদয়ই কেবল এই মহাগ্রন্থের প্রকৃতি ও স্বরূপ

উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মাধ্যমে দিকনির্দেশনা পেতে পারে ও আরোগ্য লাভ করতে পারে। আর যারা ঈমানদার নয়, তাদের অন্তর বিকৃত। তাই তাতে এই মহাগ্রন্থের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাদের কর্ণকুহরে এর বাণী পৌঁছে না, তাদের অন্তর্দৃষ্টিও এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা বধির ও অন্ধ। এই কোরআন থেকে তারা কোনোই উপকৃত হতে পারে না। কারণ তারা এই মহাগ্রন্থের প্রকৃতি ও মর্মবাণী থেকে যোজন দূরে। তাই বলা হচ্ছে,

'বলে দাও, এটা বিশ্বাসীদের জন্যে হেদায়াত ও রোগের প্রতিকার। যারা মোমেন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়' (আয়াত ৪৫)

মানুষ প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি পরিবেশে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে আসছে। এই কোরআনের বাণী কিছু লোকের অন্তরে যখন প্রভাব সৃষ্টি করে তখন তাতে নতুন জীবনের উন্মেষ ঘটায়, এবং তার মাঝে ও তার চতুর্পাশের লোকদের এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। অপরদিকে এমন অনেক লোক আছে যাদের কর্ণকুহরে ও অন্তরে এই কোরআন একটা বোঝাস্বরূপ। ফলে এই কোরআন তাদের বধিরতা ও অন্ধত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আসলে কোরআনের পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের হৃদয়ের। তাই আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তা যথার্থই বলেছেন।

মানুষের সুখ সাচ্ছন্দ ও পরকাল বিশ্বাস

পরবর্তী আয়াতে মূসা (আ.)-এর ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তাঁর প্রতি নাযিল করা কেতাবের কথা এবং এই কেতাবকে কেন্দ্র করে মূসা (আ.)-এর জাতির মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে মূলত পূর্ববর্তী রসূলদের জন্যে দৃষ্টান্তরূপে। মূসা (আ.)-এর কেতাবের ব্যাপারে তার সম্প্রদায়ের লোকদের যে মতবিরোধ, এর বিচার ও মীমাংসা আল্লাহ তায়ালা পরকালের জন্যে মুলতবী করে রেখেছেন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়েই যেতো....। (আয়াত ৪৫)

ঠিক একইভাবে শেষ নবীর ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ফয়সালা ওই প্রতিশ্রুত দিনটিতেই হবে। তাই মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে, এরপর তাদের এই কর্মফলের প্রতিদান দেয়া হবে। এ সম্পর্কে তাই বলা হচ্ছে,

'যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎ কর্ম করে তা তার ওপরই বর্তাবে।.....(আয়াত ৪৬)

এই বার্তা মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আহ্বান করছে, এর ওপরই পছন্দ অপছন্দের দায়িত্বভার চাপিয়ে দিচ্ছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার মূলনীতি ঘোষণা করছে। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মকান্ডের ব্যাপারে স্বাধীন, পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারেও স্বাধীন। কারণ,

'তোমার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।'

চূড়ান্ত বিচারের নির্ধারিত সময়ের প্রতি ইংগিত এবং সেই বিচারে আল্লাহর ইনসাফের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আরও একটি প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তা হলো, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র

তাঁরই রয়েছে। আল্লাহর এই জ্ঞানকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন ব্যঞ্জনাময় রূপে উপস্থাপন করা হয় যা হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। বিশেষ করে কেয়ামতের দৃশ্য যখন চিত্রায়িত করা হয় এবং সে সম্পর্কে যখন মোশরেকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। যেমন, 'কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো ফল আবরণমুক্ত হয় না.........। (আয়াত ৪৭-৪৮)

কেয়ামত হচ্ছে অদৃশ্য ও অজানা জগতে লুকায়িত। আর আবরণের ভেতর ফলের অস্তিত্ব হচ্ছে অজানা অদৃশ্যমান রহস্য। তেমনিভাবে মায়ের পেটের ভেতরে ভ্রুণও হচ্ছে এক অদৃশ্য ও গোপন অস্তিত্ব। এসব কিছুর যথার্থ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। একমাত্র তাঁর জ্ঞানই এসবকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। মানুষ যদি পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সকল ফলকে আবরণের ভেতর খুঁজতে যায়, মায়ের পেটের ভেতরে অবস্থিত সকল ভ্রুণের খোঁজ নিতে যায় এবং তা কল্পনা করতে যায় তাহলে তার পক্ষে সেটা কখনও সম্ভব হবে না। অসীম সত্যেকে কল্পনা করার ক্ষমতা মানুষের মাঝে যতো বেশী সৃষ্টি হবে ততোবেশী সে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

উদ্ভ্রান্ত মানুষের একটি দল মহান আল্লাহর এই অসীম জ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকবে। আর সেই মুহূর্তে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, 'আমার শরীকরা আজ কোথায়?'

উত্তরে তারা আজ কী বলবে? আজ তো কোনো তর্ক-বিতর্কের সুযোগ নেই, কথার মারপ্যাঁচের কোনো সুযোগ নেই। আজ ওরা যা বলবে তা হচ্ছে, 'আমরা তোমাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউই এটা স্বীকার করে না' অর্থাৎ আমরা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তোমার কোনো শরীক আছে বলে স্বীকার করবে। এরপর বলা হচ্ছে, পূর্বে তারা যাদের পূজা করত তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে, যে তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই' (আয়াত ৪৮)

তাই আজ আর তারা তাদের পূর্বের দাবীর কোনো কিছুই মনে করবে না। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, আজ তাদের আর কোনো উপায় নেই, কোনো মুক্তি নেই। এটা নিসন্দেহে চরম মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার মুহূর্ত। এই মুহূর্তে মানুষ তার অতীতের সব কিছু ভুলে যাবে। কেবল মনে পড়বে বর্তমানের যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তটি।

এই মুহূর্তটি যে একদিন আসবে সে ব্যাপারে তারা কখনও সতর্ক ছিলোনা এবং এই মুহূর্তটিকে তারা কখনও ভয়ও করতো না। অথচ মানুষ লাভের ব্যাপারে সাধারণত খুবই লোভী হয় আর ক্ষতির ব্যাপারে থাকে ভীত। আজ এই মুহূর্তে তাদের মনে কোনো আশা ভরসা নেই। তাই বলা হচ্ছে,

'মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, যদি তাকে অমংগল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে...........।' (আয়াত ৪৯-৫১)

মানব হৃদয়ের এটাই হচ্ছে সত্য ও সূক্ষ্ম চিত্র। এই মানবহৃদয় আল্লাহর দেখানো পথ অনুসরণ করে না, তাই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। মানব চিত্তের অস্থিরতা, দুর্বলতা, লোভ-লালসা, অকৃতজ্ঞতা, সুখের মুহূর্তের আস্ফালন এবং বিপদের মুহূর্তের হায়-হুতাশের চিত্রটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সুচারুরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

নিজের ভালোর জন্যে, মংগলের জন্যে দোয়া করতে গেলে মানুষ ক্লান্তিবোধ করে না। নিজের জন্যে এই মংগলের দোয়া সে বার বার করে। এতে একটুও বিরক্ত হয় না। আর যদি

একটু বিপদের ছোঁয়া লাগে তাতেই হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। মনে করে আর বুঝি মুক্তির উপায় নেই, সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তার মন ছোটো হয়ে যায়, দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায়। কারণ, নিজের প্রভুর প্রতি তার আস্থা খুবই কম এবং তাঁর সাথে তার বন্ধন খুবই দুর্বল।

এই মানুষকেই আল্লাহ তায়ালা বিপদের পর যখন সুখের মুখ দেখান, তখন এই নেয়ামতকে সে হাল্কা মনে করে। ফলে আল্লাহর শোকর আদায় করতেও ভুলে যায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দে ডুবে গিয়ে সে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দের আসল উৎসকে ভুলে যায় এবং বলে উঠে, এটা আমার। এটা আমারই প্রাপ্য ছিলো। এটা চিরকালই আমার থাকবে। সে তখন পরকালকেও ভুলে যায়। এমনকি পরকাল বলতে কিছু আছে বলেও বিশ্বাস করতে চায় না। তাই বলে,

'কেয়ামত সংঘটিত হবে বলে আমি মনে করি না।'

নিজেকে সে বড় মনে করে। এমনকি আল্লাহর সাথেও বড়াই করতে যায়। আল্লাহর কাছে নিজের বিশেষ মর্যাদা আছে বলে মনে করে অথচ সে পরকালকে অস্বীকার করে খোদ আল্লাহকেই অস্বীকার করেছে। তারপরও সে মনে করে, আল্লাহর কাছে ফিরে গেলে তাঁর কাছে সে বেশ আদর-যত্ন ও মান-মর্যাদা পাবে। তার বক্তব্য হলো,

'আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্যে কল্যাণ রয়েছে।'

এটা এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। তাই এর উত্তরে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে,

'অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো।'

এই মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা যখন করুণা করেন এবং তাকে নেয়ামত দান করেন তখন সে অহংকারী হয়ে ওঠে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং উদাসীনতা প্রদর্শন করে। আর যখন বিপদে পড়ে, তখন নিজেকে দীন ও হীন মনে করে, ছোট ও অধম মনে করে এবং কাকুতি-মিনতি করতে থাকে, আহাজারি করতে থাকে। দীর্ঘ মোনাজাতে মগ্ন থাকে। তাতে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয় না, বিরক্ত হয় না।

মানুষের মনের ছোট বড় সব কিছুই সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করছেন। কেন করবেন না? তিনিই তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি মানুষের অন্তরের সকল অলি গলি সম্পর্কে খবর রাখেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে, তাঁর দেখানো সঠিক পথে না চললে এই আঁকা-বাঁকা রাস্তায়ই চিরকাল চলতে হবে।

প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে বিরাজিত আল্লাহর নিদর্শন

এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'বলো তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য করো........। (আয়াত ৫২)

এটা এমনই একটা সম্ভাবনা যে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু তারা কি সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ওদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে এই বিশাল জগতের প্রতি। সেখান থেকে এবং খোদ মানুষের অস্তিত্ব থেকে কিছু নিদর্শন তুলে ধরার কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

'এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবো পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ....। (আয়াত ৫৩-৫৪)

এটা সর্বশেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এই জগতের কিছু গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে ওয়াদা করছেন। এমনকি তাদের নিজেদের অস্তিত্বের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে ওয়াদা করছেন। এর মাধ্যমে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অর্থাৎ তাঁর এই সত্য ধর্ম, এই সত্য কেতাব এবং সত্য আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যখন তিনি ওয়াদা করেছেন তখন তাঁর এই ওয়াদার চেয়ে আর কার ওয়াদা দৃঢ় হতে পারে, সত্য হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সাথে করা ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন। এই ওয়াদার পর থেকে বিগত চৌদ্দশত বছরের চাইতে বেশী সময় যাবত তিনি বান্দাদের সামনে অনেক রহস্যই উন্মোচন করেছেন। প্রতিদিন জীবন ও জগত সম্পর্কিত নতুন নতুন রহস্য, নতুন নতুন তত্ত্ব তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। গোটা দিগন্ত তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। জীবনের অনেক না জানা ভেদ তাদের সামনে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানুষ অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। কিভাবে জানতে পারলো, সে সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা করতো এবং সেজন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তাহলে তাদের জন্যে মংগলজনক হতো।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা জানতে পেরেছে যে, এই পৃথিবী যেটাকে তারা গোটা বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দু মনে করতো এটা সূর্যের অধীনস্থ ছোট্ট একটা গ্রহ যা গোটা বিশ্বের তুলনায় এক বিন্দুর চেয়ে বড় কিছু নয়। তারা আরও জানতে পেরেছে যে, মহাশূন্যে ভাসমান কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে সূর্যও একটি ছোট্ট নক্ষত্র মাত্র। তারা তাদের পৃথিবীর প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তাদের সূর্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পরেছে, এমনকি গোটা জগতের প্রকৃতি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পেরেছে তবে তাদের এই জানা যদি নির্ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্যে কল্যাণকর।

তারা এই জগতের মূল উপাদান বা বস্তু সম্পর্কে জানতে পেরেছে, যদি সত্যিকার অর্থেই বস্তু বলতে কিছু থেকে থাকে। যাহোক, তারা জানতে পেরেছে যে, এই জগতের গঠনের পেছনে মূল উপাদান হচ্ছে অণু। তারা আরও জানতে পেরেছে যে, এই অণু-বিকিরণে রূপান্তরিত হয়। এর দ্বারা তারা বুঝতে পেরেছে যে, গোটা জগতটাই বিকিরণের ফলস্বরূপ। এই বিকিরণ বিভিন্নরূপে ঘটে থাকে এবং এর ফলেই জগতে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের পৃথিবী নামক গ্রহ সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পেরেছে। তারা জানতে পেরেছে যে, এটা অনেকটা বলের মতো গোলাকার। এই গ্রহ নিজেকে কেন্দ্র করে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তারা তাদের মহাদেশ, মহাসাগর এবং নদী সম্পর্কে জানতে পেরেছে। মহাসাগরের তলদেশের অনেক না জানা তথ্যই এখন তাদের নাগালের মধ্যে। মাটির নীচে লুকায়িত বিভিন্ন সম্পদের সন্ধান লাভে তারা সক্ষম হয়েছে। এমনকি খোদ এই সম্পদের ভেতর লুকায়িত অন্যান্য খনিজ সম্পদেরও তারা সন্ধান পেয়েছে।

তারা প্রকৃতির একক ও অভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, এই নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হয়ে আসছে তাদের পৃথিবীসহ গোটা সৃষ্টিজগত। আবার অনেকেই এই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়ে এর স্রষ্টার সন্ধান লাভে সক্ষম হয়েছে। আবার অনেকেই বিভ্রান্ত

হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তত্ত্বের বাইরে আর কিছু চিন্তা করার অবকাশ পায়নি। কিন্তু বিজ্ঞানের কারণে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার শিকার মানবতা এই বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং বুঝতে পারছে যে, বিজ্ঞান মানুষকে মহাসত্যেরই সন্ধান দেয়।

মানুষের দেহ কেন্দ্র করে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি এ যাবত আবিষ্কৃত হয়েছে তা এই জগতের দেহের তুলনায় কম নয়। এ যাবত মানুষ তার দেহের গঠনপ্রণালী, এর বৈশিষ্ট্য এবং এর কার্য প্রণালী সম্পর্কে না জানা অনেক তথ্যই জানতে পেরেছে। দেহের সৃষ্টি, গঠন প্রণালী, কার্যপ্রণালী, রোগ-ব্যাধী, খাদ্য এবং গতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। মোটকথা দেহের কার্য ও গতি সম্পর্কে যেসব গোপন রহস্য মানুষ এ যাবত জানতে সক্ষম হয়েছে তাকে অলৌকিক ঘটনাই বলা যায় এবং এই অলৌকিক ঘটনার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ নয়।

মানবাত্মা সম্পর্কেও তারা কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছে। তবে এই জানা তথ্য দেহ সম্পর্কিত জানা তথ্যের সমপরিমাণ নয়। কারণ দেহের উপাদন ও এর মেকানিজমের প্রতি যতোটুকু দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ততোটুকু দৃষ্টি মানুষের বিবেক ও আত্মার প্রতি দেয়া হয়নি। তা সত্তেও যতোটুকু জ্ঞান এ সম্পর্কে লাভ হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, কাংখিত বিজয় বেশী দূরে নয়। তবুও মানুষের জানার আরও অনেক কিছু বাকী আছে। তাই আল্লাহর ওয়াদাও বহাল থাকবে।

যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে সত্যের বহিপ্রকাশ এই শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। মোমেনদের কাফেলায় বিভিন্ন শ্রেণী থেকে বিভিন্ন দেশ ও জাতি থেকে লোকজন যোগ দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পথ ধরেও অনেক মানুষ এই কাফেলায় যোগ দিচ্ছে। দিনের পর দিন এই কাফেলা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অথচ নাস্তিকতার বাঁধভাংগা স্রোত অতীতে এই পৃথিবীকে গ্রাস করতে চেয়েছিলো, সেই স্রোতে এখন ভাটা পড়েছে যদিও প্রতিকূল পরিবেশ এখনও রয়েছে। তবে আশা করা যায়, সত্যিকার অর্থে এই বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটবে যতোক্ষণ পর্যন্ত এই স্রোতে পুরোপুরি ভাটা না পড়বে ইনশাআল্লাহ আর এর মাধ্যমেই আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে।

তারা নিজেদের পালনকর্তার সম্মুখে হাযির হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান, আর সে কারণেই তাদের এই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ও পাপাচার। তাদের জানা উচিত, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা কখনই রক্ষা পাবে না। কারণ তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন।

সূরা আশ শূরা

আয়াত ৫৩ রুকু ৫

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ

اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۖ وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ۖ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ

عَلَيْهِمْ ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۖ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা-মীম, ২. আঈন সী-ন-কা-ফ। ৩. (হে নবী,) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর (এ সূরাগুলো) নাযিল করছেন, তোমার পূর্ববর্তী (নবী)-দের কাছেও (তিনি তা এভাবে নাযিল করেছেন), আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪. আসমানসমূহে যা কিছু আছে— যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছুই তাঁর; তিনি সমুন্নত, (তিনি) মহান। ৫. (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) আসমানসমূহ তাদের উপরিভাগ থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো, (এ সময়) ফেরেশতারা তাদের মহান মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, তারা দুনিয়াবাসীদের জন্যেও (তখন) আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে; তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর নযর রাখছেন, তুমি (তো) এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নও। ৭. এভাবেই (হে নবী, এ) আরবী কোরআন আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মক্কাবাসীদের ও তার আশেপাশে যারা বসবাস করে তাদের (জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারো, (বিশেষ করে) তাদের তুমি (কেয়ামতের) মহাসমাবেশের দিন সম্পর্কেও হুশিয়ার করতে পারো; যে দিনের (ব্যাপারে) কোনো রকম সন্দেহ শোবা নেই, আর

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ

وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٨﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ

يُحْيِ الْمَوْتٰى ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ

شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ

اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهٗ

مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ

(আল্লাহ তায়ালার বিচারে সেদিন) একদল লোক জান্নাতে আরেক দল লোক জাহান্নামে (প্রবেশ করবে)। ৮. আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকে একটি (অখন্ড) জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করান; আর যারা যালেম তাদের (ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত হচ্ছে), তাদের কোথাও কোনো অভিভাবক থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও। ৯. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (অথচ) অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর প্রবল শক্তিমান।

রুকু ২

১০. (হে মানুষ,) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী,) এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার মালিক, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই রুজু করি। ১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন, (তিনি) পশুদের মাঝেও (তাদের) জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (এভাবেই) তিনি সেখানে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; (সৃষ্টিলোকে) কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, (তিনি) সর্বদ্রষ্টা। ১২. আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত চাবি (-কাঠি) তাঁরই হাতে, তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যার জন্যে চান) সংকুচিত করেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। ১৩. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বীনই' নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا

تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ

مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ

مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ

وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ

رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ

ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِنۢ

আদেশ আমি ইববরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম, (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম), তোমরা এ জীবন বিধান (সমাজে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না; (অবশ্য) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আহ্বান করছো, এটা মোশরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিষহ মনে হয়; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে নিজের দিকে নিয়ে আসেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (দ্বীনের পথে) পরিচালিত করেন। ১৪. (হে নবী, ওদের কাছে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও ওরা কেবলমাত্র নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণেই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়; যদি এদের একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (অব্যাহতি দিয়ে রাখার) তোমার মালিকের ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাবের মাধ্যমে) ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; (আসলে) যাদের আগের লোকদের পরে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা (কোরআনের ব্যাপারে) এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে। ১৫. অতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি (এর উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকো, ওদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের যা কিছুই অবতীর্ণ করেন না কেন, আমি তার ওপরই ঈমান আনি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি; আল্লাহ তায়ালা আমাদের মালিক এবং তোমাদেরও মালিক; আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে; আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো ঝগড়াঝাটি নেই; আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, আর (সবাইকে) তার দিকেই ফিরে যেতে হবে; ১৬. যারা

بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا

يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ

يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ

يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي

حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

আল্লাহ তায়ালার (দ্বীন) সম্পর্কে বিতর্ক করে, (বিশেষত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক) তা (দ্বীন) গৃহীত হওয়ার পর এদের বিতর্ক তাদের মালিকের কাছে সম্পূর্ণ অসার, তাদের ওপর (তাঁর) গযব, তাদের জন্যে রয়েছে (তাঁর) কঠিন শাস্তি। ১৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব ও (ইনসাফের) মানদন্ড নাযিল করেছেন; (হে নবী,) তুমি কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত একান্ত কাছে (এসে গেছে)! ১৮. যারা সে (কেয়ামতের) বিষয়ে বিশ্বাস করে না, তারা কামনা করে তা ত্বরান্বিত হোক, (অপরদিকে) যারা তা বিশ্বাস করে তারা তার থেকে ভয় করে, (কেননা) তারা জানে সে (দিন)-টি একান্ত সত্য; জেনে রেখো, যারাই কেয়ামত সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে তারা মারাত্মক গোমরাহীতে রয়েছে। ১৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবহিত আছেন, তিনি যাকে রেযেক দিতে চান দেন, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

রুকু ৩

২০. যে ব্যক্তি পরকালের (কল্যাণের) ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে (অবশ্য দুনিয়ায়) তার কিছু অংশ দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে (সে ফসলের) কোনো অংশই বাকী থাকে না। ২১. এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন কোনো জীবন বিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দান করেননি; যদি (আযাবের মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালেমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ

افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ

الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾

২২. (হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালেমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকান্ড (-এর শাস্তি) থেকে ভীত সন্ত্রস্ত, কেননা তা তাদের ওপর পতিত হবেই; (কিন্তু) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানে (অবস্থান করবে), তারা (সেদিন) যা কিছু চাইবে তাদের মালিকের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (সেখানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) মহা অনুগ্রহ। ২৩. আর সেটা হচ্ছে তাই (নেয়ামত)– আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দাদের যার সুসংবাদ দান করেন, যারা (এর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে এ (দ্বীন প্রচারের) ওপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে (তোমাদের সাথে আমার) আত্মীয়তা (সূত্রে) যে সৌহার্দ (আমার পাওনা) রয়েছে সেটা আলাদা; যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করে তার জন্যে আমি তার (সে নেক) কাজে অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য যোগ করে দেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। ২৪. (হে নবী,) তারা কি বলে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারতেন; আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে (এমনিই) মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন; অবশ্যই (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটায় অন্যান্য মক্কী সূরার মতো আকীদা ও ঈমান সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ সূরায় ওহী ও রেসালাতের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলতে গেলে এটাই এ সূরার কেন্দ্রীয় ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য বিষয় নিয়ে এখানে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা কেবল ওহী ও রেসালাতের আনুষংগিক বিষয় হিসাবেই করা হয়েছে।

এ ছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরার বিভিন্ন স্থানে কেয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে জোর দেয়া হয়েছে কেয়ামত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের ওপর এবং ঈমান আনয়নকারীদের চমকপ্রদ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সদগুণাবলীকে তুলে ধরা হয়েছে। একপর্যায়ে জীবিকা, জীবিকার স্বল্পতা ও প্রাচুর্য কিভাবে হয় এবং স্বল্পতা ও প্রাচুর্যে মানুষের মতিগতি কি ধরনের হয়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে সব কিছু সত্তেও ওহী ও রেসালাতই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্য যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা এই ওহী ও রেসালাতের গুরুত্ব বর্ধক হিসাবেই আলোচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সূরায় উক্ত বিষয়টা ও তার অনুষংগ অন্যান্য বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, অধিকতর চিন্তা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যে বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব আয়াতের মাঝখানে স্রষ্টার একত্ব, জীবিকাদাতার একত্ব, মন মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রণকারীর একত্ব একত্ব বিষয়ক আয়াত রয়েছে। তাছাড়া ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আয়াতগুলোতে আনুষংগিকভাবে ওহী প্রেরণকারীর একত্ব, ওহীর একত্ব, ইসলামী আকীদার একত্ব, ইসলামী আইন ও বিধানের একত্ব এবং সর্বশেষে ইসলামী আকীদার আওতাধীন মানবজাতির নেতৃত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এভাবে সূরাটা অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে অন্তরে একত্বের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে, যদিও এই একত্বের মাঝে বিবিধ রকমের ইশারা-ইংগিত ও তাৎপর্য রয়েছে। সূরায় বহু বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। সূরার বিস্তারিত আলোচনার আগে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত উদাহরণ পেশ করছি।

প্রথমে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার প্রসংগে আসা যাক। সূরার শুরুতেই রয়েছে, হা-মীম-আইন-সীন-কাফ'; এর অব্যবহিত পরেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'এভাবেই তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে থাকেন।' এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, সকল যুগের নবীদের কাছে প্রেরিত ওহীর উৎস একটাই 'তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে,' কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এরপর মহান আল্লাহ কেমন মহাপরাক্রমশালী ও কেমন মহাবিজ্ঞানী তা বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে। 'যা কিছু আকাশে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব তাঁরই মালিকানাধীন।' (আয়াত ৪) এ আয়াতের মাধ্যমে জানানো হলো যে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় প্রাণী বা বস্তুর মালিক একজন মাত্র এবং সব কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এরপর বিশ্বজাহানের মালিকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে ও মানবজাতির একাংশের মোশরেক হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র সৃষ্টিজগত কী ভূমিকা পালন করে, তা তুলে ধরা হয়েছে ৫ ও ৬ নং আয়াতে। এখানে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত ঈমান ও শেরেকের ব্যাপারে এতোটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে যে, বিশ্ববাসীর একাংশ মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী না হওয়ায় তারা যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম। অপরদিকে মানবজাতির এই বিকারগ্রস্ত শ্রেণীটার এই জঘন্য কর্মকান্ড ক্ষমা করার জন্যে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন জানান।

এই প্রথম পর্বটা শেষ করার পর ৭ নং আয়াত থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে মূল বিষয়টা অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনা। বলা হয়েছে যে, মানবজাতির একটা গোষ্ঠী ওহী ও রেসালাতে বিশ্বাস করার কারণে জান্নাতে এবং অপর গোষ্ঠী বিশ্বাস না করায় জাহান্নামে যাবে। এই দুটো গোষ্ঠীর উল্লেখের পর পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তবে সমগ্র মানব জাতিকে একটা জাতিতেই পরিণত করতেন। তবে তিনি নিজের সীমাহীন জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর পছন্দসই লোকদেরকে (অর্থাৎ

ঈমানদার সৎ লোকদেরকে) তাঁর রহমতের ভেতরে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে অত্যাচারীদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। তারপর বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকলের অভিভাবক, জীবনদাতা, মৃত্যু-সংঘটনকারী ও সর্বশক্তিমান। (আয়াত-৯)

এখানে থেকে পুনরায় মূল বিষয় অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানবজাতি যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়, সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি এই কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ যে কোনো মতভেদ নিরসনের জন্যে কোরআনেরই শরণাপন্ন হতে পারে। (আয়াত-১০)

এরপর ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনিই একক স্রষ্টা, অতুলনীয় সত্ত্বা, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জীবিকা প্রশস্ত বা সংকীর্ণ করার একচেটিয়া ক্ষমতার মালিক এবং সর্ববিষয়ে সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর পুনরায় ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনা এসেছে ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে। এভাবে সমস্ত সূরা জুড়ে ওহী ও রেসালাতের বিষয়টা বারবার ঘুরে ঘুরে অন্যান্য বিষয় দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এসেছে। তাই আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত এই সব বিষয় ওহী ও রেসালাতের অনুষংগ হলেও মনে হয় যেন ওগুলোই মূল আলোচ্য বিষয়। আর আলোচ্য বিষয়ের এই ধারাবিন্যাস বিশেষভাবে সূরার প্রথম অংশে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। কয়েকটা আয়াত পরপরই পাঠক কোনো না কোনোভাবে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক বক্তব্যের সাক্ষাত পায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সূরার বাদ বাকী অংশ। এ অংশের শুরুতে জীবন জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতা, আল্লাহর দয়াক্রমে বৃষ্টি বর্ষণে, প্রাণীসমূহের বিচরণে এবং সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজে ও নৌকায় আল্লাহর যে নিদর্শন রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে মোমেনদের গুণাবলী, যা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে থাকে।

এরপর কেয়ামতের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে অপরাধীরা আযাব দেখে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। (আয়াত ৪৪ ও ৪৫) সেই সাথে মোমেনদের উচ্চ মর্যাদা এবং যালেমদের শাস্তির প্রতি তাদের সমর্থনেরও উল্লেখ রয়েছে ৪৫ নং আয়াতে। আর এই দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সময় থাকতে আত্মশুদ্ধি করে আযাব থেকে আত্মরক্ষা করার আহবান জানানো হয়েছে ৪৭ নং আয়াতে। আবার এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনায় ৪৮ নং আয়াতে।

এরপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বিষয়েই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে সূরার শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৫২-৫৩) সূরার সমগ্র অবয়ব জুড়ে ওহী ও রেসালাত বিষয়ক আলোচনার এই প্রাধান্য থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সূরার বিষয়বস্তুর ধারা বিন্যাস ও বর্ণনাভংগীর সাথে এই উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। এই উদ্দেশ্যটা হলো, শেষ নবী ও তাঁর অনুসারী এই শেষ উম্মাহকে মানব জাতির নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করা। কেননা এই উম্মাহ আল্লাহর সেই বিধান ও শরীয়তের অনুসারী, যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, 'এভাবেই তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী নাযিল করেন মহা প্রতাপশালী ও মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা।' (আয়াত ৩) এ উক্তি থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকল নবী ও রসূলের কাছে ওহী পাঠান এবং শেষ নবীর কাছে আগত দ্বীন ও শরীয়ত নতুন কিছু নয়, বরং প্রাচীন কাল থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসা একটা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলা হয়েছে, 'এভাবেই আমি তোমার কাছে আরবী কোরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মক্কা ও তার আশপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করো।' (আয়াত-৭) এভাবে নতুন নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল কী, তা জানিয়ে দেয়া হলো।

৩ নং আয়াতে সকল রেসালাত ও নবুওতের উৎস এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করার পর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই রেসালাত ও নবুওত মূলত এক ও অভিন্ন জিনিস।

তারপর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও রেসালাত ও তার উৎস এক ও অভিন্ন এবং এ নিয়ে ভেদাভেদ করার অবকাশ নেই, তথাপি ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে লংঘন করে ভেদাভেদ করা হয়েছে। আর উক্ত মহান রসূলদের অনুসারীরা এই ভেদাভেদ জেনে ও বুঝে করেছে, হিংসা ও অহংকারের মনোভাব নিয়ে করেছে। এরপর এই ভেদাভেদকারীদের উত্তরাধিকারীদের চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এই বলে যে, 'তারা ঘোরতর সংশয়ে লিপ্ত।'

এই পর্যায়ে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানবজাতি সন্দেহ উচ্ছৃংখলতার যুগে ফিরে গিয়েছিলো এবং নির্ভুল পথে পরিচালিত কোনো নেতৃত্ব তার ছিলো না। কেননা মহান আল্লাহর প্রেরিত রসূলের নেতৃত্বের ব্যাপারে তার অনুসারীরা সংশয়ে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীরাও সংশয়ে লিপ্ত থাকে এবং কোনো সঠিক নেতৃত্ব তাদের মধ্যে ছিলো না।

এ কারণেই সর্বশেষ রসূলকে এই নেতৃত্বের ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে এই বলে, 'অতএব, তুমি দাওয়াত দাও, তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকো এবং বলো, আল্লাহ যে কেতাব নাযিল করেছেন, তাতে আমি ঈমান এনেছি। আর আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করি .....।' (আয়াত ১৫) আর এ কারণেই এ সূরার দ্বিতীয় অংশে মানবজাতিকে নির্ভুল ও স্থিতিশীল ওহীভিত্তিক আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রদানের স্বাভাবিক যোগ্যতাকে মুসলমানদের অন্যতম জাতীয় ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মূল সূর ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সূরার বিশদ তাফসীরে এ বিষয়টা ক্রমান্বয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তাফসীর

আয়াত ১-২৪

'হা-মীম-আইন-সীন কাফ, ...।' (আয়াত ১-৬)

কতিপয় সূরার শুরুতে উল্লেখিত এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এ সূরার শুরুতে বর্ণিত এই কটা বর্ণমালার ব্যাখ্যায়ও সেই আলোচনাই প্রযোজ্য এবং সেইটুকুই যথেষ্ট। এর অব্যবহিত পর আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'এভাবেই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী নাযিল করেন'

অর্থাৎ তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছিলো তা এভাবেই পাঠানো হয়েছিলো এবং এসব অক্ষর দিয়েই তা রচিত হয়েছিলো। এসব অক্ষর বা বর্ণমালা তাদের কাছে সুপরিচিতি। অথচ তারা তাদের সুপরিচিতি এসব অক্ষর দিয়ে এ ধরনের বাণী রচনা করতে পারেনি।

অন্যদিক দিয়ে দেখলে এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্থান কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সকল ওহীই মূলত এক ও অভিন্ন এবং তার উৎসও এক ও অভিন্ন। ওহীর প্রেরণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা আর এর প্রাপক হচ্ছেন বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন অঞ্চলের নবী ও রসূলরা।

'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি'

বস্তুত এ একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, যার সূচনা বহু আগেই হয়েছে, যুগ যুগ কাল ধরে অব্যাহত থেকেছে এবং এর শাখা প্রশাখা বহুসংখ্যক হলেও মূল ও শেকড় একটাই।

এ সত্যটা যখন মোমেনদের মন মগযে বদ্ধমূল হয়, তখন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের নীতি ও আদর্শের মূল ও উৎস এক ও অভিন্ন। সেই উৎস হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী ও মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা। কাজেই এই আদর্শের অনুসারীরা সবাই পরস্পরের একান্ত আপনজন, চাই তাদের স্থান ও কালে যতোই ভিন্ন ভিন্ন হোক না কেন। তারা ইতিহাসের হাজার হাজার বছরের ব্যবধানের মধ্য দিয়েও একই পরিবার হিসাবে চিহ্নিত। তাদের শেকড় যুগ যুগ কালব্যাপী বিস্তৃত হলেও শেষ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর সাথেই মিলিত হয়। তিনি 'মহাপরাক্রমশালী' অর্থাৎ সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার মালিক। 'মহাকুশলী' অর্থাৎ মহা প্রজ্ঞাবান। তিনি গভীর প্রজ্ঞা ও কুশলতা দ্বারা বুঝতে পারেন কাকে কী ওহী পাঠানো উচিত এবং সেই অনুসারেই তিনি তা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাঠান। সুতরাং তাঁর এই প্রাজ্ঞ একক ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে তারা অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থাকে কেন গ্রহণ করে, যার কোনো উৎস জানা যায় না এবং যা কোনো সঠিক গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয় না?

যে আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলের কাছে ওহী পাঠান, তার গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সে সবের তিনিই একমাত্র মালিক এবং তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। (আয়াত ৪)

মানুষ কখনো কখনো প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে ভাবতে থাকে যে, সে অনেক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সহায় সম্পদের মালিক। সে এ কথা ভাবে শুধু এ জন্যে যে, সে বহুসংখ্যক জিনিসকে নিজেদের চোখের সামনে নিজের অনুগত দেখতে পায়, সেগুলো দ্বারা সে উপকৃত হয় এবং সেগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত কাজে লাগায়। অথচ এগুলোর সত্যিকার মালিক সে নয়। প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি সৃষ্টি করেন, আবার সৃষ্টিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন, বাঁচান ও মারেন। মানুষকে যা ইচ্ছে দিতে পারেন এবং যা ইচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। তিনি মানুষকে যা ইচ্ছে বিতরণ করেন, আর যা ইচ্ছা, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন, আবার যা ছিনিয়ে নেন, তার পরিবর্তে নতুন কিছু দিতেও পারেন। তিনিই সেই আসল মালিক, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের প্রকৃতির ও স্বভাবসিদ্ধ গুণাগুণ স্থির করেন, সেগুলোকে প্রাকৃতিক বিধি বিধান অনুসারে পরিচালনা করেন, আর এর ফলে সেই প্রাকৃতিক বিধানের দাবী অনুসারে সকল জিনিস তার অনুগত ও বশীভূত থাকে এবং এই হিসাবে তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জিনিসের প্রকৃত মালিক।

'আর তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী ও মহামহিম।'

অর্থাৎ তিনি শুধু পৃথিবীর সকল জিনিসের মালিকই নন, বরং পৃথক পৃথকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বেরও মালিক। তার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে আর সব কিছুই হীন এবং তার মহত্বের সামনে আর সবই নগণ্য।

আর যখন এই সত্য অন্তরে যথাযথভাবে বদ্ধমূল হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে নিজের জন্যে জীবিকা উপার্জন করতে সে যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করছে তা সঠিক কিনা। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু যখন আল্লাহর, তাঁর হাতেই যখন সব কিছু, তখন এ জন্যে বেপরোয়া হয়ে ন্যায় ও অন্যায় এবং হালাল হারামের বাছ-বিচার পরিহার করা উচিত নয়। তাছাড়া তিনি যখন মহান ও উচ্চ মর্যাদাশালী তখন তাঁর কাছে যে ব্যক্তি হাত পাতবে, সে তুচ্ছ ও নগণ্য হবে না।

বিশ্বপ্রকৃতিতে তাওহীদের নিদর্শন

এরপর বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর মালিকানা কেমন নির্ভেজাল ও অংশীদারবিহীন, তা বুঝানোর জন্যে একটা দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেটা হলো, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার অনুভূতির তীব্রতায় আকাশ যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তার কাছে বিশ্ববাসীর পাপের জন্যে ক্ষমা চায় ও তাসবীহ পাঠ করে। (আয়াত ৫)

আকাশ হচ্ছে সেই বিশাল ও বিরাট সৃষ্টি, যাকে আমরা পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের মাথার ওপর দেখতে পাই। এ বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য ও অপ্রতুল। এ যাবত আমরা যেসব তথ্য জানতে পেরেছি তার একটা হলো, এই মহাকাশে আল্লাহ তায়ালার যে সকল সৃষ্টি রয়েছে, তন্মধ্যে এক লক্ষ মিলিয়ন সৌর মন্ডল অন্যতম। এর প্রত্যেকটা সৌর মন্ডলে আমাদের এই সূর্যের মত এক লক্ষ মিলিয়ন সূর্য রয়েছে। এর প্রত্যেকটা সূর্য আমাদের এই পৃথিবীর দশ লক্ষ গুণের চেয়েও বড়। আর এই সমস্ত সৌর মন্ডলকে আমরা আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে পেয়েছি এবং এগুলো আকাশে এত দূরে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে যে, এগুলোর পরস্পরের মধ্যকার ব্যবধান লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি আলোক বর্ষের সমান। অর্থাৎ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই হিসাবে আলোক বর্ষ গণনা করা হয়েছে।

যে আকাশ সম্পর্কে আমরা এই সামান্য তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, সেই আকাশ মহান আল্লাহর ভয়ে ও বিশ্ববাসীর পাপের পরিণতির আশংকায় ফেটে পড়তে চায়।

'আর ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে ও বিশ্ববাসীর জন্যে ক্ষমা চায়।'

ফেরেশতারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তারাই প্রথম সৃষ্ট জাতি, যারা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে জীবন যাপন করে। তবে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে অনুভব করে এবং আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ সর্বক্ষণ তাসবীহ পাঠ করে। অথচ পৃথিবীর পাপপ্রবণ অধিবাসীরা ঈমান আনে না ও বিপথগামী হয়। এ জন্যে ফেরেশতারা সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে, কখন যেন আল্লাহর গযব এসে পড়ে। তাই তারা পৃথিবীতে সংঘটিত পাপাচার ও অপরাধসমূহের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এখানে 'বিশ্ববাসীর জন্যে ক্ষমা চায়' কথাটার অর্থ এও হতে পারে যে, 'ঈমানদারদের জন্যে ক্ষমা চায়, যেমন সূরা 'মোমেন'-এ বলা হয়েছে, 'যারা আরশকে বহন করে ও যারা আরশের আশে পাশে থাকে, তারা তাদের প্রতিপালকের গুণগান করে তার প্রতি ঈমান আনে এবং মোমেনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট বুঝা যায় ফেরেশতারা পৃথিবীতে যে কোনো ধরনের পাপাচার সংঘটিত হওয়াকে ভয় পায়। এমনকি মোমেনদের দ্বারা সংঘটিত হওয়াকেও তারা ভয় পায়। বুঝা যায় এই ভয়ের কারণেই তারা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে গুণগান করে ও ক্ষমা চায়। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে, তাঁর রাজত্বে তাঁর অবাধ্যতা সংঘটিত হওয়া যে বিপজ্জনক, সে কথা ব্যক্ত করে এবং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার প্রত্যাশা ও আবেদন জানায়।

'জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

এভাবে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ এবং বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা-এই দুটো গুণের সাথে মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, দয়াশীলতা ও ক্ষমাশীলতা-এই চারটে গুণের সংযোজন ঘটানো হলো। কেননা আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে তার গুণাবলীর মাধ্যমেই চিনে থাকে।

উক্ত গুণাবলী ও সমগ্র সৃষ্টি জগতের ওপর ওগুলোর প্রভাব বর্ণনা করার পর আয়াতটার শেষাংশে মোশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জানা উচিত যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, রসূল (স.)-কে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান। কেননা তিনি মোশরেকদের অপকর্মের জন্যে দায়ী নন। তাদের তত্ত্বাবধায়ক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনিই তাদের তদারককারী।

'যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের রক্ষক আল্লাহ তায়ালা। তুমি তাদের দায়ী নও।'

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারী এসব হতভাগা মোশরেকের শোচনীয় ভাবমূর্তি প্রত্যেক সচেতন বিবেকের কাছেই ধরা পড়ে। তারা ও তাদের অভিভাবকরা দুনিয়া ও আখেরাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। তাদের তত্ত্বাবধায়ক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর মুঠোর ভেতরে তারা নিদারুণ অসহায় ও অক্ষম। রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনরা তাদের জন্যে দায়ী নন। তাদের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই নিয়েছেন।

মুসলমানদের অন্তরে এ সত্যটা বদ্ধমূল হওয়া খুবই জরুরী, যাতে তারা অন্তত এ দিক দিয়ে সর্বাবস্থায় নিশ্চিন্ত হয়। আল্লাহকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণকারীরা দুনিয়ার জীবনে প্রভাবশালী হোক অথবা অপ্রভাবশালী, কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালীরা যতোই স্বৈরাচারী হোক না কেন, তারা যতোক্ষণ আল্লাহর অনুগত হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ছাড়পত্র গ্রহণ না করবে, ততোক্ষণ তারা প্রকৃত পক্ষে দুর্বলই থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই তাদের রক্ষক এবং তাদের আশপাশের সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। অথচ একমাত্র তারাই বিপথগামী। একটা সুশৃংখল, সুসমন্বিত ও সুপ্রশিক্ষিত বাদক দলে একজন বেসুরো বাদক যেমন বেখাপ্পা ও বেমানান, এই মোশরেকেরাও তেমনি মহা বিশ্বের একমাত্র বিদ্রোহী সৃষ্টি হিসাবে বেমানান। আর যারা তেমন প্রভাবশালী নয়, তাদের ব্যাপারেও মোমেনদের দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তবে তাতে মোমেনদের ঘাড়ে কোনো দোষ বর্তাবে না। কেননা বিপথগামীদের কোনো দায় দায়িত্ব তাদের ওপর ছিলো না এবং নেই। সদুপদেশ দান ও প্রচার ছাড়া তাদের আর কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। বান্দাদের মন ও মানসিকতার রক্ষণাবেক্ষণ কেবল আল্লাহর কাজ অন্য কারো নয়।

এ জন্যে মোমেনরা নিশ্চিন্তে নিজেদের পথে চলতে থাকে, কারণ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্ভুল পথনির্দেশনার আলোকে চলে। যারা বিপথগামী, তাদের বিপথগামিতা যে ধরনেরই হোক তাতে তাদের কিছু এসে যায় না।

আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে বাছাই করণ

পুনরায় প্রথম কেন্দ্রীয় বিষয়টা নিয়ে বলা হচ্ছে, 'এভাবেই আমি তোমার কাছে আরবী কোরআন ওহী করেছি ....।' (আয়াত ৭)

আয়াতের উক্ত অংশটাকে সূরার প্রথম আয়াতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে 'ওয়াও' (এবং) দ্বারা। সেই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা ও এখানকার আরবী কোরআনের মাঝে সুস্পষ্ট সমন্বয় বিদ্যমান। কেননা সেই বর্ণমালাও আরবী, আর এই কোরআনও আরবী। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহীকে এই আরবী পুস্তকের আকারে নাযিল করেন, যাতে করে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। সেই লক্ষ্য হলো,

যেন তুমি 'উম্মুল কোরা' ও তার আশপাশের এলাকাকে সতর্ক করো।'

উম্মুল কোরা হচ্ছে মক্কা শরীফ। আল্লাহর প্রাচীনতম ঘর কাবা শরীফ এখানে অবস্থিত হওয়ায় তা সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ রেসালাতের অবস্থানস্থল হিসাবে মক্কা ও তার আশপাশের জনপদগুলোকে মনোনীত করেছেন। আর যে উদ্দেশ্যে তিনি কোরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন তা তিনিই জানেন। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোথায় তাঁর রেসালাতকে পাঠাবেন।'

আজ যখন আমরা বিভিন্ন ঘটনাবলী, পরিস্থিতি ও তার দাবী এবং ইসলামের বিস্তৃতি কিভাবে ঘটেছে, তা লক্ষ্য করি, তখন বুঝতে পারি সেই সময়ে এই ভূখন্ডটাকে মনোনীত করার পেছনে আল্লাহর কী গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিহিত ছিলো। জানতে পারি, এ স্থানটাকে সর্বশেষ ও সমগ্র

মানব জাতির জন্যে আগত ঐশী বিধান ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিসাবে মনোনীত করার যৌক্তিকতা কী ছিলো। অনুধাবন করতে পারি যে, প্রথম দিন থেকেই আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহকারী পূর্ণাংগ জীবন বিধান ইসলাম কেন এ স্থানটাকে নিজের প্রথম রাজধানী বানিয়েছিলো।

এই সর্বশেষ রেসালাতের আগমনকালে সভ্য দুনিয়া চারটে সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। রোম সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য, চীন সাম্রাজ্য ও ভারত সাম্রাজ্য। এগুলোর মধ্যে রোম সাম্রাজ্য ছিলো ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অংশ বিশেষ জুড়ে বিস্তৃত। পারস্য সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিরাজ করতো এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। আর চীনা ও ভারতীয় সাম্রাজ্য দুটো বলতে গেলে নিজ নিজ ভূখন্ডেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এরা উভয়ে নিজ নিজ আকীদা বিশ্বাস ও রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণে সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে ছিলো। এ কারণে প্রথমোক্ত সাম্রাজ্য দুটোরই ছিলো প্রকৃত পক্ষে বিশ্বজোড়া প্রভাব ও বিস্তৃতি।

ইসলামের আগমনের পূর্বে দুটো ওহীভিত্তিক ধর্ম ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ প্রথমোক্ত সাম্রাজ্য দুটোর প্রভাবাধীন ছিলো। এ ধর্ম দুটোর ওপর রাষ্ট্র কর্তৃত্বশীল ছিলো, রাষ্ট্রের ওপর এ দুটোর কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না। তা ছাড়া এ দুটো ধর্মই ছিলো বিকৃত ও বিপর্যস্ত।

ইহুদী ধর্ম কখনো বা রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক নিগৃহিত হতো, আবার কখনো পারস্য সাম্রাজ্যের নির্যাতনের শিকার হতো। কোনো অবস্থাতেই এই ভূখন্ডের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর কিছুমাত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তার ছিলো না। বরঞ্চ বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত এটা কেবল মাত্র বনী ইসরাঈলের ধর্ম হিসেবেই টিকে ছিলো এবং অন্যান্য জাতিকে এর আওতায় আনার কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহই তার ছিলো না।

খৃষ্টধর্মের জন্ম হয়েছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অধীন। এই ধর্মের আবির্ভাবকালে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর ও যেসব অঞ্চলে গোপনে এ ধর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিলো, সেসব অঞ্চলের ওপর রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিরাজ করছিলো। এ সময় রোমান সাম্রাজ্য সদ্য আবির্ভূত খৃষ্ট ধর্মের ওপর লোমহর্ষক অত্যাচার চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পরে যখন রোমান সাম্রাজ্যের অত্যাচারের যুগের অবসান ঘটলো এবং রোমান সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো। তখন তার সাথে সাথে রোমকদের পৌত্তলিক ধ্যান ধারণাও তাতে ঢুকে পড়লো এবং গ্রীক পৌত্তলিক দর্শনেরও অনুপ্রবেশ ঘটলো। এভাবে খৃষ্টধর্ম একটা অভিনব জগাখিচুড়ির রূপ ধারণ করলো এবং আসল ওহীভিত্তিক খৃষ্টধর্মরূপে আর নিজেকে বহাল রাখতে পারলো না। তা ছাড়া রোমান সাম্রাজ্য প্রকৃতিগতভাবেও ধর্ম দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত ছিলো না এবং ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস তার ওপর কর্তৃত্বশীল ছিলো না। বরং রাষ্ট্রযন্ত্রই তার ওপর কর্তৃত্বশীল ছিলো। উপরন্তু খৃষ্টধর্মে উপদলীয় কোন্দল এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো যে, তা গীর্জাকে ছিন্ন ভিন্ন ও গোটা সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দেয়ার উপক্রম করেছিলো। খৃষ্টবাদের রাষ্ট্রীয় সংস্করণের বিরোধীদের ওপর কঠোরতম পাশবিক নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। আর রাষ্ট্রীয় বা অরাষ্ট্রীয় উভয় সংস্করণই ছিলো আসল খৃষ্টীয় তত্ত্বের বিকৃতরূপ।

ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ইসলামের শুভাগমন ঘটলো। তৎকালীন বিশ্বের প্রতিটা জনঅধ্যুষিত অঞ্চলে মানবজাতি যে চরম বিশৃংখলা, অরাজকতা, বিকৃতি, বিভ্রান্তি, নির্যাতন ও অন্ধ জাহেলিয়াতের শিকার হয়েছিলো, তা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যেই তার আবির্ভাব ঘটেছিলো। ইসলাম এসেছিলো মানব জীবনের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ তায়ালার আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে নিয়ে যেতে। মানব জীবনে এই সর্বব্যাপী পরিবর্তন বাস্তবায়িত করার জন্যে সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর ইসলামের কর্তৃত্বশীল

ভূমিকা ছিলো অপরিহার্য। আর এ জন্যে তাকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিলো এমন একটা স্বাধীন ভূখন্ড থেকে, যার ওপর সেই চারটে সাম্রাজ্যের কোনোটারই কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো না। তাকে এমন এক স্বাধীন জীবন শুরু করতে হয়েছিলো, যার ওপর কোনো বহির্শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে; বরং সে নিজেই নিজের ওপর ও পার্শবর্তী অন্য সকলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। বস্তুত আরব উপদ্বীপ, বিশেষত মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোই ছিলো তৎকালে ইসলামের অভ্যুদয়ের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান এবং তার সেই বিশ্ব অভিযান শুরু করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সূচনা বিন্দু, যার জন্যে প্রথম দিন থেকেই তার আবির্ভাব ঘটেছিলো।

সেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে এমন কোনো সুসংগঠিত সরকার ছিলো না, যা আইন-কানুন, আইন সভা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়, যা নিজের সুসংগঠিত ক্ষমতা দিয়ে নতুন আকীদা বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের পথ রোধ করতে পারে এবং যার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে জনগণ বাধ্য থাকে-যেমনটি এই চার সাম্রাজ্যে ছিলো।

সেখানে কোনো স্থীতিশীল সুরক্ষিত ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ধর্মেরও অস্তিত্ব ছিলো না। জাহেলী পৌত্তলিকতা তখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং তার আকীদা বিশ্বাস ও পূজা উপাসনাও হয়ে গিয়েছিলো শতধা ছিন্ন। আরবরা ফেরেশতা, জ্বিন, নক্ষত্র ও দেব-দেবীর পূজারীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। যদিও কাবা ও কোরায়শের একটা যৌথ ধর্মীয় আধিপত্য সমগ্র আরবে বিস্তৃত ছিলো, কিন্তু সেটা এতোটা মযবুত কোনো শাসন ব্যবস্থা ছিলো না, যা নতুন ধর্মের পথে যথার্থ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। কোরায়শ সরদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বিশেষ বিশেষ কায়েমী স্বার্থ যদি না থাকতো, তাহলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এতটা মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াতো না। কেননা তাদের ধর্মে যে বিশৃংখলা ও বিভেদ বিরাজ করছিলো, সেটা তারা উপলব্ধি করছিলো।

ধর্মীয় বিশৃংখলার সাথে আরবের রাজনৈতিক অরাজকতা যুক্ত হয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, যা একটা নতুন ধর্মের সম্পূর্ণ নতুন স্বভাব প্রকৃতি নিয়ে ও সম্পূর্ণ বাধাবন্ধন মুক্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করার সবচেয়ে উপযোগী ছিলো।

এই বিশৃংখলার পাশাপাশি আরবের সামাজিক অবস্থাও একটা নতুন ধর্মের অভ্যুদয়ের অনুকূল ছিলো। সেখানে গোত্রীয় শাসনের প্রাধান্য ছিলো এবং এই শাসনে গোত্রের ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে মুখ্য। মোহাম্মদ (স.) যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন, তখন বনু হাশেমের তরবারী তার রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং গোত্রীয় ভারসাম্য তার পথকে করেছিলো অপেক্ষাকৃত বাধামুক্ত। কেননা বনু হাশেম মোহাম্মদ (স.)-এর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ না করেও তাকে যেভাবে সংরক্ষণ ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো, তাতে অন্যান্য গোত্র বনু হাশেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ভয় পাচ্ছিলো। এমনকি দাওয়াতের সূচনালগ্নে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তাদের ওপরও ভিন্ন গোত্রের লোকেরা কোনো আক্রমণ চালানোর সাহস পেতো না এবং তাদেরকে দমন ও পীড়ন করার কাজ সেই গোত্রের জন্যেই রেখে দিতো। যে সমস্ত দাসদাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো। তাদের ওপর তাদের মনিবরাই নির্যাতন চালিয়েছিলো। এ জন্যে হযরত আবু বকর এসব দাস-দাসীকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতেন। এতে তাদের ওপর অত্যাচার করা এবং তাদেরকে সাবেক ধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। এতে নতুন ধর্মের প্রসারে যে সুবিধার সৃষ্টি হতো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়া আরবদের কিছু ঐতিহ্যবাহী মানবিক গুণাবলী যথা বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি নতুন আদর্শ গ্রহণ ও তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করার প্রেরণা সৃষ্টির সহায়ক ছিলো।

তৎকালে আরব উপদ্বীপে একটা নতুন অভ্যুত্থানের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো এবং দেশটা এ জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো। সকলের অজান্তে এ ধরনের একটা অভ্যুত্থানের উপযোগী যোগ্যতা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বও তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। জাতি এর জন্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলো রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য সফরের মধ্য দিয়ে। এ সব সফরের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলো শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সফর, যার উল্লেখ কোরআনে সূরা কোরায়শে রয়েছে। ক্রমে এ সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই বিরাট অভ্যুত্থানকে সফল করার জন্যে, যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীপকে মনোনীত করেছিলেন। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো, তখন সে এসব সঞ্চিত উপাদানকে ও শক্তিকে কাজে লাগালো। শেষ পর্যন্ত কাংখিত সেই অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো এবং আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করলেন। রসূল (স.)-এর জীবনে সাহাবাদের যে প্রথম প্রজন্মটার সাক্ষাত পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, হামযা, আব্বাস, আবু ওবায়দা, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, খালেদ ইবনে ওলীদ, সাদ ইবনে মায়ায ও আবু আইয়ুব আনসারী প্রমুখ (রাদিয়াল্লাহ আনহুম) যারা ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাকে বিজয়ী করার জন্যে জান ও মালের ত্যাগ ও কোরবানীর মাধ্যমে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এরাই ছিলেন পরিপূর্ণ বিজয়াভিযানের প্রধান উপাদান।

এখানে এর চেয়ে বেশী বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ নেই যে, ইসলামের সফল অভ্যুত্থান ঘটানো এবং তার সর্বাত্মক বিজয় ছিনিয়ে আনার উপযুক্ত আর কি কি উপাদান আরব উপদ্বীপে বিদ্যমান ছিলো, যা দ্বারা বুঝা যায় সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যে আগত এই মহান মতাদর্শের লীলাভূমি হিসাবে এই দেশটাকে বেছে নেয়া যুক্তিসংগত ছিলো এবং বিশেষভাবে এই কাবা শরীফকে নতুন রেসালাতের অভ্যুদয় ক্ষেত্র হিসাবে মনোনয়ন করা মানানসই হয়েছিলো।

এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমাদের পক্ষে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, আরব উপদ্বীপকে ইসলামকে অভ্যুদয়ের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়ার মূলে মহান আল্লাহর সেই প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা সক্রিয় রয়েছে, যা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। মানবীয় অভিজ্ঞতা ও জীবন রহস্যের উপলব্ধি যখন ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর হতে থাকে, তখন গভীরতর চিন্তা-গবেষণা চালালে এই প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার কিছু কিছু দিক উদঘাটিত হয়ে থাকে।

এ ভাবেই কোরআন প্রাথমিকভাবে মক্কা শরীফ ও তার আশপাশের জনপদকে সতর্ক করার জন্যে এসেছে। এরপর আরব উপদ্বীপ যখন জাহেলিয়াতকে বর্জন করে ইসলামে প্রবেশ করলো। এবং পুরোপুরিভাবে ইসলামের জন্যে উৎসর্গিত হলো, তখন সে ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে পাশ্চাত্যে ও প্রতীচ্যে সফরে বেরিয়ে পড়লো এবং নতুন রেসালাত ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানবীয় ব্যবস্থাকে বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করলো। যারা এটা বহন করে নিলো, তারা ছিলো একে বহন করার সর্বোত্তম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান থেকেই তারা বেরিয়ে এসেছিলো।

এটা নিছক কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিলো না যে, রসূল (স.)-এর আবির্ভাব ঘটতেই আরব উপদ্বীপ ইসলামের আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে গেলো। বরং মহান আল্লাহ নিজ জ্ঞানের আলোকে এই উপদ্বীপকে ইসলামের জন্যে মনোনীত করেন এবং একইভাবে এর জন্যে সেই ভাষাকেও মনোনীত করেন, যা সারাবিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে সবচেয়ে বেশী উপযোগী। বস্তুত এই সময়ে আরবী ভাষা সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও পরিপক্কতা লাভ করে এবং এই মহান দ্বীনকে সারাবিশ্বে পৌঁছানোর যোগ্য হয়। এটা যদি কোনো মৃত ভাষা হতো অথবা দুর্বল ভাষা হতো, তাহলে প্রথমত তা ইসলামের দাওয়াত বহনের যোগ্য হতো না এবং দ্বিতীয়ত তা বিশেষভাবে

আরব জগতের বাইরে এই বাণীকে পৌঁছাতে পারতো না। বস্তুত এ বাণীকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এর পরিবেশ ও এর ব্যক্তিবর্গ যেমন উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিলো, তেমনি এর ভাষাও প্রমাণিত হয়েছে সর্বাধিক উপযোগী।

এভাবে ইসলামের অনুকূল উপকরণ ও উপাদানের একটা বিরাট বহর প্রত্যেক গবেষকের চোখে পড়বে, যখনই সে এ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ কোথায় তার রেসালাতকে পাঠাবেন, তা তিনিই ভালো জানেন।' (সূরা আল আনয়াম)

'যেন তুমি উম্মুল কোরা ও তার আশপাশের জনপদবাসীকে সাবধান করতে পারো এবং সন্দেহ-সংশয়হীন সমাবেশ দিবস সম্পর্কে সাবধান করতে পারো। একটা দল জান্নাতে এবং একটা দল জাহান্নামে।'

কোরআনে যে বিষয়টাকে ঘিরে সবচেয়ে কঠোর এবং সবচেয়ে ঘন ঘন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। একে 'সমাবেশের দিন' বলা হয়েছে এ জন্যে যে, এ দিন সকল যুগের মৃত মানুষকে একসাথে সমবেত করা হবে।

'একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে' অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কৃতকর্মের ফল হিসাবে।

'আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে সবাইকে একই জাতিতে পরিণত করতেন। তবে তিনি যাদেরকে ইচ্ছে করেন, তার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালেমদের কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।'

অর্থাৎ আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, মানুষকে নতুন করে এমনভাবে সৃষ্টি করতেন যে, তাদের আচরণ একইরকম হয়ে যেতো এবং একইরকম ফলাফলও তারা ভোগ করতো। হয় জান্নাতে, নচেত জাহান্নামে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটা বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে পাঠিয়েছেন। তাকে পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী খেলাফতের দায়িত্ব পালনের দাবী হলো, মানুষের ভেতরে বিশেষ ধরনের যোগ্যতার সৃষ্টি হবে, যা তাকে ফেরেশতা ও শয়তান থেকে এবং অনুরূপ একমুখী স্বভাব প্রকৃতি বিশিষ্ট সৃষ্টি থেকে পৃথক করবে। এই সমস্ত যোগ্যতা দ্বারা একটা দল হেদায়াত ও সৎ কাজের দিকে ধাবিত হবে এবং অপর একটা দল গোমরাহী ও অসৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবে। প্রত্যেকটা দল মানবীয় চরিত্র গঠনে যে কোনো একটা সম্ভাব্য পথ ধরে এগিয়ে যাবে এবং এক সময় এই যাত্রার নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এই গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর 'এভাবেই তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের ভেতরে প্রবেশ করান, আর অত্যাচারীদের কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।' যে দলের যে অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন, সেই অনুসারেই তার হেদায়াত লাভ দ্বারা অনুগ্রহ প্রাপ্তি অথবা গোমরাহী দ্বারা আযাব প্রাপ্তি নির্ধারিত হয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে। তাই এখানে তাদেরকে অত্যাচারী আখ্যায়িত করে বলা হচ্ছে যে, তাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। ....সুতরাং যাদেরকে তারা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে, তাদের প্রকৃতপক্ষে কোনো অস্তিত্ব ও বাস্তবতা থাকবে না।

অতপর পুনরায় নেতিবাচক প্রশ্ন করা হচ্ছে,

'তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে?'

এভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে এ জন্যে, যেন এর পরই বলা যায়, মহান আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক। তিনিই অভিভাবক হবার ক্ষমতা রাখেন এবং সেই ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার মৃতকে জীবন দানের মধ্য দিয়ে। বস্তুত এ কাজটার মধ্য দিয়েই এই অতুলনীয় ক্ষমতা সর্বোত্তমভাবে প্রমাণিত হয়।

'আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন।' এরপর মহান আল্লাহর ক্ষমতা যে অফুরন্ত এবং সর্বক্ষেত্রেই তা কার্যকর, সে কথা বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে,

'তিনি সকল বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'

মতভেদ নিরসনের সঠিক উপায়

এরপর পুনরায় সেই প্রথম বিষয় অর্থাৎ ওহী ও রেসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে যে কোনো বিরোধ নিরসনের জন্যে লোকেরা এই কোরআনের শরণাপন্ন হয়। কেননা এই ওহী আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং এতে আল্লাহর ফয়সালা বর্ণিত হয়ে থাকে, যাতে মানব জীবনের পর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর প্রভাব না পড়ে এবং আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধানের ওপর মানুষ অবিচল থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদে লিপ্ত হও, তার নিষ্পত্তি আল্লাহর কাছে...........।' (আয়াত ১০, ১১ ও ১২)

এই তিনটে আয়াতে যেরূপ ধারাবাহিকভাবে এই বক্তব্যগুলো দেয়া হয়েছে, তা খুবই আশ্চর্যজনক ও চিন্তার উদ্রেককারী। এর এক একটা অংশের সাথে অপর অংশের গোপন ও প্রকাশ্য সংযোগ খুবই সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ।

প্রথমে বলা হয়েছে যে, মানুষে মানুষে যে কোনো মতবিরোধ দেখা দিক, তার নিষ্পত্তির জন্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনে তার চূড়ান্ত ও অকাট্য ফয়সালা নাযিল করেছেন, চাই তা দুনিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে হোক কিংবা আখেরাত সংক্রান্ত ব্যাপারে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও চারিত্রিক বিধান দিয়েছেন, তা কার্যকরী করেছেন এবং তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই কোরআনকে মানব জীবনের জন্যে এমন পূর্ণাংগ সংবিধান হিসাবে দিয়েছেন, যা রাষ্ট্রীয় সংবিধানগুলোর চেয়ে প্রশস্ত ও বিস্তারিত। সুতরাং যখনই কোনো বিরোধ দেখা দেবে, তখন সে ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা এতে পাওয়া যাবে। রসূল (স.)-এর কাছে ওহী যোগে প্রেরিত আল্লাহর এ ফয়সালার ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে।

এ কথা বলার পর রসূল (স.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে তিনি তার যাবতীয় সমস্যা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেন এবং তার প্রতিপালকের প্রতি নিজের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন।

'তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, তার ওপর আমি নির্ভরশীল ও অনুগত।

এখানে আনুগত্য ও নির্ভরশীলতার ঘোষণা দেয়া হলো রসূল (স.)-এর মুখ দিয়ে এবং তা তার উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে। প্রথমোক্ত নীতিগত ঘোষণার উপসংহার হিসাবে এ বক্তব্য দেয়া হলো। মহান আল্লাহর রসূল স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁর প্রভু, তার ওপর তিনি নির্ভর করেন এবং একমাত্র তার কাছেই তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুতরাং মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের শরণাপন্ন হওয়া ও অন্যের ফয়সালা গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কিভাবে বৈধ হতে পারে- যখন হেদায়াতপ্রাপ্ত নবী তিনি ছাড়া আর কারো শরণাপন্ন হন না? আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালার শরণাপন্ন হওয়াই তো সর্বোত্তম ব্যবস্থা। অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করা উচিত নয়। রসূল নিজেই যখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ওপর

নির্ভর করেন এবং তাঁরই আনুগত্য প্রকাশ করেন, তখন তাঁর উম্মতের পক্ষে কিভাবে অন্য কারো শরণাপন্ন হওয়া বৈধ্য হতে পারে? আল্লাহ তায়ালাই তো তাদের প্রতিপালক, অভিভাবক ও পথনির্দেশক।

মোমেনের অন্তরে উক্ত সত্য বদ্ধমূল হয়ে গেলে তার দ্বীনের প্রতি ও জীবন বিধানের প্রতি তার আস্থা, শ্রদ্ধা ও সচেতনতা বেড়ে যাবে। ফলে সে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধি-ব্যবস্থার কাছ থেকে নিজের কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাবে না এবং সে আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া আর কোনো ফয়সালাকে ভ্রুক্ষেপের যোগ্যই মনে করবে না। কেননা নবী স্বয়ং আল্লাহর ফয়সালার অনুগত থেকেছেন।

এই সত্যটা যাতে অন্তরে আরো স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয় সে জন্যে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহর ার্আরো গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। 'তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা...... । (আয়াত ১১)

অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, পরিচালক নিয়ামক ও শাসক, সেই আল্লাহই কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে তা মানব জাতির সকল বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেয়। যে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করে, তারই ফয়সালা মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে। মানব জীবনের সমস্যাবলী আকাশ ও পৃথিবীর সার্বিক সমস্যাবলীরই অংশবিশেষ মাত্র। সুতরাং তাঁর ফয়সালাই মানব জীবনের সাথে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক জীবনের সমন্বয় সাধন করে এবং মানুষকে গোটা প্রকৃতির সাথে শান্তিতে বসবাস করার পথ দেখায়। কেননা এই মহাবিশ্বকে শাসন করার ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে আর কোনো শরীক নেই।

জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে যে আল্লাহর ফয়সালার শরণাপন্ন হওয়া প্রত্যেক বান্দার জন্যে জরুরী। তিনিই তোমাদের স্রষ্টা এবং তিনিই তোমাদের জন্যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের জীবনকে সুশৃংখল করেছেন এবং জীবনের জন্যে কিসের প্রয়োজন তা তিনিই ভালোভাবে জানেন। তিনি তোমাদের জীবন সৃষ্টির সেই শাশ্বত বিধান অনুসারে পরিচালিত করেছেন যা তিনি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে কার্যকর করেছেন।

'এবং পশুদের মধ্য থেকেও জোড়া সৃষ্টি করেছেন।'

অর্থাৎ গোটা সৃষ্টি জগতেই একটা মৌলিক ঐক্য বিরাজ করছে এবং এ দ্বারা প্রকৃতির মূল পদ্ধতি, আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ঐক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই তোমাদের এবং পশুদের সৃষ্টি করেছেন এবং এই প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুসারেই তোমাদের বংশবৃদ্ধি ঘটছে। অপরদিকে তিনি নিজে গোটা সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক ও অতুলনীয়। বিশ্বজগতের কোনো জিনিসেই তাঁর সাদৃশ্য নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি স্বতস্ফূর্তভাবে এই সত্যে বিশ্বাস করে। যিনি স্রষ্টা, তার সাথে তার সৃষ্টি করা কোনো জিনিসের তুলনা হতে পারে না। তাই তারা সবাই যে কোনো মতবিরোধের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ফয়সালার শরণাপন্ন হয়, অন্য কারো দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। কেননা অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় যে, মতভেদের সময় তার শরণাপন্ন হলেও কাজ হতে পারে।

আবার যদিও তাঁর সমকক্ষ কোনো জিনিস নেই এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার কোনোই মিল বা সাদৃশ্য নেই, তথাপি তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এই শ্রবণ ও দৃষ্টির গুণেই তিনি সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং ফায়সালা করেন।

তিনি তাঁর বান্দাদের সকল বিরোধের যে নিষ্পতি দেন, সেটাই একমাত্র চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। কেননা আকাশ ও পথিবীর প্রথম সৃষ্টির পর থেকেই উভয়ের সমস্ত চাবিকাঠি তথা সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে এবং সব কিছুর পরিচালনাকারী বিধি-বিধান তিনিই রচনা করেছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত চাবিকাঠি তাঁরই হাতে।' আর যেহেতু মানব জাতি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তাঁরই একটা অংশ, তাই তাদেরও চাবিকাঠি অর্থাৎ সমস্যার সমাধান আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।

তাছাড়া তিনিই তাদের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তিনিই জীবিকা সংকীর্ণ বা প্রশস্ত করেন। তিনিই তাদের জীবিকাদাতা, তাদের ভরণ পোষণকারী ও তাদের পানাহারের ব্যবস্থাকারী। তাহলে তাদের বিরোধের নিষ্পত্তিতে তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কার শরণাপন্ন হবে? একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হতে পারে যিনি তাদের জীবিকা ও পানাহারের ব্যবস্থাকারী। যিনি নিজের জ্ঞান ও পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। 'তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।' এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী, তিনিই ফয়সালা করেন, নিষ্পত্তি করেন এবং তাঁর ফয়সালাই ন্যায়সংগত ও চূড়ান্ত হয়ে থাকে।

এভাবে এ আয়াতগুলোর বক্তব্যে এমন চমকপ্রদ ও পরিপূর্ণ সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় যাতে তা মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় ও মন-মগজ দখলকারী হয় এবং এক গভীর ও সাবলীল সূর ধ্বনিত হয়।

দলে দলে বিভক্ত হওয়ার পরিণতি

এরপর পুনরায় ১৩ থেকে ১৬ নং আয়াত জুড়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত আলোচনার। সেই দ্বীনকে 'তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে .... ।' (১৩-১৬)

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, 'এভাবেই আল্লাহ তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী করেন ....' এ বক্তব্যে সংক্ষেপে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, সকল ওহীর উৎস এক এবং সকল ঐশী বিধান মৌলিকভাবে অভিন্ন। এখানে ১৩-১৬ নং আয়াতে উক্ত ইংগিতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সামগ্রিকভাবে অবিকল হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দেয়া নির্দেশেরই অনুরূপ। এই নির্দেশ হলো, তারা যেন আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এ ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত না হয়। আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধানের ওপর যেন তারা অবিচল থাকে, মতবিরোধে লিপ্তদের খেয়াল খুশীর দিকে যেন ভ্রুক্ষেপ না করে। ইসলামের প্রাধান্য যেন বজায় রাখে, আল্লাহর সম্পর্কে বিতর্ককারীদের যুক্তি যেন খন্ডন করে এবং তাদেরকে কঠিন গযব ও আযাব সম্পর্কে যেন সতর্ক করে দেয়। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে এ তিনটে আয়াতের বক্তব্যে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে,

'তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেই দ্বীনকে, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন নূহকে ... তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তার কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না ....।' (আয়াত ১৩)

আয়াতের এ অংশটুকু দ্বারা সূরার প্রথমে দেয়া বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইসলামের মূল উৎস এক ও অভিন্ন এবং আবহমান কাল ধরে সেই একই দ্বীন চালু

রয়েছে। এই সাথে মোমেনের অনুভূতিতে একটা চমকপ্রদ শিহরণ বুলানো হয়েছে। সে যখন দূর থেকে তার পূর্ববর্তীদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তখন তাকে দেখানো হয়েছে যে, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.) একের পর এক দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে বুঝানো হয় যে, সে এই সব মহান ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরী, এ পথে চলতে তার যতো কষ্ট হোক এবং যতো ত্যাগ স্বীকার করুক, অচিরেই সে আনন্দ বোধ করবে এবং পরিণামে শান্তি লাভ করবে। সে ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে চলে আসা দ্বীনের এই মহান নেতৃবর্গের পদাংক অনুসারী।

এ আয়াতাংশে এই ধারণাও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর এই এক ও অভিন্ন দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে গভীর শান্তি ও সৌহার্দ বিরাজ করে, তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে না, পরস্পরের মধ্যে অটুট আত্মীয়তার অনুভূতি বিরাজ করে, এই অনুভূতি তাদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার আহ্বান জানায়। অতীতের সাথে বর্তমানের সেতুবন্ধন রচনা করে এবং ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীনের পথে চলার প্রেরণা যোগায়।

হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে নির্ধারিত দ্বীন যখন অবিকল হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার দ্বীন, তখন মূসা ও ঈসার (আ.) অনুসারীরা কিসের জন্যে লড়াই করে? কিসের জন্যে হযরত ঈসার অনুসারীরা উপদলীয় কোন্দলে রক্ত ঝরায়? কি কারণেই বা মূসা ও ঈসার অনুসারীরা মোহাম্মদ (স.)-এর অনুসারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়! কেনই বা হযরত ইবরাহীমের অনুসারী হবার দাবীদার মোশরেকরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করে। কেন এরা সবাই সেই একই পতাকার তলে সমবেত হয় না, যা তাদের শেষ রসূল তুলে ধরেন? সকলের জন্যে একমাত্র নির্দেশ হলো, 'দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এ ব্যাপারে বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।' সুতরাং সবার উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা, এর দায়িত্ব বহন করা। এ কাজ থেকে পিছু না হটা বাঁকা পথে না চলা এবং এর পতাকাতলে এককাতারে শামিল হয়ে অবস্থান করা। এই পতাকা একই পতাকা, যাকে একের পর এক হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা বহন করেছেন এবং সর্বশেষে বহন করেছেন হযরত মোহাম্মদ (স.)।

কিন্তু উম্মুল কোরা অর্থাৎ মক্কা ও তার আশপাশের মোশরেকরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের অনুসারী দাবী করেও এই প্রাচীন দ্বীনের দাওয়াত সম্পর্কে ভিন্নমত তথা বৈরী মত পোষণ করতো।

'মোশরেকদের কাছে তোমরা যে আহ্বান জানাও তা তাদের কাছে খুবই দুর্বিষহ বলে মনে হয়।'

অর্থাৎ তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদের (স.) ওপর ওহী নাযিল হওয়াটা তাদের কাছে অসহনীয়। কেননা তারা মনে করতো যে, মক্কা ও তায়েফের যে কোনো নামকরা ব্যক্তির ওপর ওহী নাযিল হবে। মোহাম্মদ (স.)-কে তারা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে মানতো এবং তিনি কোরায়শ বংশের মধ্যম স্তরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ছিলেন। তবুও তাদের দৃষ্টিতে তিনি একটা গোত্রের ক্ষমতাধর সরদার হওয়ারও যোগ্য বিবেচিত হলেন না।

তাদের যাবতীয় ক্ষমতা ও প্রতাপের ভিত্তি ছিলো পৌত্তলিকতা। এই পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিক কৃষ্টির অবসানের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের পতন ঘটুক তা সহ্য করতে তারা কিছুই প্রস্তুত ছিলো না। তাদের পৌত্তলিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। তাই তারা পৌত্তলিকতাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো এবং রসূল (স.) কর্তৃক প্রদত্ত খালেস তাওহীদের ডাক তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো।

তাদের মৃত পৌত্তলিক পূর্বপুরুষরা বিপথগামিতা ও জাহেলিয়াতের ওপর মারা গেছে-এ কথা বললে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো। তাই এটা তারা বরদাশত করতে পারতো না। এ জন্যে তাদেরকে কেউ বিপথগামী বলে নিন্দা করলে তার জন্যে তারা লড়াই করে মরে জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত থাকতো।

কোরআন তাদের এই মানসিকতা নিয়ে মন্তব্য করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা কাকে নবীরূপে বরণ করবেন, সেটা তিনিই স্থির করেন এবং তিনি তাকেই হেদায়াত করেন যে তার অনুগত হয় ও তওবা করে।

আল্লাহ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা করেন বরণ করে নেন এবং যে তার প্রতি অনুগত হয়, তাকে সুপথে চালিত করেন। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনিই তার অনুগত বান্দার জন্যে পথ সুগম করেন। এরপর রসূলদের অনুসারীদের সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা হয়েছে। রসূলদের একই দ্বীন নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের অনুসারীরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছিলো।

'তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই বিভক্ত হলো .... ।' (আয়াত ১৪)

অর্থাৎ তারা যে দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, সেটা অজ্ঞতার কারণে নয়। তারা এ জন্যে বিভক্ত হয়নি যে, তাদের ধর্মের উৎসের অভিজ্ঞতার কথা তারা জানতো না। সবকিছু জেনেই তারা কোন্দলে লিপ্ত হয়েছিলো। পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, যুলুম ও বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করার কারণেই তারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। নিছক প্রবৃত্তির লালসা ও স্বার্থপরতার কারণেই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়েছে। সঠিক নির্ভুল ও মূল আকীদা ও আদর্শে তাদের বিভেদের পক্ষে কোনো সমর্থন ছিলো না। সেই আদর্শের প্রতি যদি তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকতো তাহলে তারা বিভেদে লিপ্ত হতো না।

এ সব অপকর্ম দ্বারা তারা নিজেদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর আযাবের শিকার হওয়ার যোগ্য বানিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মহৎ ও প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্যে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেবেন বলে পূর্বাহ্নে সিদ্ধান্ত নেয়ার তাৎক্ষণিকভাবে আযাব নাযিল করেননি।

'আল্লাহ যদি পূর্বাহ্নে একটা সিদ্ধান্ত না নিতেন, তাহলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেতো।'

অর্থাৎ এই দুনিয়াতেই কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যে, তার ফয়সালা করে দেয়া হতো। কিন্তু তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে।

কিন্তু নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেরাও বিভেদের শিকার হয়েছে এবং অন্যদেরকেও বিভেদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের পরবর্তী যে বংশধর কেতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কেতাবকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে নয় বরং সন্দেহ সংশয়সহ গ্রহণ করেছে। কেননা পূর্ববর্তী মতভেদগুলো তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ সংশয় ও রকমারি দল উপদল সম্পর্কে অস্থিরতা উস্কে দিয়েছিলো।

'যারা তাদের পরে কেতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো, তারা সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত।'

আকীদা বিশ্বাস নিয়ে এ ধরনের ভূমিকা শোভা পায় না। মোমেনের আকীদা বিশ্বাস হতে হয় পাথরের মতো অটুট। তার চারপাশের সমগ্র পৃথিবী টলতে থাকবে, কিন্তু সে থাকবে অটল, তার

পা থাকবে সেই পাথরের ওপর অবিচল। আকীদা হচ্ছে আকাশের সেই স্থির নক্ষত্র, যার দিকে একজন মোমেন সমস্ত বাধাবিপত্তি ও ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যায় এবং বিপথগামী হয় না। কিন্তু আকীদা বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ সন্দেহ সংশয় ও অস্থিরতায় ভোগে, তবে সে আর কোনো কিছুতেই স্থিরতা ও নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে না।

আকীদা বিশ্বাসের আগমন ঘটেছিলোই এ জন্যে যে, বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেবে এবং অস্থিরতা ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু মুসলমানরা যখন নিজেদের আকীদা নিয়ে সন্দেহ সংশয়ে পতিত হলো, তখন তারা আর বিশ্বে নেতৃত্বের যোগ্য থাকলো না, বরং নিজেরাই উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলো।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের অবস্থা এ রকমই ছিলো।

ভারতের বিশিষ্ট আলেম আবুল হাসান নদভী তাঁর 'মাযা খাসেরাল আলামু বেএনহেতোতিল মুসলেমীন' (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) নামক পুস্তকে বলেন,

'প্রধান প্রধান ধর্মগুলো ভন্ড, মোনাফেক, বিকৃতকারী ও অবজ্ঞাকারীদের ছিনিমিনি খেলার শিকার হয়ে নিজ নিজ আসল রূপ ও প্রাণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে এই ধর্মগুলো এতটা বিকৃত হয়ে গেছে যে, এর সাবেক একনিষ্ঠ অনুসারীরা যদি আজ পুনরুজ্জীবিত হয়, তবে এগুলোকে চিনতেই পারবে না। যেসব দেশে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সুশাসন ও রাজনীতির সুষ্ঠু চর্চা হতো, তা আজ নৈরাজ্য, অধোপতন, বিভেদ, কু-শাসন, প্রশাসনিক নিষ্ঠুরতা, যুলুম ও স্বার্থপরতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে এখন আর বিশ্ববাসীর জন্যে কোনো আবেদন নেই। জাতিগুলোর জন্যে কোনো আহ্বান নেই। তারা তাদের সমস্ত প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাদের জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের নির্মল জ্ঞানের উৎসও নেই, স্থীতিশীল কোনো মানব কল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থাও নেই। (পৃঃ ২২)

প্রখ্যাত ইউরোপীয় লেখক জি. এইচ. ডেনিসন স্বীয় 'সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে আধ্যাত্মিকতা' নামক গ্রন্থে বলেন,

'পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্যজগত নৈরাজ্যের কবলে পড়ে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো। কেননা যেসব আকীদা বিশ্বাস সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতো, তা ধ্বসে পড়েছিলো। আর তার স্থলাভিষিক্ত হবার মতো কোনো বিকল্পেরও আবির্ভাব তখনো ঘটেনি। তখন মনে হচ্ছিলো যে, চার হাজার বছর ধরে যে বৃহত্তম সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিলো, তা ধ্বংস হতে চলেছে এবং মানব জাতি সাবেক বর্বরতা ও পাশবিকতায় ফিরে যাচ্ছে। কেননা গোত্রগুলো ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিলো এবং আইন ও শাসন বলতে কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। খৃষ্টবাদের উত্তরাধিকারী সরদারগুলো ঐক্য ও শৃংখলার পরিবর্তে ধ্বংস ও বিভেদের রসদ যোগাচ্ছিলো। সভ্যতা এমন একটা প্রকান্ড গাছের ন্যায় বহু ডালপালা ছড়িয়ে সারাবিশ্বের ওপর তার ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিলো, যার কান্ডটা ভেতর থেকে সম্পূর্ণরূপে পচে গিয়েছিলো এবং যে কোনো মুহূর্তে ধুলিসাৎ হবার অপেক্ষায় ছিলো।' ....এহেন সর্বব্যাপী ধ্বংস ও নৈরাজ্যের লক্ষণাদি দেখা দেয়ার মধ্য দিয়েই এই মহাপুরুষ জন্ম নিলেন, যিনি সারাবিশ্বকে একত্রিত করলেন।' অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

রসূলদের অনুসারীদের সজ্ঞানে কোন্দলে জড়িয়ে পড়া, কেতাবের উত্তরাধিকারীদের সংশয়ে লিপ্ত হওয়া। বিশ্ব নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থলটি একজন প্রাজ্ঞ, প্রত্যয়ী ও আল্লাহভক্ত নেতা থেকে শূন্য

থাকার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল করে পাঠালেন এবং তাকে দাওয়াত দিতে ও দাওয়াতের কাজে অবিচল থাকতে আদেশ দিলেন। তাকে সতর্ক করলেন যে, তার ও তার দাওয়াতের চারপাশে স্বার্থপরদের ধস্তাধস্তিতে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে তিনি যেন ইসলামের সেই শাশ্বত দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন, যা সকল নবীর জন্যে তিনি নির্ধারণ করেছিলেন।

'সুতরাং তুমি দাওয়াত দিতে থাকো ও অবিচল থাকো।' (আয়াত ১৫)

বস্তুত এ হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির একচ্ছত্র নেতৃত্ব, কৃতসংকল্প, অটল, অনড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্ব, যা সচেতনভাবে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান জানায় এবং বিন্দুমাত্রও দোদুল্যমানতা ও বিপথগামিতা ছাড়াই আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকে। এ নেতৃত্ব সব রকমের প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে দূরে থাকে। এ নেতৃত্ব একই কেতাব, একই রেসালাত ও একই বিধানের দিকে আহ্বান জানায় এবং ঈমানকে তার আসল একক ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এ নেতৃত্ব সমগ্র মানব জাতিকে তার আদি ও আসল সত্য মতাদর্শে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। 'বলো, আমি আল্লাহর নাযিল করা কেতাবের ওপর ঈমান এনেছি।' শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বে সত্য ও ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিজ্ঞাসহ আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভেও তিনি তৎপর থাকেন। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করি।' সুতরাং এ হচ্ছে সেই ক্ষমতাশালী ও পরাক্রমশালী নেতৃত্ব, যা পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে ইসলামী নেতৃত্ব মক্কার পর্বত উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলো ও তীব্র নিপীড়ণ ভোগ করছিলো। তা সত্তেও তার ন্যায়বিচারকামী আধিপত্য লাভের অভিলাষ সুস্পষ্ট। এ নেতৃত্ব মহান আল্লাহর একক প্রভুত্বের ঘোষণায় সোচ্চার।

' আল্লাহ আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু।'

সেই সাথে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্মফলের নীতি ঘোষণায় অকুতোভয়।

'আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ।'

সেই সাথে এও ঘোষণা করছে যে, চূড়ান্ত সত্যের ঘোষণা দিয়ে সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটানো হলো।

'আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই।'

অতপর সমস্ত বিষয়কে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে,

'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তার কাছেই প্রত্যাবর্তন।'

এই একটা মাত্র আয়াত শেষ নবীর নবুওতের প্রকৃত চরিত্র স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এই রেসালাত ও নবুওত তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অকুতোভয়ে ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাবে। মানুষের প্ররোচনায় সে থামবে না। সে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করবে এবং আল্লাহর পথে সবাইকে এককাতারে সমবেত করবে।

এভাবে বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবং মুসলিম জাতির আল্লাহর কাছে গৃহীত ও মনোনীত হবার পর আল্লাহর ব্যাপারে তর্ককারীদের প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষিত হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফূট হয়ে ওঠে, তাদের সমস্ত যুক্তিতর্ক বাতিল ও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তার আর কোনো মূল্য থাকে না। তাই সর্বশেষে এ আয়াতটা দ্বারা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয় এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিনতম হুমকি শুনিয়ে দেয়া হয়।

'আল্লাহর দাওয়াত গৃহীত হবার পর যারা আল্লাহকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যায় তাদের যুক্তি তাদের প্রতিপালকের কাছে ব্যর্থ এবং তাদের ওপর আল্লাহর গযব ও কঠিন আযাব অবধারিত।' (আয়াত ১৬)

বস্তুত যার যুক্তি প্রমাণ আল্লাহর কাছে কোরআনের বাতিল ও পরাস্ত হয়। তার আর কোনো যুক্তি শোনা হয় না এবং তার আর কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে না। আর দুনিয়ার পরাজয় ও ব্যর্থতার পর আখেরাতেও কঠিন আযাব ও গযব তার জন্যে অবধারিত থাকে। বাতিল নিয়ে জিদ, হঠকারিতা ও স্বার্থান্ধ বিতর্কের এটাই সমুচিত শাস্তি।

কেয়ামত ও জীবন জীবিকা সম্পর্কিত দর্শন

এরপর ১৭ থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত পুনরায় ওহী ও রেসালাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কেতাব নাযিল করেছেন যা সত্য ও ইনসাফের মানদন্ড। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী সম্প্রদায়ের মধ্যকার মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়াদির মীমাংসা করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরীয়তভিত্তিক বিধানকে সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের মানদন্ড রূপে মানবজাতির জন্যে প্রবর্তন করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে মতাদর্শের বিচার করা হবে, অধিকারের বিচার হবে এবং আচার আচরণ ও কাজ কর্মের বিচার হবে।

সত্য ও ইনসাফের এই মানদন্ডের প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনার পর এখন কেয়ামতের আলোচনা আসছে। সেই দুটো বিষয়ের মাঝে একটা মিল আছে বলেই দুটোর আলোচনা পর পর এসেছে। উভয়ের মধ্যকার মিলটা হলো, কেয়ামত হচ্ছে ন্যায়বিচার ও চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সময়। আর আল্লাহর কালাম হচ্ছে সত্য ও ন্যায়বিচারের মানদন্ড। তবে যেহেতু কেয়ামতের বিষয়টি একটি অজানা ও অদৃশ্য ব্যাপার। তাই এমনও হতে পারে যে, এটা সহসাই ঘটে যেতে পারে। তাই বলা হচ্ছে, 'তুমি কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত নিকটবর্তী।'

এই কেয়ামতের বিষয়টি নিয়ে মানুষ গাফেল ও উদাসীন। অথচ এটি খুবই নিকটবর্তী। এটি সংঘটিত হলেই সত্য ও ইনসাফের সাথে মানুষের চূড়ান্ত বিচার অনুষ্ঠিত হবে। এই বিচারের সময় কোনো কিছুই অবহেলা করা হবে না, কোনো কিছুই বাদ দেয়া হবে না।

এই কেয়ামতের ব্যাপারে মোমেন ও কাফেরদের দৃষ্টিভংগি কি সে সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে,

'যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে তড়িৎ কামনা করে……।(আয়াত ১৮)

অর্থাৎ যারা কেয়ামতে বিশ্বাসী নয়, তারা এর ভয়াবহতা অনুভব করতে পারে না এবং এই কেয়ামতের পর তাদের জন্যে কি ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে, সেটা তারা অনুমান করতে পারে না। তাই তারা এর কোনো তোয়াক্কা করছে না, বরং কামনা করছে যাতে তা অতিসত্বর সংঘটিত হয়। কারণ তারা অজ্ঞ এবং অনুভূতিহীন। কিন্তু যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারা কেয়ামতেও বিশ্বাসী। তাই তারা একে ভয় করে। কারণ এটা সংঘটিত হলে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা তাদের জানা আছে। কেয়ামত যে সংঘটিত হবে তা নির্ঘাত সত্য। মোমেনরাও এটাকে সত্য বলেই জানে। কারণ সত্যের মাঝে এবং তাদের মাঝে একটা বন্ধন আছে বলেই তারা সত্যকে সত্য হিসেবেই জানে। অপরদিকে যাদের মাঝে এই গুণ নেই তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'জেনে রাখো, যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।'

অর্থাৎ সেই জাতীয় লোকেরা বিপথগামিতার গভীরে বিচরণ করছে এবং সত্য থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে। তাই সেখান থেকে ফিরে আসা তাদের পক্ষে একটা কঠিন ব্যাপার।

পরকালের আলোচনার পর এখন জীবিকার ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু ....। (আয়াত ১৯)

পরকালের সাথে জীবিকার সম্পর্ক বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদূর পরাহত মনে হলেও নিচের আয়াতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে উভয়ের মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাবে। আয়াতে বলা হয়েছে,

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই.........। (আয়াত ২০)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা দান করেন। তিনি সৎ ও অসৎ এবং মোমেন ও কাফের সকলের আহার যোগান। মানুষ নিজের আহার নিজে যোগান দিতে অপারগ। যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে জীবন দান করেছেন, তাই আহার বা জীবিকার প্রাথমিক ব্যবস্থাও তিনিই করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি কাফের ও পাপী-তাপী বান্দাদের আহার বন্ধ করে দিতেন, তাহলে নিজেদের আহার যোগান দেয়া তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। ফলে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে এবং জীবন ধারণের প্রাথমিক উপায় উপকরণের অভাবে মারা যেতো। তখন আল্লাহর একটা বড় উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যেতো। আর সেটা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে মানুষকে জীবিত রেখে তাদেরকে কর্মের সুযোগ দেয়া এবং পরকালে এই কর্মের হিসাব নিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করা অথবা শাস্তি দেয়া। তাই তিনি জীবিকার ব্যাপারটি পাপ ও পুন্য এবং ঈমান ও কুফরের গন্ডির বাইরে রেখেছেন। বরং এটাকে সাধারণ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত উপায় উপকরণ এবং ব্যক্তির চেষ্টা তদবীরের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। সাথে এটাকে মানুষের জন্যে পরীক্ষার একটা বিষয় হিসেবেও চিহ্নিত করে রেখেছেন যার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরকালে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা ইহকাল ও পরকাল উভয়টিকে ফসলের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখন মানুষ স্বাধীনভাবে এর যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারে। যারা পরকালের ফসল কামনা করে তারা এর জন্যে কাজ করে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ফসলকে বাড়িয়ে দেবেন, তাদের নিয়ত অনুসারে তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের কাজে বরকত দান করবেন। পরকালের এই ফসলের সাথে সাথে ইহকালে তার জন্যে নির্ধারিত করে রাখা জীবিকাও তাকে দেয়া হবে। এই জীবিকা থেকে তাকে একটুও বঞ্চিত করা হবে না। বরং ইহকালে তাকে জীবিকাস্বরূপ যা কিছু দেয়া হবে সেটাই তার জন্যে পরকালের ফসল হিসাবেও গন্য হতে পারে যদি সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই সেই জীবিকার অন্বেষণে কাজ করে, ভোগ করে এবং তা থেকে দান করে। অপরদিকে যারা ইহকালের ফসলই কামনা করে তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা ভাগ্য অনুসারে দান করবেন। তাদের প্রাপ্য ভাগ থেকে তাদেরকে মোটেও বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু পরকালের ফসল থেকে তারা কিছুই পাবে না। কারণ, পরকালের ফসলের জন্যে তারা কোনো কাজই করেনি। তাই ফলাফলেরও কোনো আশা করা তাদের সাজে না।

ইহকালের ফসলের প্রত্যাশী আর পরকালের ফসলের প্রত্যাশীদের প্রতি লক্ষ্য করলে ইহকালের ফসলের প্রত্যাশীদের বোকামী ও মূর্খতা ধরা পড়বে। কারণ দুনিয়াতে তো আল্লাহ তায়ালা সবাইকে জীবিকা দান করবেন। যার ভাগ্যে যতোটুকু নির্ধারিত আছে ততোটুকু সে পাবেই। কিন্তু পরকালের ফসল কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটবে যারা এর প্রত্যাশী হবে এবং এর জন্যে যে কাজ করবে।

যারা ইহকালের ফসলের প্রত্যাশী, তাদের মাঝে ধনীও আছে, দরিদ্রও আছে। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান মূলত জাগতিক উপায় উপকরণ ও ব্যক্তির যোগ্যতার সাথে সাথে ভাগ্যের তারতম্যের কারণেও হয়ে থাকে। পরকালের প্রত্যাশীদের মাঝেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পৃথিবীর বুকে জীবিকার ক্ষেত্রে উভয় দলের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। উভয় দলের মাঝে আমল ব্যবধান দেখা যাবে পরকালে। তাই যে ব্যক্তি পরকালের ফসলকে ত্যাগ করে তার চেয়ে নির্বোধ আর কে হতে পারে? কারণ এই ত্যাগের ফলে তার পার্থিব জীবনে কোনোই পরিবর্তন আসবে না।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সত্য ও ন্যায়ের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে সত্য ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে কেতাব অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সকল প্রাণীর জন্যে জীবিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। এই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পরকালের ফসলের প্রত্যাশীদের ক্ষেত্রেও ইহকালের ফসলের প্রত্যাশীদের আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে অধিক হারে দান করেন, আর ইহকালের প্রত্যাশীদেরকে পরকালের উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন।

আইন প্রণয়নে আল্লাহর সাথে শেরেক করা

এরপর প্রসংগ চলে যাচ্ছে আদি সত্যের দিকে। বলা হচ্ছে,

'তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্যে এমন জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে ....। (আয়াত ২১-২৩)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মার জন্যে যে বিধান আল্লাহ তায়ালা প্রবর্তন করেছেন তা হচ্ছে সেই বিধান যা মেনে চলার জন্যে নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা (আ.) প্রমুখ নবী রসূলরা নিজ নিজ জাতি ও সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। আর একই বিধান সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-কেও দান করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতে নিন্দার সুরে প্রশ্ন করা হচ্ছে, যদি এই বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন না করে থাকেন, তাহলে কে করলো? আল্লাহর কোনো শরীক দেবতা এ কাজ করেছে কি?

আসলে সৃষ্টিজগতে এমন কেউ নেই যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রবর্তিত বিধানের বিরোধী কোনো বিধান প্রবর্তন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে যে কেউ হোক না কেন। কারণ, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের জন্যে বিধান রচনা করার অধিকার রাখেন। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই গোটা জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে এর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, আর যেহেতু মানবজীবন জগত নামক এই বিশাল চাকারই একটা ক্ষুদ্র অংশ, কাজেই এই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এমন বিধানের প্রয়োজন যা হবে সেই বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ জাতীয় বিধান রচনা করা কেবল এমন সত্ত্বার পক্ষেই সম্ভব যিনি প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এমন জ্ঞানের অধিকারী যে

আর কেউ নেই, তা বলাই বাহুল্য। অন্য সবার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী কাউকে মানব জীবন নিয়ন্ত্রণ করার মত বিধান রচনার গুরুদায়িত্ব দেয়া যেতে পারে না।

এই স্বতসিদ্ধ বাস্তব সত্যটি সুস্পষ্ট হওয়া সত্তেও অনেকেই সেই ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হয়, অথবা সেটাকে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারে না। তারা আল্লাহর আইনের বাইরেও আইন রচনা করার ধৃষ্টতা দেখায়। তাদের ধারণা, এর মাধ্যমে তারা দেশ ও জাতির মংগল সাধন করছে এবং দেশ ও জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন রচনা করছে। ভাবখানা যেন এই যে, তারা তাদের দেশ ও জাতির অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহর চেয়েও বেশী জ্ঞাত। অথবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও তাদের আরও শরীক দেবতা আছে যারা আল্লাহর আইনের বাইরেও আইন রচনা করার অধিকার রাখে। এদের চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে? এদের চেয়ে আল্লাহর সামনে বড় ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আর কে হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের জন্যে উপযোগী আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইন ও বিধান একাধারে তাদের পরস্পরের মাঝে সর্বোচ্চ সহযোগিতার জন্ম দেবে এবং একই সাথে গোটা বিশ্বজগতের অন্যান্য শক্তির মাঝেও একটা সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি করবে। তাছাড়া তিনি কেবল মৌলিক নীতিগুলোই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং মানুষকে তার নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খুঁটি নাটি বিধান এই মূলনীতি থেকেই গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। তবে এই গ্রহণ হতে হবে সামগ্রিক পদ্ধতি ও সাধারণ নিয়মের সীমারেখার ভেতর থেকে। সেই ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি হতে হবে সেই মূলনীতিরই আলোকে যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে মানদন্ডস্বরূপ প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছেন।

এই মূলনীতি মেনে চললে সংবিধানের উৎস হবে এক এবং শাসন ও বিচার হবে একমাত্র আল্লাহরই। কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও বিচারক। আর এই মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে যে বিধান রচনা করা হবে তা হবে আল্লাহর আইনের বিরোধী, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী এবং সেই আদর্শের বিরোধী যার প্রচার করে গেছেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং স্বয়ং মোহাম্মদ (স.) সহ আল্লাহর অন্যান্য নবী-রসূলরা।

এরপর বলা হচ্ছে,

'যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকতো, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেতো.........'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, এদের বিচার শেষ বিচারের দিনই হবে। তাই এখন এদেরকে একটু সুযোগ দেয়া হয়েছে। যদি আল্লাহর পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে তাদের একটা ফয়সালা এই পৃথিবীর বুকেই হয়ে যেতো, ফলে তিনি তাঁর প্রবর্তিত আইনের ও বিধানের বিরোধিতাকারী এবং মানবরচিত সংবিধান তথা আইনের অনুসারীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করতেন এবং তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তবে পরকালে তাদেরকে অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। বলা হয়েছে 'নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'

এই যালেম কারা? এই যালেম হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে এবং মানবরচিত আইনকে মেনে চলে। কেয়ামতের দিন এই যালেমদের যে কি করুণ অবস্থা হবে, তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন,

'তুমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে......। (আয়াত ২২)

বর্ণনা ভংগির মাধ্যমে তাদের এই করুণ অবস্থা যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তাতে মনে হয়, ওদের কৃতকর্মই যেন ওদের সামনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করবে। অথচ জাগতিক জীবনে এসব কর্মই ছিলো তাদের জন্যে আনন্দের বিষয়, গর্বের বিষয়। আর আজ এসব কর্মই তাদের জন্যে ভয় ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং মনে হচ্ছে, সেইগুলোই যেন আযাবের রূপ ধারণ করে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। এ থেকে তাদের যেন কোনো মুক্তি নেই।

অপরদিকে যারা মোমেনবান্দা, যারা এই দিনটিকে ভয় করতো, আজ তারা নিরাপদে আছে, শান্তিতে আছে ও সুখে আছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'আর যারা মোমেন ও সৎকর্মী তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে.........।' (আয়াত ২২)

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা ভংগির মাধ্যমে যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তাতে সুখ ও শান্তির চিত্রই দেখতে আমরা পাই। যেমন 'জান্নাতের উদ্যান' 'তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যে রয়েছে যা তারা কামনা করবে..........।' অর্থাৎ অগণিত ও অসংখ্য নেয়ামত তাদের জন্যে রয়েছে।

'এটাই হচ্ছে মহা অনুগ্রহ' 'এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ......।'

এসব বক্তব্যে মোমেন বান্দাদের পরকালীন জীবনের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির চিত্রই লক্ষ্য করা যায়।

দ্বীনের দায়ীদের জন্যে একটি বিশেষ নির্দেশনা

সুখ সমৃদ্ধি ও আরাম আয়েশের এই দৃশ্যের পাশাপাশি রসূলুল্লাহ (স.)-কে একটা বিশেষ উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি যেন হেদায়াত ও দাওয়াতের কোনো বিনিময় তাদের কাছে কামনা না করেন। এই হেদায়াত ও দাওয়াতের বদৌলতেই তারা জান্নাতের অগণিত লাভে সক্ষম হয়েছে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটা নিসন্দেহে তাদের প্রতি রসূলের বিরাট দয়া। এই দয়া তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার ফলেই তারা লাভ করতে পেরেছে। আর এটাই রসূলের বড় পাওনা। বলা হচ্ছে,

'বলো, আমি আমার দাওয়াতের কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না, চাই কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ ....।' (আয়াত ২৩)

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে কোনোরূপ বিনিময় কামনা না করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি তাই বিনিময় কামনা করেছেন না। এর ফলে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ লাভ হবে। আমরা জানি যে, কোরায়শ বংশের বিভিন্ন পরিবারের সাথে রসূলুল্লাহ (স.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। আর এই আত্মীয়তার কারণে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে সত্যপথে পরিচালিত করতে চাইতেন। এটাই ছিলো তাঁর বড় পাওয়া।

আয়াতটি যে যে ক্ষেত্রে এসেছে সেসব ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি যখন এর অর্থ করি তখন সেই উপরের ব্যাখ্যাটায়ই আমার মনে আসে। অবশ্য এর আর একটি ব্যাখ্যা আছে যা, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী উল্লেখ করেছেন। সেটা আমি এখানে উল্লেখ করছি। এতে বলা হয়েছে যে, একবার তাউস ইবনে আব্বাস (রা.)-কে 'আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁর কাছে বসা সাঈদ ইবনে যোবায়র বললেন, 'মোহাম্মদ (স.)-এর আত্মীয়স্বজন'। এই কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, 'তুমি খুব তাড়াহুড়ো করে

উত্তর দিয়েছ। আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোরায়শ বংশের এমন কোনো পরিবার ছিলো না যাদের সাথে রসূলুল্লাহ (স.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো না। তাই তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, তবে এতোটুকু চাই যে, আমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কটা যেন তোমরা অটুট রাখো।'

এই ব্যাখ্যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে তোমরা আমার কোনো ক্ষতি করবে না এবং আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের যে বাণী শুনাচ্ছি তা উদার মন নিয়ে শুনবে। আর এটাই হবে আমার জন্যে প্রকৃত বিনিময় বা পারিশ্রমিক; অন্য কিছু নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা সাঈদ ইবনে যোবায়র এর ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক যুক্তিসংগত ও প্রকৃত ঘটনার কাছাকাছি। তবে আমি এখনও মনে করছি, উপরে আমি যে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছি সেটা আরও যুক্তিসংগত ও প্রকৃত ঘটনার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। তবুও আমি স্বীকার করছি, সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন; আমরা নই।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, হেদায়াতের বদৌলতে পরকালে তারা যা কিছু লাভ করবে, তার কোনো বিনিময় তিনি তাদের কাছে দাবী করছেন না। অথচ পৃথিবীর বুকে এর চেয়েও নগণ্য ও তুচ্ছ কিছু পাইয়ে দিলে মোটা অংকের দালালী দিতে হয়। কিন্তু, আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি বান্দাদের হিসাব নিকাশ ব্যবসা অথবা আইনের তুলাদন্ডে মেপে করবেন না। বরং উদারতা ও করুণার মানদন্ডে মেপে করবেন। তাই বলা হয়েছে, 'যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই।'

এটা নিছক বিনিময় নয়, বরং বিনিময়ের অতিরিক্ত। এখানেই শেষ নয়। এরপর রয়েছে ক্ষমা ও কর্মের মূল্যায়ন। বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন, আল্লাহ তায়ালা কর্মের মূল্যায়ন করেন। কার কর্মের মূল্যায়ন করেন? আপন বান্দাদের কর্মের মূল্যায়ন করেন। অথচ তাদের এই কর্মের শক্তি ও সামর্থ্য তিনিই তাদেরকে দান করেছেন, তিনি এই কর্মের নিছক মূল্যায়নই করছেন না; বরং তিনি তাদের বিনিময় ও পুরস্কার বাড়িয়েও দিচ্ছেন। আবার তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমাও করে দিচ্ছেন। কি অপূর্ব এই উদারতা ও বদান্যতা। মানুষের পক্ষে এর অনুকরণ করাতো দূরের কথা, তাদের পক্ষে এই উদারতা ও বদান্যতার জন্যে যথার্থরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।

এরপর প্রসংগ পুনরায় চলে যাচ্ছে সেই আদি সত্যের আলোচনার দিকে। ওই প্রসংগে বলা হয়েছে, তারা 'নাকি এ কথা বলে যে, তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন?........।' (আয়াত ২৪)

অর্থাৎ ওহীর উৎস, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তারা যে সন্দেহ প্রকাশ করে সেটার কারণ হিসেবে কি তারা বলতে চায় যে, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন? তারা কি বলতে চায়, আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁর প্রতি কোনো বাণী অবতীর্ণ করেননি?

কিন্তু তাদের এই আশংকা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। কারণ কেউ আল্লাহর কাছ থেকে কোনো বাণী প্রাপ্ত না হয়েও দাবী করছে সে বাণীপ্রাপ্ত হয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা তাকে ছেড়ে দেবেন এটা

কখনও হতে পারে না। তিনি এ জাতীয় লোকদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিতে পারেন। ফলে তাদের পক্ষে কখনও কোরআন সম্পর্কে মিথ্যা দাবী করার সুযোগ হবে না; বরং তাদের এমন মিথ্যা দাবীর স্বরূপ উন্মোচন করে তা ধরা-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং সত্যকে সমহিমায় উদ্ভাসিত করে মিথ্যার ওপর জয়ী করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত, তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন............।'

শুধু তাই নয়, বরং মোহাম্মদ (স.)-এর অন্তরের সকল গোপন কথাই তাঁর জানা আছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।'

তাহলে বুঝা গেলো যে, ওদের আশঙ্কা বা সন্দেহের কোনো ভিত্তিমূল নেই। এটা কেবলই ভিত্তিহীন একটা ধারণা এবং একটি দাবী যা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের পরিপন্থী, তাঁর অসীম কুদরতের পরিপন্থী এবং তাঁর সেই শাশ্বত বিধানের পরিপন্থী যার ওপর ভিত্তি করে তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই প্রমাণিত হলো, এই ওহীর ঘটনা সত্য ঘটনা এবং মোহাম্মদ (স.) যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন। তিনি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করেননি। কারণ যারা এমনটি করে তারা মিথ্যুক, অত্যাচারী ও বিপথগামী। আর এই বক্তব্যের সাথেই আপাতত, ওহী সংক্রান্ত সন্দেহের অবসান ঘটলো। এখন তাদের সামনে ভিন্ন আর একটি পর্ব তুলে ধরা হচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে এই, 'তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা করো– সে বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন ....।'

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ

فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ

لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ

بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ

الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا

مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ

فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى

الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

২৫. তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা– যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহ খাতাও তিনি ক্ষমা করে দেন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কেও তিনি জানেন, ২৬. তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে তাদের (পাওনার চাইতে) বেশী (সওয়াব) দান করেন; (হ্যাঁ,) যারা (তাঁকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। ২৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সব) বান্দাদের রেযেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, (তাই) তিনি পরিমাণমতো যাকে (যতোটুকু) চান তার জন্যে (ততোটুকু রেযেকই) নাযিল করেন; অবশ্য তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) নযর রাখেন। ২৮. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা)– তারা যখন (বৃষ্টির ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং (এভাবেই) যমীনে তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; (মূলত) তিনিই অভিভাবক, (তিনিই) প্রশংসিত। ২৯. তাঁর (কুদরতের অন্যতম) নিদর্শন হচ্ছে স্বয়ং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝখানে যতো প্রাণী আছে তা তিনিই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন এদের সবাইকে (আবার) জমা করতেও সক্ষম হবেন।

রুকু ৪

৩০. (হে মানুষ,) যে বিপদ আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই, (তা সত্ত্বেও) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক (অপরাধ এমনিই) ক্ষমা করে দেন। ৩১. তোমরা যমীনে আল্লাহকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ

فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ اَوْ

يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ

اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ

يَغْفِرُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ

شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ

هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى

৩২. আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে বাতাসের বেগে বয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজগুলো অন্যতম; ৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে এসব (নৌযান) সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে; নিশ্চয়ই এ (প্রক্রিয়ার) মাঝে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে, ৩৪. অথবা তিনি চাইলে (বাতাস তীব্র করে সেগুলো) তাদের কৃতকর্মের কারণে ধ্বংসও করে দিতে পারেন, অনেক কিছু থেকে তিনি তো (আবার) ক্ষমাও করে দেন, ৩৫. যারা আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে (খামাখা) বিতর্ক করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা নেই। ৩৬. তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী মাত্র, কিন্তু (পুরস্কার হিসেবে) যা আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং সর্বাবস্থায়ই তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে, ৩৭. যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের ভুল) ক্ষমা করে দেয়, ৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পন্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে, ৩৯. যারা (এমনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় তখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপস করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে)

اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۴۰﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا

عَلَیْهِمْ مِّنْ سَبِیْلٍ ﴿۴۱﴾ اِنَّمَا السَّبِیْلُ عَلَی الَّذِیْنَ یَظْلِمُوْنَ النَّاسَ

وَیَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾ وَلَمَنْ

صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۴۳﴾ وَمَنْ یُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ

وَّلِیٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَی الظّٰلِمِیْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ یَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰی

مَرَدٍّ مِّنْ سَبِیْلٍ ﴿۴۴﴾ وَتَرٰىهُمْ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا خٰشِعِیْنَ مِنَ الذُّلِّ یَنْظُرُوْنَ

مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ

خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِیْنَ فِیْ عَذَابٍ

مُّقِیْمٍ ﴿۴۵﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِیَآءَ یَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ

যথাযথ পুরস্কার রয়েছে; আল্লাহ তায়ালা কখনও যালেমদের পছন্দ করেন না। ৪১. কোনো ব্যক্তি যদি তার সাথে যুলুম (সংঘটিত) হওয়ার পর (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাতে তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই; ৪২. অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন (ধরনের যালেম) লোকদের জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব। ৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।

রুকু ৫

৪৪. (হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ করে দেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় অভিভাবক থাকে না; তুমি যালেমদের দেখবে, যখন তারা (আল্লাহ তায়ালার) আযাব পর্যবেক্ষণ করবে তখন বলবে, (আজ এখান থেকে) ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি? ৪৫. তুমি তাদের দেখতে পাবে (যখন) তাদের জাহান্নামের কাছে এনে হাযির করা হবে, তখন তারা অপমানে অবনত (হয়ে যাবে), ভয়ে তারা অর্ধ নির্মীলিত চোখে তাকিয়ে থাকবে; (এ অবস্থা দেখে) যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলবে, সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত লোক তো তারা যারা (আজ) কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (এভাবে) ক্ষতি সাধন করেছে; (হে নবী,) জেনে রেখো, নিসন্দেহে যালেমরা (সেদিন) স্থায়ী আযাবে থাকবে। ৪৬. (আর সে আযাব এসে গেলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না, যারা (তখন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে; (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন

يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ

اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ

اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا

يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ

يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ

يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

তার জন্যে (বাঁচার) কোনোই উপায় নেই; ৪৭. (হে মানুষ,) সে দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের মালিকের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে দিনটির প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না; সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না, আর না তোমাদের পক্ষে সেদিন (অপরাধ) অস্বীকার করা সম্ভব হবে! ৪৮. অতপর যদি এরা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি জেনে রেখো), আমি তোমাকে তাদের ওপর দারোগা করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব তো হচ্ছে শুধু (আল্লাহ তায়ালার বাণী) পৌঁছে দেয়া; যখন আমি মানুষদের আমার রহমত (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই তখন সে সে জন্যে (ভীষণ) উল্লসিত হয়, আবার যদি তাদেরই (কোনো) কর্মকান্ডের কারণে তাদের ওপর কোনো দুঃখ কষ্ট আসে, তখন (সে) মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। ৪৯. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন, ৫০. যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়টাই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নিসন্দেহে তিনি বেশী জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন। ৫১. (আসলে) কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা (সরাসরি) তার সাথে কথা বলবেন, অবশ্য ওহী (দ্বারা) অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা ওহী নিয়ে তিনি কোনো দূত (তার কাছে) পাঠাবেন এবং সে (দূত) তাঁরই অনুমতিক্রমে তিনি (যখন) যেভাবে চাইবেন (বান্দার কাছে) ওহী পৌঁছে দেবে; নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وَاِنَّكَ
لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ، اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

৫২. এমনিভাবেই (হে নবী,) আমি আমার আদেশে (দ্বীনের এ) 'রূহ' তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব কি, না (তুমি জানতে) ঈমান কি কিন্তু আমি এ (রূহ)-কে একটি 'নূরে' পরিণত করে দিয়েছি, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে চাই তাকে (দ্বীনের) পথ দেখাই (এবং আমার আদেশক্রমে) তুমিও (মানুষদের) সঠিক পথ দেখিয়ে যাচ্ছো, ৫৩. (সে পথ) আল্লাহ তায়ালারই পথ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্যে; শুনে রেখো, (পরিশেষে) সব কিছু আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হয়।

তাফসীর

আয়াত ২৫-৫৩

আলোচ্য সূরার এই দ্বিতীয় পর্বে জীবন ও জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈমানের অসংখ্য প্রমাণাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে যেসব বিষয় রয়েছে তার ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব ক্ষমতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া মোমেনদের কিছু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যা তাদেরকে অপরাপর দল ও গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। উল্লেখ্য যে, সূরার প্রথম পর্বে ওহী এবং রেসালাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শেষাংশে ওহীর প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ওহী ও রেসালাত এই দুটো বিষয়ই পরস্পরের সাথে জড়িত। কারণ দুটো পথই মানব হৃদয়ে গিয়ে মিশে যায়।

প্রয়োজনমতো মানুষের রেযেক সরবরাহ

আলোচ্য পর্বের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপগুলো মিটিয়ে দেন........। *(আয়াত ২৭)*

এই মর্মস্পর্শী বক্তব্যটি আসছে পূর্ব বর্ণিত সেই দৃশ্যের পর যেখানে পাপী ও অত্যাচারীদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের সামনে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এবং মোমেন বান্দাদেরকে দেখানো হয়েছে জান্নাতের উদ্যানে। সাথে সাথে যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের পৌঁছানো বাণী সম্পর্কে সব ধরনের সংশয় সন্দেহের অবসান ঘটানো হয়েছে এবং এই সত্যটিও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অন্তরের সকল ভেদ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য এসেছে সেইসব লোকদের জন্যে যারা তওবা করতে চায়, যারা ভুল পথ থেকে ফিরে সঠিক পথে আসতে চায় এবং আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালার আগেই সংশোধিত হতে চায়। তাদের জন্যে তওবার দরজা খোলা আছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করার জন্যে প্রস্তুত আছেন, তাদের পাপ মোচন করার জন্যে রাজী আছেন। কাজেই পাপের বোঝা

ভারী হওয়ার কারণে হতাশার কিছু নেই, ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। তিনি আরও জানেন কারা সত্যিকার অর্থে তাওবা করে। যারা সত্যিকার অর্থে তাওবা করে, তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন, তেমনিভাবে তিনি মানুষের অতীতের পাপগুলো সম্পর্কেও জানেন, তাই সেগুলো মিটিয়ে দেন।

এই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার মাঝখানেই মোমেন ও কাফেরদের প্রাপ্য প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা মোমেন ও সৎকর্মশীল তারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়। আর প্রভু তাদের প্রতি অধিক দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন। অপরদিকে যারা কাফের, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। এই কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাওবার দরজা সবার জন্যে খোলা আছে। তবে আল্লাহর অধিক অনুগ্রহ ও বিশেষ দয়া কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটবে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে।

পরকালে আল্লাহর দয়া ও করুণার কোনো সীমা থাকবে না, কোনো হিসাবও থাকবে না। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জীবিকা নির্ধারিত পরিমাণে দিয়ে থাকেন। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন, পৃথিবীতে বসবাসকারী এই দুর্বলচিত্তের বান্দাদের জন্যে তাঁর দয়ার ভান্ডার পুরোপুরি খুলে দিলে তাদের পক্ষে সেই চাপ সহ্য করা সম্ভবপর হবে না। তাই বলা হচ্ছে,

'যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রেযেক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো.........।' *(আয়াত ২৭)*

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, তাঁর বান্দারা সীমিত সচ্ছলতারই উপযুক্ত। তাদের ধারণ ক্ষমতার জন্যে এটা যথার্থ। কারণ, পরকালে তাদেরকে যে অঢেল পরিমাণে দেয়া হবে, সে পরিমাণে তাদেরকে যদি দুনিয়াতেও দেয়া হয় তাহলে তারা সীমালংঘন করবে, বিপর্যয় ঘটাবে। এ সকল বান্দা তো দুর্বল, তাই ভারসাম্য রক্ষা করে চলা তাদের পক্ষে সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, তাদের ধারণ ক্ষমতা সীমিত সম্পদের জন্যেই উপযুক্ত। এ সত্যটুকু আল্লাহর জানা আছে। কারণ তিনি বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন। আর সেই কারণেই তিনি এই পার্থিব জীবনে তাদেরকে সীমিত ও নির্ধারিত পরিমাণে এবং তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুসারে সম্পদ দান করেন। তবে যারা দুনিয়ার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হবে এবং সহি সালামতে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে, তাদের জন্যে সীমাহীন প্রাচুর্য ও সুখ সাচ্ছন্দ থাকবে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে,

'মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন ....।' *(আয়াত ২৮)*

এই আয়াতে বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার আর এক অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে যখন মানুষ জীবনের প্রথম উপাদান পানির জন্যে হাহাকার করতে থাকে এবং হতাশা নিরাশা যখন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে খরতাপে ঝলসে যাওয়া ভূমি জীবিত হয়ে ওঠে, পতিত জমি শস্যশ্যামল হয়ে উঠে, বীজ অংকুরিত হয়, চারাগুলো ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, আবহাওয়া কোমল ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, জীবন চাঞ্চল্য ফিরে আসে, মানুষের মাঝে কর্মস্পৃহা জেগে উঠে, মাঠে ঘাটে আনন্দের বার্তা বয়ে যায়, হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, মনে আশার সঞ্চার হয়। হতাশা এবং আল্লাহর রহমতের মাঝে ক্ষণিকের ব্যবধান ছিলো। এ ব্যবধান কেটে যাওয়ার সাথে সাথে রহমতের সকল দুয়ার খুলে যায়, আকাশের দুয়ারও খুলে যায় এবং রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। 'তিনিই কার্যনির্বাহী

প্রশংসিত..........' অর্থাৎ তিনি সাহায্যকারী, তিনি পালনকর্তা। তাঁর সত্ত্বাও প্রশংসিত এবং তাঁর গুণাবলীও প্রশংসিত।

আলোচ্য আয়াতে বৃষ্টিকে 'গায়ছো' বলা হয়েছে। 'গায়ছো' শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্রাণ ও উদ্ধার। অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত বা দুর্যোগ কবলিত কাউকে রক্ষা করা, উদ্ধার করা। অপরদিকে বৃষ্টির প্রভাবকে 'রহমত ছড়িয়ে দেয়া' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই রহমত শব্দের মাঝে আমরা সজীবতা, শ্যামলতা, আশা ও উৎফুল্লতার ব্যঞ্জনা পাই। কারণ, বৃষ্টি ধারায় সিঞ্চিত হয়ে শুষ্ক ভূমি যখন ফলে ফুলে ভরে ওঠে, তখন সত্য সত্যই মানুষের মনে সজীবতা আসে, উৎফুল্লতা আসে এবং আশার সঞ্চার হয়। গ্রীষ্মের খরতাপের পর বৃষ্টির দৃশ্যে মানুষের হৃদয় মন ও স্নায়ু যতোটুকু স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করে ততোটুকু আর কিছুতে হয় না। তেমনিভাবে বৃষ্টিপাতের পর শুষ্ক ভূমি শস্য শ্যামল হয়ে ওঠার পর যে দৃশ্যের সৃষ্টি তা দেখে মানুষের চোখ যতোটুকু জুড়ায় ততোটুকু আর কিছুতে জুড়ায় না।

সৃষ্টিজগতের সর্বত্র আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এর উভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এগুলো তাঁর এক নিদর্শন...............।' (আয়াত ২৯-৩১)

এই জাগতিক নিদর্শনগুলো মানুষের দৃষ্টির সামনেই রয়েছে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে সত্যতার প্রমাণ বহন করছে। মানুষ ওহীর মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাপারে সন্দেহ করেছে এবং বিরোধের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আসমান ও যমীন সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাপারে এই বিতর্ক বা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এগুলো অকাট্য এবং এর আবেদন হচ্ছে হৃদয়ের প্রতি। কোনো সুস্থ বিবেকের অধিকারী ব্যক্তিই এগুলোকে নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়াতে পারে না। এগুলো সুস্পষ্টরূপে যে সত্যটি প্রমাণ করে তা হলো, এসবের সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। কাজেই স্বীকার করতেই হবে যে, এসবের কোনো স্রষ্টা আছে, পরিচালক আছে। কারণ এর বিশালতা, এর সূক্ষ্ম মিল, এর আবহমান শৃংখলা এবং এর স্থিতিশীল নিয়মের ঐক্য এ গুলোর ব্যাখ্যা কখনও যুক্তি দ্বারা করা সম্ভব নয়, বরং এ কথা বলা ছাড়া উপায় নেই যে, কোনো স্রষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছে এবং পরিচালনা করছে। তাছাড়া মানুষের বিবেক সেই সৃষ্টিজগতের মুখের ভাষা সরাসরি বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে এবং তার সম্পর্কে বইয়ের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শোনার আগেই তার সত্যতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন আসমান ও যমীন। এর মধ্যেই আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, উভয়টির মাঝে বিচরণকারী প্রাণীর অস্তিত্ব। মহাশূন্যে বিচরণকারী বিভিন্ন প্রাণীর কথা বাদ দিলেও খোদ এই পৃথিবীর বুকেই যেসব প্রাণী বিচরণ করছে সেটা তো কতো বড় নিদর্শন। পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্ব এমন একটি রহস্য যার স্বরূপ ও প্রকৃতি এখনও মানুষের কাছে অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। প্রাণ সৃষ্টি করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই প্রাণ এমন একটি রহস্য যার উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ জানে না, প্রাণ কোথা থেকে আসলো, কিভাবে আসলো এবং কিভাবে তা প্রাণীর রূপ ধারণ করলো এসব প্রশ্নের আজও কোনো মীমাংসা হয়নি। প্রাণের উৎস অথবা প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে গিয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তা বিষয়টিকে আরও রহস্যাবৃত ও জটিল করে তুলেছে। কারণ, এ সম্পর্কিত গোটা গবেষণাকর্ম যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাহলো প্রাণের উৎপত্তির পর প্রাণীর বিবর্তন এর বিভিন্ন প্রজাতি ও এর বিভিন্ন আচার আচরণ। এই দৃশ্যমান ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রটিকে

কেন্দ্র করেও বিভিন্ন মতবিরোধ ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর দৃশ্যের বাইরে যা কিছু আছে তা রহস্যই থেকে যাচ্ছে, অভাবনীয় ও অজানা দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তির আওতার বাইরে। এটা একান্তই আল্লাহর বিষয়। এই বিষয়ে মানুষের কোনো দখল নেই।

এই যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাণের অস্তিত্ব যার সন্ধান পাই ভূ-পৃষ্ঠে, ভূগর্ভে, সমুদ্রের গভীরে এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরে, মহাকাশে বিচরণকারী অন্যান্য প্রাণীর কথা তো বাদই দিলাম। এই যে অসংখ্য প্রাণী যার সম্পর্কে মানুষ তার সীমিত উপায় ও মাধ্যম দ্বারা খুব সামান্যই জানতে পেরেছে। এই অসংখ্য ও অগণিত প্রাণীকে আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা একত্রিত করবেন। কোনো একটি প্রাণীও বাদ যাবে না, কোনো একটি প্রাণীও হারিয়ে যাবে না বা অনুপস্থিত থাকবে না। অথচ মানুষ তার পোষা এক ঝাঁক পাখিকে খাঁচায় ফিরিয়ে আনতে হিমশিম খায়। একই কথা একঝাঁক মৌমাছির বেলায়ও খাটে।

অগণিত পাখির ঝাঁক, অগনিত মৌমাছির ও কীট পতংগের ঝাঁক, অগনিত জীবাণুর ঝাঁক, অসংখ্য মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীর ঝাঁক, বিভিন্ন জায়গায় বিচরণকারী অসংখ্য মানুষের দল এবং এর চেয়েও সংখ্যায় অনেক অনেক বেশী বিভিন্ন প্রাণীর সমষ্টি যা মহাশূন্যে অজানা ও অদৃশ্য স্থানে বিচরণ করছে এইসব পশু প্রাণীকে আল্লাহ তায়ালা একটা নির্দিষ্ট দিনে এবং একটা নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করবেন।

কোরআনের বর্ণনা ভংগিতে যে ভাবটি ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয়, পৃথিবী ও আকাশে জীবজন্তুর বিস্তার এবং এসবের একত্রিকরণের মাঝে যে সময়টুকু তা কোরআনের একটা ছোট্ট আয়াত তেলাওয়াত করার সমান।

এই দুটো দৃশ্য বর্ণনা করার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এই জাগতিক জীবনে তারা যে সকল সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হয় সেগুলো তাদেরই কৃতকর্মের ফল। তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন। এই বিশাল সৃষ্টিজগতের ছোট্ট একটা অংশ হিসেবে মানুষ যে খুবই দুর্বল ও অক্ষম, সে কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, 'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল ...।' (আয়াত ৩০-৩১)

প্রথম আয়াতে আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, দুর্বল মানবতার প্রতি তাঁর দয়ার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি আপদ বিপদের পেছনে মানুষের কর্মই ক্রীয়াশীল। তবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার প্রতিটি অন্যায়ের জন্যেই পাকড়াও করেন না। কারণ, তিনি মানব স্বভাবের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে জানেন। তাই তার অনেক অপরাধই তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এটা নিসন্দেহে বান্দার প্রতি তাঁর অশেষ দয়া ও করুণা।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের দুর্বলতার দিকটি চিত্রায়িত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে সে পরাক্রমশলী নয়। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তার কোনো উপায়ও নেই। কাজেই সে এই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে? কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে?

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন ....।' (আয়াত ৩২-৩৫)

সমুদ্রে ভাসমান পাহাড়সম জাহাজগুলোও আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ। এই যে সাগর, এটাকে কে সৃষ্টি করেছে? কোনো মানুষ কি নিজেকে এর সৃষ্টিকর্তা বলে

দাবী করতে পারবে? সাগরের গভীরতা ও প্রশস্ততা কে সৃষ্টি করেছে যার ফলে বিশাল আকৃতির জলযান তার বুকের ওপর ভাসতে পারে? এই যে বিশাল আকৃতির জলযান– এর উপাদানগুলো কে সৃষ্টি করেছে? কে এই উপাদানগুলোর মাঝে এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সেসব জলযান পানির ওপর ভাসতে পারে? এই জলযানগুলোর চালিকা শক্তি হিসেবে এই যে বাতাস, বা বাষ্পচালিত যন্ত্র বা পরমাণুশক্তি চালিত যন্ত্র এগুলোর মূল উপাদান কে সৃষ্টি করেছে? সে সেই সত্ত্বা যিনি এসব প্রাণহীন বস্তুগুলোর মাঝে চালিকা শক্তি দান করেছেন যা পাহাড়সম বিশাল আকৃতির জলযানগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যায়?

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়.........।' (আয়াত ৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কখনও কখনও এসব জলযানকে নিশ্চল করে দেন, ফলে মনে হয় যেন এগুলো প্রাণহীন ও নিথর। তাই বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শন রয়েছে........।'

অর্থাৎ এই জলযানগুলোর সচলতা ও নিশ্চলতা উভয়টির মাঝে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। লক্ষণীয় যে, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এ দুটো গুণের উল্লেখ পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানেই এক সংগে দেখা যায়। অর্থাৎ বিপদে ধৈর্যধারণ এবং সুসময়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এমন দুটো গুণ যা সুখে দুঃখে এবং হাসি আনন্দের সকল মুহূর্তেই মোমেন বান্দার মাঝে পাওয়া যায়। এরপর বলা হচ্ছে, 'অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন' (আয়াত ৩৪) অর্থাৎ পাপাচার ও ঈমান বিরোধী কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা সেসব জলযান ধ্বংস করে দেন অথবা ডুবিয়ে দেন। আবার অনেক পাপ ক্ষমাও করে দেন। মানুষের সব ধরনের পাপের জন্যে তিনি শাস্তি দেননা।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোনো পলায়নের জায়গা নেই। (আয়াত ৩৫)

অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, অথবা তাদের জলযানগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেন, তাহলে তারা কেউ রক্ষা পাবে না।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, এই পার্থিব জগতে তারা যা কিছুর মালিক তা সবই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ব্যতীত আর কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, স্থিতিশীলতা নেই।

এরপর পার্থিব জীবনে দেয়া বিভিন্ন উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে, এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। আসলে এগুলোর কোনো মূল্য নেই। সত্যিকার অর্থে যা মূল্যবান ও চিরস্থায়ী তা হচ্ছে সেই সব নেয়ামত যা আল্লাহ তায়ালা পরকালে কেবল মোমেন ও আস্থাশীল বান্দাদের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন এই মোমেন বান্দাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, 'অতএব তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র ....।' (আয়াত ৩৬-৪৩)

মুসলিম সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ ও মৌলিক নীতিমালা

আলোচ্য সূরার প্রথমে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে ঐশীগ্রন্থ দান করা হয়েছে, তারা সজ্ঞানে কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে, মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। এই কোন্দল ও মতানৈক্য ছিলো পরস্পর

শত্রুতাবশত, অজ্ঞতাবশত নয়। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া ঐশী গ্রন্থের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলোনা। তেমনিভাবে তারা সেই ঐশী বিধান সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলো না যা নূহ (আ.)-এর যুগ থেকে ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এবং মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে ঈসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলে আসছিলো। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, পরবর্তীযুগে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে এসব ঐশীগ্রন্থ লাভ করেছিলো তারাও এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না, বরং সংশয় সন্দেহে লিপ্ত ছিলো।

এই যদি অবস্থা হয় সেসব লোকদের যারা ঐশী ধর্মের অনুসারী ছিলো, নবী রসূলদের অনুসারী ছিলো এবং ঐশী গ্রন্থের ধারক ছিলো, তাহলে যারা আদৌ কোনো নবীর অনুসারী নয় এবং আদৌ কোনো ঐশী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসী নয় তাদের অবস্থা কি হবে? নিশ্চয় তাদের অবস্থান ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার শেষ সীমায়।

মক্কাবাসী ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক করিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা ও রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছেন এবং এর মাঝে সেই বিধানই রেখেছেন যার প্রচার করে গেছেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা (আ.) সহ প্রমুখ নবী-রসূলরা। এর ফলে ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে চলে আসা দাওয়াত ও তাবলীগের ধারার সাথে এর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, এর উদ্দেশ্য আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন হয়েছে। এর ফলে এমন একটি মুসলিম সমাজের সৃষ্টি হবে যাদের হাতে থাকবে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব এবং এই দাওয়াত ও তবলীগকে এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী বাস্তবায়িত করবে।

এখানে এই মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। আলোচ্য সূরাটি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এই সমাজের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে,

'তাদের কার্যাবলী পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।'

এর মাধ্যমে এটাই বুঝা যায় যে, শূরা বা পরামর্শের প্রথা মুসলিম জীবনে কেবল একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিই নয়, বরং এটা গোটা মুসলিম সমাজেরই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটা গুণ। এর ওপরই মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এরপর এর প্রসার ঘটেছে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে। কারণ এই রাষ্ট্র, দল ও সমাজেরই বৃহত্তর রূপ। কাজেই রাষ্ট্র কাঠামোতে দলীয় নিয়ম নীতির প্রতিফলন ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক। আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য পাই। তা হচ্ছে,

'যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে'

অথচ আমরা জানি, মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদেরকে অন্যায় অবিচার ও যুলুম-নির্যাতনের মুখে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করা তাদের জন্যে নিষেধ ছিলো। তবে অন্য একটি আয়াতে তাদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। আর এই অনুমতি আসে হিজরতের পর। সেই আয়াতে বলা হয়েছে 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' (সূরা আল হজ্ব ৩৯)

এই মক্কী আয়াতে মুসলিম সমাজের মৌলিক ও চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিকভাবে মুসলিম সমাজ আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। তবে মক্কায় অবস্থানকালে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করতে

সাময়িকভাবে নিষেধ করা হয়েছিলো। এখানে যেহেতু মুসলিম সমাজের মৌলিক ও চিরন্তন গুণাবলীর আলোচনা করা হচ্ছে তাই যুদ্ধের অনুমতি না থাকা সত্তেও এবং আলোচ্য আয়াত মক্কী হওয়া সত্তেও এই প্রতিশোধ গ্রহণের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত গুণাবলী এমন একটি মুসলিম সমাজের বলে উল্লেখ করা হয়েছে যাদেরকে মানবতার হেদায়াতের জন্যে, মুক্তির জন্যে এবং নেতৃত্বের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে। এই গুণাবলী মক্কী জীবনের এমন একটি সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে যখন সেই মুসলিম সমাজের হাতে আদৌ কোনো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিলো না। বিষয়টা ভেবে দেখার মতো। এর অর্থ হচ্ছে, মানবতার হেদায়াত ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার পূর্বে মুসলিম সমাজকে এসব গুণাবলী অর্জন করতে হবে এবং নিজেকে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এখন এসব গুণাবলীর একটা একটা করে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে এবং এর স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। সাথে সাথে দেখতে হবে, মানবজীবনে এসব গুণাবলীর মূল্য ও তাৎপর্য কি?

এসব গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে ঈমান, আস্থা, পাপাচার ও অশ্লীলতা পরিহার, ক্রোধের সময় ক্ষমাপ্রদর্শন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়া, নামায কায়েম করা, সকল বিষয়ে পরামর্শ করা, আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে খরচ করা, আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নেয়া, মার্জনা, সংশোধন এবং সহনশীলতা ইত্যাদি।

এসব গুণাবলীর তাৎপর্য ও মূল্য কি তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। তা হচ্ছে মুসলিম সমাজের গুণাবলী বর্ণনার আগে শাশ্বত আল্লাহর মানদন্ডে সত্যিকার মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। কোনটি শাশ্বত মূল্যবোধ, আর কোনটি ক্ষণস্থায়ী মূল্যবোধ সেটা মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যেন তাদের চিন্তা চেতনায় কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। অন্যথায়, তাদের সকল মানদন্ড ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। তাই প্রথমেই সেই মূল্যবোধের আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'অতএব তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী......................।' (আয়াত ৩৬)

এই পার্থিব জীবনে মনোমুগ্ধকর ও চোখ ধাঁধানো অনেক কিছুই আছে। এখানে রয়েছে সম্পদের মোহ, সন্তানের মোহ, ভোগের মোহ, বিলাসিতার মোহ, খ্যাতির মোহ, ক্ষমতার মোহ এবং প্রভাব প্রতিপত্তির মোহ। এই পার্থিব জগতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নিছক দয়া ও করুণার বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু নেয়ামত দান করে থাকেন। এখানে পাপ পুণ্যের কোনো প্রশ্ন নেই। অবশ্য তিনি কখনও কখনও তাঁর বাধ্য বান্দাদের অল্প সম্পদেও বরকত দান করে থাকেন। আবার অবাধ্য বান্দাদের সম্পদে বরকত তুলে নেন। ফলে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও তারা তাতে কোনো বরকত লক্ষ্য করে না।

কিন্তু এর একটিও শাশ্বত ও চিরন্তন মূল্যবোধরূপে গন্য হয় না। বরং এগুলো নিছক ভোগের সামগ্রী, সীমিত সময়ের জন্যে এসব দান করা হয়। এগুলো প্রকৃত উন্নতি ও অবনতির মানদন্ড নয়। স্বয়ং এগুলো আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও অমর্যাদার আদৌ কোনো বিষয় হিসেবে গণ্য হয় না। এমনকি এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রমাণ হিসেবেও গন্য হয় না। এগুলো কেবলই ভোগ সামগ্রী। অপরদিকে 'আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' অর্থাৎ সেগুলো সত্ত্বাগত

দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কালগত দিক দিয়ে চিরস্থায়ী। এই হিসেবে দেখলে পার্থিব ভোগসমাগ্রী নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হবে। কারণ, পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী খুবই সীমিত সময়ের জন্যে। এর স্থায়িত্ব কোনোভাবেই ব্যক্তির বয়সের অতিরিক্ত নয়। তেমনিভাবে এর স্থায়িত্ব মানবজাতির বয়সেরও অতিরিক্ত নয়। তাই পরকালীন জীবনের তুলনায় এর স্থায়িত্ব এক পলকের কাছাকাছিই বলতে পারি।

এই বাস্তব সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার পর এখন মোমেনদের গুণাবলীর কথা বলা হচ্ছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, 'আর যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে,' অর্থাৎ প্রথম গুণাটিই হচ্ছে ঈমানের গুণ। এই ঈমানের তাৎপর্য ও মূল্য কী? ঈমান হচ্ছে সেই আদি সত্যের জ্ঞান যা ব্যতীত মানব মনে এই জগতের কোনো কিছুরই সঠিক জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। কারণ, আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে এই সৃষ্টিজগতের যথার্থরূপ ও বাস্তবতা সম্পর্কে মানব মনে অনুভূতি জাগে। তখন সে বুঝতে পারে এই জগত আল্লাহরই সৃষ্টি। এই অনুভূতি লাভের পরই মানুষ এই জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারে এবং পেছনে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে পারে। আর এই জানার ফলেই সে এই বিশাল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং গোটা প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সংগতি রক্ষা করে চলতে পারে। এই সংগতির ফলে তার জীবন সুখী হয় এবং গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে মিলে মিশে জগতস্রষ্টর প্রতি আনুগত্য ও দাসত্ব প্রদর্শন করে, আত্মনিবেদন করে। এটা প্রতিটি মানুষেরই অপরিহার্য গুণ। কিন্তু যে দল ও গোষ্ঠী মানবতাকে জগতস্রষ্টার সন্ধান দেয় তার মাঝে এই গুণ আরও অপরিহার্য, আরও কাম্য।

ঈমানের মূল্য কি? ঈমানের মূল্য হচ্ছে, মানুষ এর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, নিজ আদর্শের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে না, কোনো ভয় ভীতি থাকে না এবং কোনো হতাশা নিরাশা থাকে না। এই গুণগুলো পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু যারা সত্যপথের দিশারী, যারা মানবতাকে এই পথে পরিচালিত করে তাদের জন্যে এই গুণাবলী আরও অপরিহার্য, আরও কাম্য।

ঈমানের প্রকৃত মূল্য হচ্ছে এই যে, মানুষ এর মাধ্যমে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, ব্যক্তি স্বার্থের কয়েদ থেকে মুক্ত হয় এবং তার মন ও মস্তিস্ক এক মহান উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তখন সে মনে করে, তার নিজের বলতে কিছু নেই, যা কিছু আছে তা আল্লাহর রাহে মানুষকে আহ্বান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে সে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। এই অনুভূতি, এই চেতনা সেই সব লোকদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী যাদের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কারণ, এই অনুভূতি ও চেতনা তার মাঝে ক্রীয়াশীল থাকলে সে কখনও দাওয়াত তবলীগের ময়দানে কাজ করতে গিয়ে বিপদ-আপদ বা কোনো নির্যাতনের সম্মুখীন হলে ধৈর্যহারা হবে না, হতাশ ও নিরাশ হবে না। তেমনিভাবে নিজের ডাকে মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়ে বা আনুগত্য পেয়ে আত্মগরিমায় ভুগবে না। বরং নিজেকে কেবলই একজন দায়বদ্ধ কর্মী মনে করবে।

যে ঈমানের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম জাতির ইতিহাস লেখা

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যে দলটি সত্যিকার অর্থে ও পরিপূর্ণরূপে ঈমান গ্রহণ করেছিলো, তাদের স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ ও চিন্তা চেতনায় এই ঈমানের এক অভূতপূর্ব প্রভাব পড়েছে,

কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষের হৃদয়ে এই ঈমানের প্রভাব ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে এবং এমন একপর্যায়ে এসে পৌছে যখন তাদের আচার আচরণে ঈমানের প্রভাব বলতে আর কিছুই ছিলো না। তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে তাদের মাঝে পুনরায় ঈমানী চেতনা জাগ্রত করতে হবে, পুনরায় তাদের মাঝে ঈমানী প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে পুনরায় মানবতার নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

এই ঈমান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর গ্রন্থ 'মা যা খাছেরাল আলামু বে-এনহেতাতিল মুসলেমীন'-এ বলেছেন, 'যখন সবচেয়ে বড় সংকট অর্থাৎ শেরক এবং কুফরের সংকট কেটে গেলো, তখন মনে হলো সব সংকটই বুঝি কেটে গেলো। ওদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রথম জেহাদ পরিচালনা করেন। এরপর তাঁকে নতুন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে জেহাদ করতে হয়নি। প্রথম যুদ্ধেই ইসলাম জাহেলিয়াতর বিরুদ্ধে জয়ী হয়। এই বিজয় ইসলাম তার প্রতিটি যুদ্ধেই লাভ করতে থাকে। ফলে তারা মনে প্রাণে পরিপূর্ণ রূপে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। তখন তারা আর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেনি এবং তাঁর আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিলো না।

অবশেষে যখন তারা শয়তানের পথ থেকে বেরিয়ে এলো, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে আগত শয়তানের প্রভাব বলয় বা শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বেরিয়ে এলো, অথবা বেরিয়ে এলো তাদের নিজেদের পরস্পর পরস্পরকে অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করার প্রবণতা থেকে, তখন তারা সুবিবেচকের ভূমিকা গ্রহণ করে অন্য কারো সক্রিয় ভূমিকা ছাড়াই একে অপরের প্রতি সুবিচার করার কাজ শুরু করলো। এইভাবে দুনিয়াতে বাস করেও তারা আখেরাতমুখী লোকের আমল আখলাক গ্রহণ করলো। আগামীকাল কেমন হবে ও কী করবে সে সব চিন্তা করেই তারা আজকের দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করলো এবং ভূমিকা অবলম্বন করতে গিয়ে বিপদ আপদ ও বিরোধিতা কোনো কিছুরই পরওয়া করলো না। কোনো সম্পদের প্রাচুর্য তাদেরকে দাম্ভিক বানাতে সক্ষম হলো না। কোনো দুঃখ দৈন্য তাদেরকে মুষড়ে ফেলতে পারলো না, কোনো সচ্ছলতা তাদের সীমালংঘন করাতে পারলো না। কোনো ব্যবসা বাণিজ্য বা কাজ কারবার তাদেরকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারলো না বা তাদের শক্তি সামর্থ তাদেরকে অপরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বানাতে সমর্থ হলো না। তারা দুনিয়ায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে নিয়োজিত হলো না,বা কোনো উচ্ছৃংখলতার মধ্যেও গিয়ে তারা পতিত হলো না, বরং তারা দুনিয়ার জীবনের সকল কথা, কাজ ও ব্যবহারের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলো। এ দায়িত্ব পালনে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায় এবং তাঁকে সাক্ষী রেখে সুবিচার করতে গিয়ে নিজেদের ও নিজেদের পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে পর্যন্ত রায় দিতে কুণ্ঠাবোধ করলো না, এসব গুণ অর্জিত হওয়ার পর তারা মানুষের জন্যে নিরাপত্তা বিধানকারী হয়ে গেলো, জগদ্বাসী যাবতীয় ক্ষতিকর কাজ ও ব্যবহার থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো এবং এইভাবে তারা আল্লাহর দ্বীন এর আহ্বানকারী হওয়ার পূর্ণাংগ দায়িত্ব পালন করলো।

এই শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিদের সম্পর্কেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানিয়েছেন যে, তাদের চরিত্র ব্যবহার ও আবেগ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঈমানের সঠিক রূপ ফুটে উঠেছে। এই মহৎ ব্যক্তিদের সম্পর্কেই মন্তব্য করা হয়েছে,

'এমনই এক যামানায় নবী (স.)-এর আগমন হয়েছে, যখন আরব আজম সবখানেই মানুষ জাহেলী জীবন যাপন করতো যাদের কাজ কথা ও ব্যবহারে কোনো যুক্তি ছিলো না। 'জোর যার মুল্লুক তার' ছিলো তাদের সাধারণ নিয়ম।

তারা সৃষ্ট সকল কিছুরই পূজা করতো। অর্থাৎ তাদের সামনে সেজদা করতো এবং তারা নিজেদের স্বাধীন ও লাগাম ছাড়া ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করতো, ভালো কাজের জন্যে পুরস্কার দান, মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি বিধান করা, ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা-এসব ব্যবস্থা কোথাও চালু ছিলো না। তাদের জীবনের জন্যে আইন-কানুন যা ছিলো তা এমনই ভাসা-ভাসাভাবে ছিলো যে, সমাজে কেউ তার তেমন গুরুত্ব দিতো না। তাদের মনমগয, চিন্তা ও বাস্তব কাজ কর্মে তাদের চরিত্র বা তাদের সমাজ জীবনেও এসব আইন কানুনের কোনো গুরুত্ব বা ক্ষমতা ছিলো না। তারা আল্লাহকে এইভাবে বিশ্বাস করতো যে, তিনি সৃষ্টি করে ব্যস তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেভাবে ইচ্ছা তারা চলুক এতে তাঁর কোনো দখল বা প্রয়োজন নেই। তিনি বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত এসব জিনিসের পরিচালনার ভার কিছুসংখ্যক ক্ষমতাবান ও আইন রচনাকারী দায়িত্বশীলদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন, যাদের হাতে তিনি তাদের খুশীমতো নিয়ম কানুন বানানো ও সেই অনুযায়ী দেশ ও দশকে চালানোর দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। যার ফলে তারা হুকুমদান ও দন্ডবিধান করার ক্ষমতা পেয়ে গেছে, পেয়ে গেছে দেশ শাসন করার অধিকার, আরো পেয়ে গেছে সমাজ পরিচালনা ও মানুষের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব। এমনকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তৈরী ও পরিচালনা, বিধি-নিষেধ আরোপ করা ও শাস্তির বিধান প্রয়োগ সব কিছুরই ভার তারা পেয়ে গেছে। এ জন্যে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ছিলো, এটা একটা ইতিহাসের ঘটনা হিসাবেই শুধু জানা যায়। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান যেন এমন যে, দয়া করে তাদের একথা মনে করা যে আল্লাহ তায়লাই আসমান যমীন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এটা অনেকটা ইতিহাসের কোনো একজন ছাত্রের জবাবের মতো ব্যাপার, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ইতিহাসের এ মহান অট্টালিকাটি কে বানিয়েছে? সে বলে, হাঁ, প্রাচীন কোনো এক বাদশাহ হয়তো এটাকে বানিয়েছে। এ কথা বলার সময় দেখা যায় সে কাল্পনিক নির্মাতা সম্পর্কে না আছে তার কোনো সমীহ বোধ, না আছে কোনো ভয়-ভীতি, আর না তারা কাছে নতি স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করে। এমতাবস্থায় সে নির্মাতার প্রতি তার ভক্তি-বিশ্বাস যা আছে তা হচ্ছে, আনুগত্যবোধহীন একটি মানসিক অবস্থা। আসলে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ কোনো বুঝ নেই। যে যেভাবে ভালো মনে করে সেভাবেই সে তাঁকে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বা বুঝ হচ্ছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য এক অনুভূতি। তারা তাঁকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে এবং এজন্যে তাঁর জন্যে না আছে তাদের কোনো ভয় ভীতি, আর না আছে কোনো ভালোবাসা।

আরব জাতির লোকেরা এবং যারা তাদের এই মুর্দা ও অস্পষ্ট ধারণা ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গভীর এমন একটা অনুভূতি পেয়েছিলো যা তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের গোটা সত্ত্বাকে আন্দোলিত করেছিলো, তাদের চরিত্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে, তাদের সমাজ নতুনভাবে গড়ে ওঠে জীবনে তারা নতুন আলো পেয়েছে এবং তাদের জীবনে এক অকল্পনীয় গতিধারা প্রবাহিত হয়েছে। তারা আসমান যমীন সম্বলিত গোটা বিশ্বচরাচরের সেই মালিক মনিব প্রভু ও প্রতিপালক– তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেছে। যিনি পরম করুণাময়, চাইলেও দেন, না চাইলেও যিনি মাহরুম করেন না। তাঁর অপরাধী বান্দাদের প্রতিও তিনি তেমনি মেহেরবান, যেমনি মেহেরবান তার মোমেন বান্দাদের প্রতি। যিনি রোজ হাশরেরও মালিক। যিনি বাদশাহ শাসনকর্তা, যিনি সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র, যিনি

শান্তিময় যিনিই একমাত্র সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বস্ত, যিনি নেক ও বদ সব প্রকৃতির মানুষের জন্যে অতন্দ্র প্রহরী, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি শক্তি প্রয়োগে তাঁর বিধান চালু করতে পারেন, একমাত্র যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকারী, যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা। যিনি সকল কিছুর সূত্রপাত করেছেন, মহা বিজ্ঞানময়, মাফ করার মালিক, যিনি (মোমেনের জন্যে) বড়ই নরম এবং তাদের জন্যে বড়ই মেহেরবান। সৃষ্টি তাঁর, হুকুম দেয়ার মালিকও একমাত্র তিনি, তাঁরই হাতে নিবদ্ধ সকল ক্ষমতা, তিনি আশ্রয় দেন, তাকে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না। এভাবে আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর শক্তি-ক্ষমতার অসংখ্য গুণের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তিনি জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে নেক লোকদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত যারা তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তিনি পরম করুণাময় প্রতিপালক, তিনি যার জন্যে খুশী তার জন্যে তাঁর রেযেকের ভান্ডারকে প্রশস্ত করে দেন, আর যার জন্যে খুশী তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেন। এটা কখনো যুক্তিহীন বা এলাপাথাড়িভাবে দেয়া হয় না। কখনও এমন হতে পারে না যে, যার জীবন তাঁরই জন্যে নিবেদিত তিনি তাকে কষ্টের মধ্যে রাখবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভে যার জীবন উৎসর্গীকৃত, তাকে যদি তিনি কখনও কিছু কম দেন বা কষ্টের মধ্যে রাখেন অথবা সমস্যা জর্জরিত করেন তা অবশ্যই তারই এমন কোনো কল্যাণের জন্যে, যা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্যেই বলা হয়েছে, এটা একান্ত তাঁরই ব্যাপার।(১)

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গোপন রহস্যরাজি তিনিই জানেন। তিনিই জানেন খেয়ানতকারী চোখগুলোকে এবং সেই সব তথ্য যা বুকের মধ্যে গোপন রয়েছে।' এইভাবে মহা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাঁর শক্তি ক্ষমতাবাহী নিদর্শনাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা ও সর্ব বিজয়ী জ্ঞানের কথা। এ দেখে শুনে মোমেনদের অন্তরের মধ্যে একটি অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়। তার অন্তর প্রাণ প্রশস্ত, গভীর ও সুস্পষ্ট ঈমানের নূরে ভরে যায়, আর তখনই আল্লাহর ওপর ঈমানের ঘোষণা দিতে গিয়ে তারা বলে ওঠে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই ঘোষণার সাথে সাথে তাদের জীবনে অভূতপূর্ব এক পরিবর্তন নেমে আসে, তখন তাদের অন্তরে অবস্থিত গোপন গভীর বিশ্বাসকে তারা প্রকাশ করে দেয়। তাদের গোটা শরীর ও মনের মধ্যে, এমনকি তাদের অন্তরের গভীরে পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করে। তাদের গোটা সত্ত্বা ঈমানের রংগে রঞ্জিত হয়। তাদের শিরা-উপশিরায় এবং তার সকল চেতনা ও ধমনীতে ঈমানের সংগীত বাজতে থাকে। এই ঈমানই তাদের আত্মা ও সকল স্নায়ুমন্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। সাথে সাথে তাদের গোটা অস্তিত্ব থেকে জাহেলিয়াতের সকল জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভ্রান্ত সকল মতবাদের শেকড় উৎপাটিত হয়ে যায়। এই পবিত্র কালেমার মধুর পরশে বুদ্ধির বিভ্রান্তি ও অন্তরের সকল প্রকার জটিলতা দূর হয়ে যায়, এসময় তারা একজন নতুন মানুষে পরিণত হয়ে যায়। তাদের গোটা অস্তিত্ব থেকে ঈমানের ঝলক নির্গত হতে থাকে, তাদের মধ্যে নিশ্চিত ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস, অবিচলতা ও বাহাদুরী জন্ম নেয়। তাদের কাজ ও চরিত্রের মধ্যে এমন সব

---

(১) দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদ যদি আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে আসে, তা আসে দুই কারণে, এক. যদি নিজের কাজ, ব্যবহার বা পরিকল্পনার কোনো ক্রটি থাকে। দুই. তা আসে পরীক্ষাস্বরূপ, যেমন সূরায়ে বাকারা ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষা করবই করব তোমাদেরকে.......... অতএব, সুসংবাদ দাও সবরকারীদেরকে........... তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।' এজন্যে সত্যিকার মোমেন সেই ব্যক্তি যে প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের কাজের হিসাব করে। তাতে যদি ভুল ধরা না পড়ে তাহলে সবর ও সালাতের মাধ্যমে বিপদমুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। সে সাহস হারায় না ও হতাশ হয় না, মনও খারাপ করে না। সে বিশ্বাস করে, এজগতে সে প্রতিদান না পেলেও অবশ্যই সে আখেরাতে পাবে।

অলৌকিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা সকল দর্শন ও চরিত্রের ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়। এমনি করে চিরদিন এ কালেমার মহিমা ও অলৌকিক মহিমা অম্লান থাকবে।

কিন্তু আমাদের যামানায় দেখা যাচ্ছে আল্লাহর প্রতি সঠিক ও গভীর ঈমানের অভাবে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের জীবনে সঠিকভাবে কল্যাণ দান করতে পারছে না।

ঈমান এমন একটি শিক্ষক এবং এমন একজন প্রশিক্ষক যা মানুষের অন্তরে দৃঢ়তা, কর্মস্পৃহা, উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যবোধ আনে, এই বলিষ্ঠ শক্তিই মানুষকে ন্যায়বিচারক, সুবিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ বানায়। ঈমানের এই শক্তিই মানুষকে নৈতিক অধঃপতন ও হিংস্রতা থেকে বাঁচায়, উন্নীত করে তাকে পশুত্বের স্তর থেকে মহান মানবতার স্তরে। নীতি নৈতিকতার ক্ষেতে ঈমানের অবদান অবিসংবাদিত। মানুষ যখন ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে থাকে, যখন সংগোপনে এমন এমন জঘন্য কাজ করে যা সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। যেহেতু সেসব কঠিন অপরাধ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে সংঘটিত হয় এবং কোনো মানবীয় বুদ্ধি যেখানে তদারক বা ধরপাকড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, সেখানে একমাত্র ঈমানী শক্তিই এগিয়ে আসে সেই পতানোম্মুখ মানবতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। তখন আল্লাহর প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহ অদৃশ্যে থেকে তার সকল কাজ ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন-এই চেতনা তার বিবেককে দংশন করতে থাকে, তার মধ্যে জবাবদিহির এমন ভয় জাগায়, যা কোনো আইন কানুনের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপস্থিতির চেতনা তথা ঈমান এমন এক রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে যে, তার পক্ষে কোনো অন্যায় ও নীতিবিরোধী কাজে আর অধিক্ষণ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। এই ঈমানী চেতনাই তার মধ্যে জবাবদিহির চিন্তা জাগিয়ে দেয় এবং এরই কারণে সে আল্লাহর আক্রোশ ও আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দোষ স্বীকার করে শরীয়তের যে কোনো শাস্তিকে মাথা পেতে নেয়।

এই ঈমানই তাকে মানুষের দেয়া আমানতের হক আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাকে মানুষের ইযযত ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে বাধ্য করে, যদিও অন্যায় চরিতার্থ করার অনেক সুযোগ সে পায় যদিও অত্যাচার করে সেরে যাওয়ার নিশ্চয়তাও হয়ত তার থাকে, যদিও সে বুঝে যে তার অন্যায় আচরণ কেউ দেখবে না এবং দুনিয়াতে কারো কাছে তার জবাবদিহিও করা লাগবে না; তবুও ঈমানের দাবী, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অন্যায় কাজ ও মানুষের মনে ব্যথা দেয়া এবং তাদের হক নষ্ট করা থেকে তাকে বিরত রাখে। অনেক সময় মানুষ অনুভব করে যে, সে অন্যায় করলে তার শক্তি ক্ষমতার বলয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না বা তাকে কেউ ধর-পাকড়ও করতে পারবে না। সে আমানতের খেয়ানত করলেও কেউ তার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে পারবে না। সেখানে ঈমানের অনুভূতিই তাকে সেসব অন্যায় থেকে বাঁচায়। ইসলামী যুদ্ধের বিজয়ের ইতিহাসে গণীমতের মাল গ্রহণ করার ব্যাপারে যে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। আমানতের মাল তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়ার যে নযির স্থাপিত হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে কাজ করার যে নমুনা তার মধ্যে দেখা গেছে, তার তুলনা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে আর নেই, আর এটাই ছিলো খাঁটি ঈমান, আল্লাহর তদারকী ও সর্বদা এবং সর্বত্র তাঁর উপস্থিত থাকার চিন্তা ও বিশ্বাসেরই ফসল।

এই ঈমান আনার পূর্বে তৎকালীন আরব অনারব সকলেই তাদের কাজ আখলাক, ব্যবহার, লেনদেন, গ্রহণ বর্জন এবং রাজনীতি ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের মধ্যে জীবন যাপন করছিলো। সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিলো না, কোনো শাসকের আনুগত্য কেউ করতো না, না ছিলো কোনো নিয়ম শৃংখলা, না তাদের মধ্যে ছিলো এক সূত্রে গ্রথিত হওয়ার বা

প্রথিত থাকার কোনো উপায়। প্রবৃত্তির দাসত্ব ও অন্ধ অনুকরণ করা এটাই ছিলো তাদের নিত্য দিনের বৃত্তি। কারও অন্ধ অনুকরণ এবং এলোমেলো জীবন যাপন করা ছাড়া কোনো এমন কেন্দ্রীয় আইন শৃংখলা সেখানে বর্তমান ছিলো না, যার মাধ্যমে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারতো। এমনই এক বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহর রসূল (স.) এসে তাদেরকে এক নিয়ম শৃংখলাপূর্ণ জীবন যাপন করানোর জন্যে ঈমানের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইলেন। যারা স্থায়ীভাবে কারো আনুগত্য করতে অভ্যস্ত ছিলো না, তাদেরকে এমনভাবে আল্লাহর দাসত্ব করতে আহ্বান জানালেন যে, সে দাসত্ব গ্রহণ করার পর সে দাসত্ব বন্ধন থেকে আর কারও বের হওয়া যাবে না। এমনকি নিজের নফসেরও দাসত্ব করা যাবে না। আহ্বান জানালেন তাদেরকে তাদের সত্যিকার সৃষ্টিকর্তাকে বাস্তবে বাদশাহ ও শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইনদাতা হিসাবে মেনে নিতে, একমাত্র তাঁকেই হুকুমদাতা ও নিষেধকারী হিসাবে মানতে শেখালেন। তাদের জন্যে তাঁর পরিচালনা, দাসত্ব ও নিরংকুশ বাধ্যতামূলক করে নিতে আনুগত্যকে এবং তাদেরকে পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। রসূল (স.) তাদেরকে আহ্বান জানালেন যেন তারা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দায়িত্বভার আপন তুলে দেয় এবং তাদের ইচ্ছামত চলার খাহেশ ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাংখা ও আমিত্বকে পুরোপুরিভাবে তাঁর হাতে সোপর্দ করে নিজেদেরকে তাঁর এমন দাস বানিয়ে দেয়, যাদের নিজস্ব মালিকানা বলতে কিছু থাকবে না, থাকবে না তাদের অর্জিত অর্থ সম্পদের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব। তারা মেনে নেবে যে, অর্থ সম্পদ যেখানে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। সেই সম্পদ থেকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে আহরণ করা এবং যেভাবে খুশী সেইভাবে ব্যয় করার অধিকার তাদের নেই, মানুষ বলতে পারবে না, 'এ জীবন আমার, এ জীবনকে যেভাবে খুশী আমি ব্যবহার করবো।' সব কিছুর ব্যাপারে তাঁকেই মালিক মেনে নিতে হবে। জীবন থেকে নিয়ে যা কিছু আছে, সন্তান সন্তুতি ধন-মান-সহায়-সম্পদ, বিষয়-আশয়-সব কিছু আল্লাহর, এসব কিছুকে তাঁরই ইচ্ছামত ব্যয় করতে হবে, তাঁরই রেজামন্দির পথে সবাইকে ও সব কিছু চালাতে হবে। যুদ্ধ সন্ধি, বন্দী বিনিময়, আদান প্রদান কারো সাথে রাগ করা বা কারো প্রতি খুশী হওয়া, কাকে দেয়া যাবে, কাকে দেয়া যাবে না, নামায কখন পড়বে, কখন পড়বে না– সবই তাঁর বিধানমতো এবং হুকুম অনুযায়ী করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে এইভাবেই আল্লাহর কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে এবং তাঁকে জীবন ও যৌবন এবং ধন মান সব কিছুর নিরংকুশ মালিক বলে মেনে নেয়ার নামকেই বলা হয়েছে ঈমান। এই ঈমানের দাবী হচ্ছে আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁরই ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআন তাওয়াক্কুলের এ গুণটিকে যেকের বা আল্লাহর স্মরণের সাথে একটু স্বতন্ত্র করে বর্ণনা করেছে এবং এইভাবে এই গুণটির মূল্য দিয়েছে বেশী। যেমন বলছে,

'আর তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে।'

এইভাবে বাক্য গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে এ শব্দটিকে কখনও আগে আনা, আর কখনও পরে আনার মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, তাওয়াক্কুল একমাত্র আল্লাহর ওপরেই করতে হবে, আর কারও ওপর নয়। একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবী হচ্ছে শুধুমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করা, অন্য কারো ওপর নয়। তাওহীদের যতো দিক বা যথ রূপ আছে, তার মধ্যে এইটিই হচ্ছে প্রথম রূপ। অবশ্যই একজন মোমেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে, তাঁর সকল গুণের ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে, এই বিশ্ব চরাচরে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কোনো কিছুই করতে পারে না, আর তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। এইভাবে

সব কিছুকে একমাত্র তাঁর তাওয়াক্কুলেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়। ঈমানের আরও দাবী হচ্ছে একজন মোমেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয় না এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কাউকে পরিত্যাগও করে না।

মানবজাতির নেতা হিসেবে মোমেনদের কিছু বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনা থাকা একান্ত জরুরী, এর ফলেই সে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের বহু দাবীদারদের সামনে তার মাথা নত করবো না। তার অন্তর থাকবে নিশ্চিত লির্লিপ্ত নির্ভিক। সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছু পাওয়ার আশা রাখবে না বা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয়ও করবে না। দুঃখ দুর্দশা ও দীর্ণ দশার মধ্যে সে একজন বলিষ্ঠ সৈনিকের মতোই অবিচল থাকবে এবং শান্তি-সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিনগুলোতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরা মন নিয়ে সে থাকবে হৃষ্টচিত্ত। নেয়ামত ভরা সুদিনের নাগাল পেয়ে সে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যা খুশী তাই করবে না, তেমনি দুঃখভরা দুর্দিনের আগমনে কষ্টের বোঝা বইতে না পেরে নিজেকে মুষড়ে পড়তে দেবে না। তবে একজন নেতা বা পরিচালকের জন্যে তাওয়াক্কুলের এই বলিষ্ঠ গুণটি আরও বেশী জরুরী, কেননা সে সত্য সন্ধানীদের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করে থাকে। এরপর বলা হচ্ছে,

'আর যারা বড় বড় গুনাহ এবং লজ্জাকর কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকে।'

যে সমাজে লোভ লালসার প্রতিযোগিতা চলছে, যেখানে ইন্দ্রিয়লিপ্সার হাতছানি মনকে উদাস করে দেয়, যেখানে অসংখ্য লোভনীয় বস্তু হৃদয়কে প্রলুব্ধ করে সেখানে সত্য সন্ধ একদল আদম সন্তান সকল কিছুর আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করে বড় বড় অপরাধজনক কাজ ও লজ্জাকর আচরণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে এটা বড় চাট্টিখানি কথা নয়, নয় এটা কোনো সহজ ব্যাপার। এর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

বলিষ্ঠ ঈমানের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এটা অবশ্যই একটা লক্ষণ যে মানুষ কবীরা গুনাহসমূহ ও লজ্জাকর যাবতীয় আচার আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচায়। আর সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তারাই বহন করতে পারে যারা অন্যান্য গুণ সমষ্টির সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে উপরোক্ত গুণ দুটিরও অধিকারী হয়। কোনো ব্যক্তি কবীরা গুনাহ বা পার্থিব জীবনের এমন কোনো অন্যায় কাজ, যার দ্বারা নিজ স্বার্থের কারণে অপরকে কষ্ট দেয়া হয় এই ধরনের অপরাধের মুখোমুখী হয়ে যদি ঈমানের দাবী অনুযায়ী কেউ তার অন্তরকে সাফ ছুতরা বা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন না রাখতে পারে তাহলে সত্যসন্ধানী জামায়াতের নেতৃত্বে সে (বেশী দিন) টিকে থাকতে পারে না বা সঠিকভাবে নেতৃত্বও দিতে পারে না।

সেই যামানায় একটি মোমেন জামায়াতের অন্তর যারা ওপরে উল্লেখিত গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, বিশেষ করে রসূল কর্তৃক পরিচালিত একদল লোকের মধ্যে যারা সেই উন্নত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, যার দিকে এই মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রথম দলটি উল্লেখিত গুণাবলীর পুরোপুরি অধিকারী হওয়ায় সমগ্র মানবমন্ডলীকে পরিচালনা করার যোগ্যতাও তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন যোগ্যতার অধিকারী তাঁরা হয়েছিলেন যে তাঁদের পূর্বে বা পরে অনুরূপ যোগ্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ নশ্বর মানব সৃষ্টির দুর্বলতা জানেন। এজন্যে তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন নেতৃত্ব দান করার জন্যে কোন কোন গুণের প্রয়োজন। তিনিই জানেন এর কোনো কোনো গুণ তিনি তাকে দিয়েছেন। সে গুণগুলো হচ্ছে বড় বড় গুনাহ, লজ্জাকর স্বভাব ও কাজকর্ম

থেকে দূরে থাকা। এই পরিহারযোগ্য দোষের মধ্যে ছোট ছোট গুনাহ ও সাধারণ অপরাধকে গণ্য করা হয়নি। আল্লা সোবহানাহু ওয়া তায়ালার মেহেরবানীর ভান্ডার এতো প্রশস্ত যে সেখানে এসব ছোটো খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ও মামুলি অপরাধগুলোকে গোনা হয় না, কারণ তাঁর বান্দার শক্তি-সামর্থ ও দুর্বলতা তাঁর থেকে বেশী আর কে জানে। বান্দার মধ্যে লজ্জানুভূতি থাকা-এটা তার নেককার বান্দার জন্যে আল্লাহর দেয়া এক বিশেষ মেহেরবানী। এ গুণটি তাকে দেয়া একটি মোহনীয় আকর্ষণ। উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু না থাকলেও এই গুণটিই তাকে সবার মাঝে প্রিয় করে তোলে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে প্রদত্ত বান্দার প্রতি উদারতা ও মহানুভবতা যেখানে মানুষকে লজ্জাবনত বানায়, সেখানে তাঁর ক্ষমাশীলতা মর্যাদাবান মানুষের মধ্যে লজ্জাবনত ভাব আনে। এর ফলে 'যখন তারা রেগে যায়। (প্রতিশোধ না নিয়ে) তারা মাফ করে দেয়।'

করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষের ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি ও ভুল ভ্রান্তি ধরবেন না বলে আলোচ্য আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ইশারা দিয়েছেন এবং তার পরপরই তাদের মধ্যে যে ক্ষমাশীলতার গুণটি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যে আল্লাহ রব্বুল ইযযত বান্দাদের মধ্যে দয়া প্রদর্শন ও ক্ষমা করার গুণটি খুবই পছন্দ করেন। আর এই জন্যেই মোমেনদের অন্যতম প্রধান গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে নাযিল করছেন,

'যখন তারা রাগ করে তারা মাফ করে দেয়।'

অর্থাৎ, রাগ করার পর ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর প্রশংসিত বান্দা হওয়ার মহান আশায় (কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই) তারা নিজেদের থেকেই মাফ করে দেয়।

এইভাবে এ মানুষের মাধ্যমে আর একবার ইসলামের মহানুভবতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। তার মহামূল্যবান শিক্ষা সমুজ্জ্বল হলো। ইসলাম মানুষকে এমন কোনো নির্দেশ দেয় না, যা পালন করা তার সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তিনিই সবার ও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কাজেই তিনি ভালো করেই জানেন যে, ক্রোধ মানুষের সহজাত এক স্বভাব, যা তার প্রকৃতির মধ্য থেকেই উদিত হয়। এই জন্যেই এ বৃত্তিটি সর্বদা এবং সর্বত্র মন্দ হতে হবে তা জরুরী নয়। এ জন্যে, আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের জন্যে), তাঁর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যই এটা এক বাঞ্ছিত গুণ, এরই মধ্যে যে কাজের জন্যে এর প্রয়োগ প্রয়োজন সেখানে তা করা হলে ক্রোধও একটি বড় গুণ বলে বিবেচিত হবে এবং সে অবস্থায় মোটেই তা হারাম বা কোনো অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। বরং অস্তিত্ব, তার প্রকৃতি ও তার স্বভাবের মধ্যে এ গুণটি তখন হবে অত্যন্ত কল্যাণবহ, তখন মানুষ ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা দ্বীনী কোনো ব্যাপারে বিরোধ বাধলে ক্ষমা করতে সক্ষম হবে। একই অপরাধে দেখা যায় একজন বে-ঈমান সেই বিষয়ে ক্ষমা করতে পারে না, যা একজন ঈমানদার ব্যক্তি পারে, কারণ ঈমানদার ক্ষমাশীলতাকে একটি দৃষ্টান্তমূলক সওয়াবের কাজ মনে করে। মনে করে এ গুণটি ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ, যেহেতু রসূল (স.) থেকে সে জানতে পেরেছে যে, তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে কখনও কারও ওপর রাগ করেননি। তিনি আল্লাহর জন্যে রাগ করেছেন, আর আল্লাহর জন্যে যখন তিনি রাগ করেছেন তখন তাঁকে কেউ থামাতে পারেনি। তবে এটা সত্য, মোহাম্মদ (স.)-এর জন্যে ছিলো এটা মহা উঁচু মর্যাদার স্তর, তাঁর মতো ধৈর্যশীল ও ক্ষমা করার যোগ্যতা আর কারো আসবে না এবং আল্লাহ তায়ালাও অন্য কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাছে সে পরিমাণ ক্ষমাশীলতা দাবীও করেন না। তিনি সাধ্যের বাইরে কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দেন না, কেউ ইচ্ছা করলেও তাঁর মতো ক্ষমাশীল হতে পারবে না, এ জন্যে মোমেনদের জন্যে হুকুম হচ্ছে,

রাগের সময় সাধ্যমতো ক্ষমা করার চেষ্টা করে যাবে এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেবে।'

এইভাবে মোমেনরা তাদের ও তাদের রবের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্ক স্থাপনের গোপন বাধা বিপত্তিগুলোকে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলো। আসলে মানুষে মানুষে এবং মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পথে ক্রোধ অবশ্যই একটি বড় বাধা। কাজেই বাস্তবেও দেখা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বান্দার ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাস, ব্যক্তিগত রুচি, ক্রোধ ও উত্তেজনা অনেক সময় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে বাইরের বাধা যাইই থাকুক না, ভেতরের বাধাও কিছু কম নয়। মানুষের নানাপ্রকার ঝোঁক প্রবণতা আছে, আছে লোভ লালসা, আছে অলসতা ও শয়তানী প্রবণতা। আছে আত্মম্ভরিতা, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ক্রোধ এসব কিছুই মানুষের অস্তিত্বের সাথে জড়িত। এগুলোর আকর্ষণ থেকে যখন মানুষ মুক্ত হতে পারে তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সকল পথ তার সামনে খুলে যায়, আর তখনই সে নির্বিঘ্নে তার মালিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়, সে তখন তার মালিকের সকল আহ্বানে সাড়া দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কোনো নির্দেশ পালন করার ব্যাপার তার আভ্যন্তরীণ কোনো বাধা আর তাকে থামাতে পারে না। এইভাবে সাধারণত মানুষ তার রবের আনুগত্য করে থাকে। এবারে সুনির্দিষ্টভাবে আনুগত্যমূলক কিছু বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে,

'আর তারা নামায কায়েম করে।'

এই পবিত্র দ্বীন ইসলামের মধ্যে নামাযের স্থান অতি উচ্চে। যখন কোনো ব্যক্তি কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই তার ওপর শাহাদাতের বাস্তব প্রমাণস্বরূপ এই প্রথম হুকুম এসে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হওয়ার যে ঘোষণা সে কথা আকারে দিয়েছিলো সেটাকে বাস্তব কাজ রুকু-সেজদার মাধ্যমে প্রমাণিত করে এসব ক্রিয়ার মাধ্যমে সে জানায় যে সবাইকে ছেড়ে, সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠভাবে সে তার ব্যক্তি সত্ত্বার সর্বোচ্চ অংগ-মাথাকে আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঘোষণা দেয়। বান্দা তার মনিবের দরবারে এসে হাযির হয়। এইভাবে রবের সাথে আবদ এর (বান্দার) সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারপর মোহাম্মদ (স.) স্বীকৃতি দেয়া হয় আল্লাহর রসূল হিসাবে 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' উচ্চারনের মাধ্যমে। এক কাতারে দাঁড়ানো এবং একই সাথে রুকু সেজদার মাধ্যমে মানুষের সাম্য ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে কেউ কারও আগে বা পরে মাথা উত্তোলন করে না। আর হয়তো এই সাম্যের কথা বলতে গিয়েই যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একামাতে সালাতের পর শূরা বা পরামর্শ করার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদের কাজ হবে তাদের নিজের মধ্যে পরামর্শভিত্তিক।'

এখানে ব্যাখ্যায় এ কথাই আসে যে, তাদের জীবনের সকল কাজই পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। সবখানেই এই পরামর্শের রং ছড়িয়ে পড়বে। জানা যায় যে এ সূরাটি মক্কী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, সুতরাং এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আরও বেশী গুরুত্ব সহকারে

মুসলমানদের জীবনের সর্বত্র পরামর্শের এ ধারা চালু হতে হবে। যদিও পরবর্তীতে ঠিক সেই অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র আর কায়েম হয়নি, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন-এর আমল পর্যন্ত চালু ছিলো।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে ইসলামী রাষ্ট্রের বহু বৈশিষ্ট্যই ইসলামী জামায়াতের মধ্যে বর্তমান থাকে নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়া ইসলামী জামায়াতের মধ্যে অন্যান্য সকল রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এ জন্যে সেখানে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত তেমনি করেই নিতে হবে যেমন মক্কী স্তরে রাষ্ট্র পাওয়ার আগে নেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী জামায়াতের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের এমন বহু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যেসব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনো কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকুক আর নাই থাকুক, যেখানে ইসলামী জামায়াত থাকবে সেখানে জামায়াতী সকল সিদ্ধান্তই পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। আর এই জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য সূরাটি নাযিল করা হয়েছে এবং এর মধ্যে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে পরামর্শ করা যতো জরুরী, তার থেকে বেশী জরুরী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকাবস্থায় পরামর্শ করা। এ ব্যাপারে আলোচ্য সূরাতে সুস্পষ্ট হুকুম নাযিল হওয়ায় ওপরের কথাটি আরও অধিক প্রামাণ্য বলে বুঝা যায়। ইসলামী জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ কথার গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনার জন্যে যে জামায়াতকে পছন্দ করা হবে, তার জন্যে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার গুণটি থাকা এক বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে বরং পরিচালক হওয়ার জন্যে এ গুণটি অপরিহার্য।

শূরার (বা পরামর্শ সভার) মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত এমন কোনো স্থির ও স্থায়ী বস্তু নয় যে, কোনো ইস্পাত কঠিন ফর্মার মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে নির্মাণ হয়েছে, যার পরিবর্তন খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বিশেষ কোনো যামানার কিছুসংখ্যক লোক কর্তৃক বিশেষ কোনো পরিস্থিতির আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এ জন্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা যেন কোরআন হাদীসের অকাট্য সিদ্ধান্ত বিরোধী না হয়, সে দিকে খেয়াল রেখে পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগণের প্রয়োজনে পরামর্শভিত্তিক যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার দ্বার চিরদিনের জন্যে খোলা রয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এমন স্থূল বস্তু নয়, নয় কোনো প্রাণহীন ও যুক্তিবিহীন শব্দসমষ্টি, যা শুধু কথা আকারেই থেকে যাবে, বরং এ জীবন ব্যবস্থা সত্য নিষ্ঠ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যে মানুষের করুণাময় মালিকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বাধিক কল্যাণকর ব্যবস্থা যা মানুষের হৃদয়ে ঈমানের এক প্রশ্রবণ প্রবাহিত করেছে, যারা এ প্রশ্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান করেছে তারা এর মাধুর্যে আপ্লুত হয়েছে। তাদের চেতনা ও ব্যবহারিক জীবন এ ব্যবস্থার মনোহর রং-এ রঞ্জিত হয়ে গেছে।

বিশেষ কোনো চিন্তা ভাবনা না করে এবং আন্তরিকতার সাথে ও গভীরভাবে ঈমানের তাৎপর্য পর্যালোচনা না করে ইসলামের যে এলোপাথাড়ি সমালোচনা করা হয় বা এর সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা হঠকারিতাপূর্ণ উক্তি করে, তারা অবশ্যই কোনো ভালো কাজ করে না। তাদের বুঝা দরকার যে, ইসলামী ব্যবস্থা, ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন কোনো ভাসমান কথাসমষ্টি নয়। যারা ইসলামী আকীদা অনুযায়ী ঈমানের তাৎপর্য বুঝে না তাদের কাছে হঠাৎ করে মনে হয় যেন এ ব্যবস্থার পেছনে বুঝি কোনো যুক্তি বুদ্ধি নেই। অতএব জেনে রাখা দরকার যে, এ আকীদার মূলে রয়েছে এমন গভীর ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস যা মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই আকীদার

ভিত্তিতেই এক শৃংখলাপূর্ণ সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রশ্ন হতে পারে এর মধ্যে এমন কোনো নিয়ম কানুন আছে যা মানুষের মন মানসিকতাকে প্রভাবিত করে, যা যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা ও বাস্তব অবস্থার নিরিখে সবকিছুকে জীবনের উপযোগী করে পেশ করে এবং কোন উপায়ে মানুষকে তা বশীভূত করে ফেলে। হ্যাঁ এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছে যেহেতু ইসলামের সকল হুকুম আহকাম সবই মানুষের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ ব্যবস্থা মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করতেই এসেছে। এজন্যে ইসলামী ব্যবস্থা চালু হলে যেসব জটিলতার উদ্ভব হতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায়ে এবং এমন যুক্তিসংগতভাবে সেগুলোর সমাধান দেয়া হয়েছে যা মানুষ বুঝতে পারে এবং যার বাস্তবতা ও উপকারিতা মানুষ তার জীবনেই অনুভব করতে পারে। এই জন্যে পরামর্শের সুযোগ ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর এমন সব আয়াত এবং রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে এমন সব হাদীস এসেছে যা সেসব সমস্যার সমাধানের দিকে ইংগিত করেছে। এ জন্যে দেখা যায়, কোনো ইসলামী সংগঠন এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না যা একদম আনকোরা এবং যার সাথে কোরআন হাদীসের কোনো সংযোগ নেই। ইসলামী সংগঠন কোরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে যখন পরামর্শ করে তখন অবশ্যই তারা দেখতে পায়, অতীতের মুসলমানদের মধ্য অনুরূপ কিছু সমস্যা ও তার সমাধান কিভাবে এসেছে, দেখা গেছে ইসলামী সংগঠনের মধ্যে নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের অস্তিত্ব, যা সকল যামানাতেই বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বোধ রেখে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছে। এটা যদি না হতো তাহলে মানুষের জীবন অচল হয়ে যেতো এবং সঠিক সমাধান দিতে না পারার কারণে মানুষ ইসলামের কার্যকারিতা সম্পর্কে হতাশ হয়ে এ মহান ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতো। কিন্তু দুনিয়া দেখে নিয়েছে, অতীতে যেসব দেশে বা অঞ্চলে ইসলামী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সে সকল স্থানে শূরা বা পরামর্শ সভার মাধ্যমে ইসলাম সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিভাবে এবং কোথেকে ইসলাম এই সত্য সঠিক ব্যবস্থা পেলো? কোথেকে পেলো মানুষ এর সঠিক সন্ধান? এর জওয়াব হচ্ছে, ইসলামী ব্যবস্থা যখন এসেছে তখন সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি এ ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এর উপযোগিতা প্রচার করেছে এবং নিজের জীবনকে ইসলামের এক বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করেছে। তখন ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। অতপর এক মুসলিম জামায়াত এর আওতাভুক্ত হয়ে এর থেকে নিজেদের জীবনের সমাধান নিতে থেকেছে। এই ভাবে তারা বাস্তবে জানিয়ে দিয়েছে যে, এইটিই একমাত্র ব্যবস্থা যা সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যা কিছু রেযেক তাদেরকে আমি, মহান আল্লাহ দিয়েছি, তার থেকে ওরা খরচ করে।'

যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মক্কী যিন্দেগীতে এই ভাবে মানুষকে সাহায্য করার জন্যে খরচ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াত মক্কী যিন্দেগীতে নাযিল হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা ও সুনির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করার নির্দেশ এসেছে দ্বিতীয় হিজরী সালে, কিন্তু ইসলামী জামায়াত গঠিত হওয়ার পর থেকেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেদনা প্রদর্শনের কাজ অনেক আগে থেকেই চলে আসছিলো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে দান খয়রাত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন যেন সমাজের সচ্ছল লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

দাওয়াতী কাজের জন্যে 'এনফাক' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা হয় এবং তার সাথে যদি কিছু খরচ বা ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়, তখন দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিবর্তন আসে। মন নরম হয়, মানুষ চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা দূর হতে থাকে। তখন দুনিয়াবী মহব্বত কমতে থাকে এবং আল্লাহর নেয়ামত লাভ করার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেহেতু ধন-সম্পদ-এর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাই তিনি সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তারতম্য রেখে দেখতে চান, কে তাঁর মহব্বতে এবং তাঁর ওপর ভরসা রেখে তাঁর বান্দার প্রতি দরদ দেখায়। এ জন্যে 'এনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'-এর মাধ্যমে ঈমানকে পূর্ণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়। মুসলিমদের দলবদ্ধ ঐক্যকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সচ্ছল লোকদের জন্যে 'এনফাক' বা দান খয়রাত করা অপরিহার্য। দলীয় জীবনের সংহতি বহুলাংশে এ উদার ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। দলীয় জীবনের অর্থই হচ্ছে দলের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি দরদী হবে, একের দুঃখ দূর করার জন্যে অন্যরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে এবং কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে পারস্পরিক একতার বন্ধনকে মযবুত বানাবে। আর এ বন্ধনকে ও দলীয় সংহতিকে তখনই পূর্ণত্ব দান করা সম্ভব হবে যখন দলের সদস্যদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো আকাশ পাতালসম অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না, যেমন ইসলামের প্রথম যুগে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর মোহাজের ও আনসারদের অবস্থার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকেনি। আনসাররা সে সময়ে কোনো চাপে পড়ে যে এইভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা নয়, বরং তাঁরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের মহব্বতে এবং গভীরভাবে আখেরাতের যিন্দেগীতে বিশ্বাস থাকার কারণে সেই ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যখন আল্লাহর মহব্বত দুনিয়া এবং দুনিয়ার যে কোনো জিনিসের ওপর বিজয়ী হলো এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যবহার তার প্রমাণ পেশ করলো তখনই তাদের ওপর যাকাত ফরয করার হুকুম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরী করার আদেশ নাযিল হলো।

সকল অবস্থাতেই আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দা-গোষ্ঠীর (মোমেন জামায়াতের) মধ্যে 'এনফাক' এমন একটি মহামূল্যবান গুণ হিসাবে বিরাজ করেছে, যার কারণে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে বিশ্ববাসীর নেতারূপে বরিত হয়েছেন।

যুলুম নির্যাতনের সময় প্রতিশোধ গ্রহণের মূলনীতি

এরপর আলোচনা এসেছে আন্দোলনবিরোধীদের অত্যাচারের স্বীকার হলে কখন কতোটুকু প্রতিশোধ নেয়া যাবে। সে সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশনা। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যখন তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হয়েছে তখন তারা তার বদলা নিয়েছে।'

আল কোরআনের মক্কী সূরাগুলোতে মুসলমানদের জন্যে এই প্রতিশোধ গ্রহণকেও এক বিশেষ গুণ এবং তাদের এক বিশেষ এবং তাদের এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে বহুস্থানে এসেছে। যুলুম করা হলে প্রতিশোধ নেয়ার এ গুণটিকে মুসলিম জামায়াতের মধ্যে সদা-সর্বদাই এক মৌলিক ও মহৎ গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা কোনো যুলুমকে মুখ বুঁজে সহ্য করবে না, যুলুমের কাছে মাথানত করবে না, তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে অবশ্যই তারা এর প্রতিশোধ নেবে। এর জন্যে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করবে। এটা সেই জামায়াতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনার জন্যে। এই যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে যেন তারা সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত হতে পারে, যেন তারা সকল ভাল

কাজের নির্দেশ দিতে পারে এবং নিষেধ করতে পারে সমস্ত মন্দ কাজ থেকে। এভাবে তারা যেন গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাদের এই ভূমিকাই আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'(দুনিয়ায়) সকল মান-ইযযত গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা।'

সুতরাং এ মুসলিম জামায়াতের প্রকৃতি এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যখনই তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে অথবা তাদের ওপর কেউ বাড়াবাড়ি করবে তখন তারা তার উচিত জবাব দেবে, যে কোনো বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপকে দমন করবে। তবে হাঁ, যতোদিন জবাব দেয়ার মতো পরিস্থিতি, শক্তি বা সামর্থ যোগাড় না হবে ততোদিন তারা সবর করতে থাকবে, যেমন মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে সবর করতে বলা হয়েছে, খাস করে আরবের প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে এই সবর-এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের প্রমাণ পেশ করতে হয়েছে এবং ট্রেনিং নিতে হয়েছে আল্লাহর পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার। তখন তাদেরকে সহ্য করার আক্রমণের জন্যে উদ্যত হাতকে থামিয়ে দেয়ার, নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আক্রমণ করা হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সহ্য করার এ নির্দেশটি ছিলো নিতান্ত সাময়িক। ইসলামী জামায়াতের জন্যে এটা কোনো স্থায়ী নিয়ম ছিলো না।

মুসলমানদেরকে মক্কী যিন্দেগীতে বিনম্র মেযাজের স্বভাব নিয়ে থাকা ও প্রতিপক্ষকে তাদের মধুর স্বভাব প্রদর্শন ও আল্লাহর মহব্বতে সহনশীল থাকার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝবার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এসবের মধ্য থেকে একটি জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদের এককভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে, দলীয়ভাবে বা মক্কী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে তাদের ওপর যে হামলা করা হয়েছে, তা নয়। আসলে তৎকালীন আরব-উপদ্বীপে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার বা শাসন ব্যবস্থা ছিলো না। আরব গোত্রগুলো এখানে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতো এবং প্রত্যেক গোত্রেরই ছিলো নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন, যা তারা মেনে চলতো। গোত্রীয় নেতা বা দলপতিরাই প্রকৃতপক্ষে ছিলো তাদের পরিচালক। আর এজন্যেই যেসব মানুষ কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দিতো, তারা বিশেষ করে সে ব্যক্তির নিজেরই পরিবারের বা গোত্রীয় লোক হতো। সাধারণভাবে এক গোত্রের কোনো লোককে অন্য গোত্রের কেউ হামলা করতে সাহসী হতো না, কারণ তাতে গোত্রীয় যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকতো। মতাদর্শ যার যাইই থাকুক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় সহায়তা পেতো। বিচ্ছিন্ন এক আধটা ঘটনা ছাড়া এমন কখনো হয়নি যে, নিজ গোত্রের বাইরে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তিদের এককভাবে বা দলীয়ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে, গোত্রপতি অথবা ব্যক্তিগতভাবে গোলামের মালিকরা তাদের দাসদেরকে অত্যাচার করেছে। কিন্তু মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে যখন কোনো মযলুম ব্যক্তিকে খরীদ করে আযাদ করে দিয়েছে তখন তার ওপর আর কেউ আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। আর রসূল (স.)ও চাননি যে, ঘরে ঘরে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যাক। বরং তিনি চেয়েছেন, কোনো কঠিন ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিবর্তে তাদের মধ্যে গড়ে উঠুক নরম ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার।

এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সেই সময়ে আরব দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এমনই ছিলো যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাধান্য ও গৌরব প্রদর্শন করা পছন্দ

করতো, হকপন্থী কোনো দুর্বল বা অসহায় ব্যক্তিকে পেলে, তার ওপর নির্যাতন চালানোর দ্বারা আমোদ উপভোগ করতো আর এ জন্যেই কোনো অসহায় বা দুর্বল মুসলমানকে পেলে তাকে অত্যাচারের টার্গেট বানাতো। বিশেষ করে যদি সে নিজ আদর্শের ওপর টিকে থাকার জন্যে দৃঢ়তা দেখাতো। এইভাবেই চলছিলো অসহায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। আর অনুমান করা হয় যে, সেই সময়ে অবরোধের যে ঘটনাটি ঘটেছিলো তাতে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সাথে বনী হাশেম গোত্রের মুসলমানরাও সেই অবরোধের মধ্যে ঘেরাও হয়ে একই ভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছে এবং মক্কার বাইরে 'শে'বে আবু তালেব'-এ গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আরব তথা মক্কার সেই গোত্রীয় আধিপত্যবোধ বা তাদের প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাবই তাদেরকে এমন নিষ্ঠুর অবরোধের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো। এ সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার কারণে তারা এতো বেশী হৃদয়হীন হতে পেরেছিলো, কিন্তু অবশেষে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠলো এবং সেই নিষ্ঠুর অবরোধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়ে গেলো, তারা ছিঁড়ে ফেলে দিলো সেই চুক্তিনামাটি যার ভিত্তিতে তারা মুসলমানদেরকে বয়কট করেছিলো এবং এইভাবে একটানা দীর্ঘ তিন বছরের সেই নিষ্ঠুর ও যুলুমপূর্ণ চুক্তি ভেংগে গেলো।

সেই জাহেলী যুগের অবস্থাটা ছিলো এই যে সারা আরব জুড়ে সদা-সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তরবারির ঝনঝনানি লেগেই থাকতো। তারা সবাই তাদের পেশী শক্তির গৌরব করতো, এ জন্যে তারা কোনো নিয়ম শৃংখলার কাছে মাথানত করতো না। এই অবস্থায় একমাত্র আল্লাহভীরু কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এই একগুঁয়েমী স্বভাবকে দমন করা সম্ভব ছিলো। সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা আল্লাহর পথ গ্রহণ করেছিলো, তারাই তাদের প্রাচুর্যকে কোনো এক লক্ষ্য অর্জনের পথে ব্যয় করতে পারতো, পারতো সকল প্রতিকূল অবস্থাতে সবর করতে, অপরকেও সবর করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো এবং তাদের পেশীশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো। একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিরাই যে কোনো আক্রমণের মুখে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে পারতো। এ জন্যেই যে কোনো কষ্টদায়ক ব্যবহারের সময়ে মুসলমানদেরকে সবর করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে, যা ইসলামী চরিত্রের অপরিহার্য একটি গুণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ইসলাম বরাবার প্রত্যেক মুসলমানকে শিক্ষা দিয়েছে যেন সে সর্বদা তার আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্যে মেযাজে ভারসাম্য আনে ও সর্বাবস্থায় সবর এখতিয়ার করে। এইভাবেই যেন সে, চরম বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে কদম না থামিয়ে দৃঢ়ভাবে নিজ লক্ষ্যপথে এগিয়ে যায়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে মক্কী জীবনে চলতে হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, যেন তারা কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলে এবং কোনো আক্রমণের জবাব না দিয়ে সবর এখতিয়ার করে। কিন্তু এটাও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এটা তাদের সাময়িক ভূমিকা, এটা অবশ্যই তাদের কোনো স্থায়ী নীতি হবে না। অবশেষে তাদেরকে যে নীতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তা হচ্ছে, অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হলে তাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আগ্রাসীদেরকে এমন সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে, যেন পুনরায় আক্রমণের সখ মিটে যায়। তাই এরশাদ হয়েছে,

'তাদেরকে যখন অন্যায় আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় তখন তারা সমুচিত জওয়াব দেয়।'

এই নীতি জীবনের সমস্ত ব্যাপারের জন্যেই প্রযোজ্য, যেমন বলা হয়েছে, 'কোনো অন্যায় আচরণের প্রতিদানে অনুরূপ আচরণই বাঞ্ছনীয়।'

প্রতিশোধ গ্রহণের এটাই মূল কথা, অর্থাৎ কঠীন আচরণের পরিবর্তে অনুরূপ কঠিন আচরণই হতে হবে, যেন অন্যায় কাজের প্রসার না ঘটে এবং অন্যায়কারী বে-পরওয়া না হয়ে যায়। তার

অন্যায় কাজের সমুচিত শাস্তি তাকে পেতেই হবে, যেন সে অহংকারী হয়ে আরও বেশী অন্যায় কাজ করতে না পারে। অন্যায়কারীকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় এবং কেউ যদি তাকে প্রতিহত না করে তাহলে তার অন্যায় কাজ ও নিষ্ঠুর আচরণ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তার দ্বারা অগণিত অকল্যাণ সাধিত হতে থাকবে এবং কোনো বাধা না পাওয়ায় নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলতে থাকবে, আর নিশ্চিন্তে চলতে থাকবে তার অনিষ্টকারিতা।

কিন্তু রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থায় মহানুভবতার এ সুযোগ রাখা হয়েছে যে যদি কেউ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় ক্রোধ সংবরণ করে এবং সংশোধনের পথ উন্মুক্ত করার অভিলাষে ক্ষমা প্রদর্শন করে, তাহলে অবশ্যই তা ভালো। এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তবে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে যে ক্ষমার প্রশ্ন তখন আসবে যখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু শুধু উদারতা ও মহানুভবতার কারণেই প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা হচ্ছে। এমনই অবস্থায় ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধনী আনা সম্ভব হবে এবং সংশোধনী প্রচেষ্টায় সেই ক্ষমার গুরুত্ব ও মূল্য অনুভূত হবে। অহংকারী ও সীমালংঘনকারী যখন বুঝবে যে উদার মনে ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতো গিয়ে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। কোনো দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে নয়, একমাত্র তখনই সে লজ্জিত হবে এবং অনুভব করবে যে, তার যে বিপক্ষীয় ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করেছে সে অবশ্যই শক্তিশালী।

সত্য কথা হচ্ছে, যে শক্তিশালী ব্যক্তি মাফ করতে পারে অবশ্যই সে তার নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাবান বানায়। সুতরাং এই পর্যায়ে ক্ষমাশীলতা তার জন্যে কল্যাণ ও মর্যাদা বয়ে আনে এবং তার প্রতিপক্ষকে সংশোধিত হতে সাহায্য করে। একই ভাবে এ কথাও সত্য যে, দুর্বলতার সময়ে বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রশ্নে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অক্ষম হলে ক্ষমার কোনো কথা উচ্চারণ করা যাবে না। তা হবে দুর্বলতা দেখানোর শামিল এবং তার ফলে আক্রমণকারীর দর্প ও অনিষ্টকারিতা আরও বহুগুণে বেড়ে যাবে। সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের ওপর ভরসা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে যে কোনো ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সাহায্য পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁর মযলুম কোনো বান্দার দুর্বলতার সুযোগে কোনো যালেমের যুলুম বেড়ে যাক, এটা কিছুতেই তিনি চান না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তিনি যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।'

এটা হচ্ছে সেই প্রথম মূলনীতির ওপর আরও গুরুত্ব আরোপকারী কথা যেখানে বলা হয়েছে অন্যায় আচরণের অনুরূপ আচরণ দিয়ে শোধ নেয়া প্রয়োজন। এটা হচ্ছে একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে, যে অন্যায় প্রতিরোধ করতে গিয়ে সাথে সাথে শোধ না নিয়ে একটু অপেক্ষা করা অথবা ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম না করা। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে,

'অত্যাচারিত হওয়ার পর যে যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেবে, তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের ওপর যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে বেড়ায়। তারাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের জন্যে বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।'

সুতরাং নির্যাতিত অবস্থায় যে প্রতিশোধ নেবে এবং অন্যায় ব্যবহারের প্রতিদানে অনুরূপ ব্যবহার করবে এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করবে না, অর্থাৎ যতোটুকু পাওনা ঠিক ততোটুকু করবে, তার বেশী নয়, তাকে কোনো দোষ দেয়া যাবে না। সে তো শরীয়ত নির্ধারিত হক ব্যবস্থার ওপর নেই, এজন্যে তার ওপর কারো কোনো ক্ষমতা খাটানোর অধিকার নেই এবং

তার প্রতিশোধ নেয়ার পথ আটকানোর অধিকার কারও নেই। যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে হামবড়াভাব দেখাতে চায় তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা ওয়াজেব। যখন এইভাবে যালেম নির্বিঘ্নে তার যুলুম চালিয়ে যেতে থাকবে। তার যুলুম থেকে তাকে বিরত করার জন্যে কেউ কোনো বাধা দেবে না, সে অবস্থায় পৃথিবীতে কোনো সংশোধনী আসতে পারবে না। সে অবস্থায় অসংখ্য অন্যায়কারী ও যুলুমবাজ লোকদের দ্বারা আল্লাহর যমীন ভরে যাবে, কেউ তাদের মোকাবেলা করার মতো বা তাদের দমন করার মতো কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ তায়ালা এই সব অহংকারী যালেমদের জন্যে বেদনাদায়ক আযাব ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে থামিয়ে দেয়া এবং তাদের অন্যায় করার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভারসাম্যপূর্ণ এবং এক মধ্যম পথ অবলম্বন করার দিকে, আত্ম সংযম, সবর এবং ব্যক্তিগত অবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপারে মহানুভবতা প্রদর্শন করার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যারা, ওপরে বর্ণিত মতে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখে তবু ক্ষমা করে দেয়। কেননা সবর ও মহানুভবতা প্রদর্শনে মর্যাদা বাড়ে, যিল্লতি বা হীনতা আনে না, যার দ্বারা সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি আসার সম্ভাবনা থাকে, অপমান বা অমর্যাদা নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি সবর করবে ও মাফ করবে অবশ্যই সে বড় দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেবে।'

আলোচ্য প্রসংগে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যম পথ অবলম্বন ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে এবং আল্লাহ তায়ালা চাইছেন যে, মানুষের মনমগয পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, মুক্ত হোক তারা হিংসা বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে। আরও মুক্ত হোক তারা চারিত্রিক দুর্বলতা ও সর্ব প্রকার হীনতা থেকে। তারা যুলুম ও অন্যায় কাজ ও ব্যবহার পরিহার করুক। তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এবং সর্বাবস্থায় তার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশা স্থাপিত হোক। সবর ও অবিচলিত থাকার মহাগুণ হচ্ছে এ কঠিন পথ পরিক্রমায় তাদের মুল পাথেয়!

মোমেনদের মধ্যে সাধারণভাবে যখন এসব মহৎ গুণাবলী গড়ে উঠবে, তখন এমন ইসলামী জামায়াত সংগঠিত হতে পারবে, যারা গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনা করার যোগ্য হবে, আর তখনই তারা হবে সর্বোত্তম জাতি যারা সর্বাধিক স্থায়িত্বের দাবীদার হবে। বলিষ্ঠ ঈমান ও তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করার কারণে তারা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে।

পথভ্রষ্টদের অবমাননার দৃশ্য

যেসব মোমেনের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন উন্নতি ও কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাদের মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পর, সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি যালেম ও গোমরাহ লোকদের জন্যে যেসব হীনতা দীনতার গ্লানির ও যেসব ক্ষতির অপেক্ষা করছে তারও কিছু বর্ণনা দিচ্ছেন।

'যাকে আল্লাহ তায়ালা, গোমরাহ করবেন .....।' তার জন্যে (নাজাতের) নেই কোনো উপায়।' (আয়াত ৪৪-৪৬)

অবশ্যই আল্লাহর ফয়সালার কোনো পরিবর্তন হবে না। সে ফয়সালাকে ফেরানোও যাবে না। আর আল্লাহ তায়ালা যা করতে চাইবেন তাকে থামিয়ে দেয়ার কেউ নেই। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করতে চাইবেন তাঁর এ সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছার পর তাকে বাঁচানোর জন্যে তার পাশে আর কোনো বন্ধু এসে দাঁড়াবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন, বান্দার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে। তিনি আরও জানেন তাঁর কিছু বান্দার গোমরাহ হওয়ার বিষয়টি। সুতরাং, কিছু ভুল পথের পথিক বান্দা তাঁর থাকবেই, এটা পূর্ব থেকেই ফয়সালা হয়ে রয়েছে এবং যাদের সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে রয়েছে তাদের জন্যে এমন কোনো বন্ধু বা পরিচালক থাকবে না যারা তাদেরকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে আনতে পারবে অথবা তাদের গোমরাহীর নির্ধারিত সাজা থেকে বাঁচানোর মতোও কেউ থাকবে না .... আর অবশিষ্ট আয়াতে যাদের দৃশ্য সামনে আসছে, তাদেরকেও বাঁচানোর মতো কেউ থাকবে না, যেমন বলা হয়েছে,

'দেখবে যালেমদেরকে, তারা যখন আযাব দেখবে, তখন তারা বলে উঠবে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি? তুমি আরও দেখবে তাদেরকে, যখন আযাবের মধ্যে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন অপমানের গ্লানিতে তারা মাথা নত করে থাকবে, তারা গোপনে গোপনে (পরস্পরের প্রতি) তাকাতে থাকবে।'

যালেমরা যেহেতু দুনিয়ার বুকে ছিলো অহংকারী বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী, সুতরাং তাদের উপযুক্ত অবস্থা হবে এটাই যে তারা রোজ হাশরের দিনে প্রকাশ্য লাঞ্ছনার মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে। ....তারা আযাব দেখার সাথে সাথে দুনিয়ায় থাকাকালে যারা তাদের নেতা কর্তা ছিলো তাদেরকেও কাছাকাছি দেখতে পাবে এবং সে সময়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তারা কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করবে–

'(এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?'

এ অবস্থাটা হবে বড়ই অবমাননাকর হতাশা ও আফসোসে ভরা। সেই ধ্বংসাত্মক অবস্থা তারা দেখা সত্তেও তাদের মনে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে কিছু ক্ষীণ আশা জাগতে থাকবে। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের মাথা থাকবে অবনত। আল্লাহর ভয়ে বা লজ্জার কারণে নয়, বরং লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমানের গ্লানিতে তাদের মাথা অবনমিত থাকবে। তাদেরকে যখন আগুনের দিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদের চোখ থাকবে অবনমিত। লজ্জা ও হীনতার গ্লানিতে তারা চোখ তুলে চাইতে পারবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা অর্ধনির্লিমিত চোখে চাইতে থাকবে।'

এটা হবে তাদের যিল্লতির এক কঠিন দৃশ্য। এই সময়ে দেখা যাবে, যারা (দুনিয়াতে) ঈমান এনেছে, তারা ওখানে নেতৃত্ব দানকারী হিসাবে অবস্থান নেবে, তারা ধীর স্থির চিত্তে কথা বলতে থাকবে, ভাষণ দিতে থাকবে। তাদের বক্তব্য পেশের কথা জানাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

'ঈমানদাররা বলবে নিশ্চয়ই সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই যারা তাদের নিজেদের ও নিজেদের (আদর্শিক) পরিবারের জন্যে ক্ষতি ডেকে এনেছে।' .... অর্থাৎ, এরা সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর ওখানে অবস্থানকারী সকলেই হীনতা দীনতার কারণে লজ্জাবনত হয়ে থাকবে, বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোনো যায়গা আছে কি!'

দোযখে নিক্ষিপ্তদের পরিণতি দেখে সাধারণভাবে যে মন্তব্য আসবে, তা হচ্ছে, 'ওই দেখো, অবশ্যই যালেমরা স্থায়ী আযাবের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।'

'হায়, আজ কোনো সাহায্যকারী পাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে এবং (নাজাতের) সকল পথ আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে।'

সেইদিনের এই দৃশ্যের বর্ণনাকে সামনে রেখে সীমালংঘনকারী ও অহংকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, যেন তারা অনাকাংখিতভাবে সেই আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই তাদের রবের

ডাকে সাড়া দেয়। কারণ যখন আযাব এসেই যাবে তখন এমন কোনো আশ্রয় তারা পাবে না, যা তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে। সেদিন সেখানে এমন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যা তাদেরকে সেই নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। এরপর রসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, যেন তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, কারণ তাদেরকে সতর্ক করা সত্তেও যখন তারা তাঁর কথাকে উপেক্ষা করেছে, তখন তাদের কথা আর চিন্তা করা উচিত নয়। যেহেতু তাঁর কাজ শুধু পৌছে দেয়া, তাদের জন্যে তাঁকে দায়ী করা হবে না বা তিনি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নন। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, সেই দিন আসার আগে যেদিন একবার এসে গেলে তোমার রবের কাছ থেকে সেই দিনকে আর সরিয়ে নেয়া যাবে না। সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না। আর থাকবে না তোমাদের জন্যে সেই দিনকে সরিয়ে নেয়ার মতো কেউ। এরপরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সে অবস্থায় (তোমার আর কিছু করার নেই) তোমাকে তো ওদের অভিভাবক বানানো হয়নি তোমার কাজ হচ্ছে শুধু পৌছে দেয়া।'

সম্পদ, সন্তান ও স্বচ্ছলতা একমাত্র আল্লাহর দান

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেই সব মানুষের প্রকৃতি উন্মোচিত করছেন যারা এই ভাবে সত্যের বিরোধিতা করছে এবং সত্য সঠিক জীবন প্রণালীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে। এই আচরণের দ্বারা তারা নিজেদেরকে যে আযাবের মুখোমুখি করে দিচ্ছে, তা আজকে মোটেই তারা বুঝতে পারছে না। এ আযাব থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা তাদের খুবই ক্ষীণ, সেদিন সকল নেয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হবে, তারা কষ্টের চোটে অস্থির থাকবে, সেদিন তাদের সংকটের কোনো সীমা বা শেষ থাকবে না। আজকের সুখের দিনে তারা যেভাবে চলছে তা জানাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আমি যখন তাদেরকে আমার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, আর যদি তাদের আচরণের দরুণ তাদেরকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা অস্থির হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করে বসে ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।'

এরপর জানানো হচ্ছে যে, মানুষ সুখ দুঃখ, স্বচ্ছলতা এবং বঞ্চনা যাইই পাক না কেন সবই আল্লাহর কাছ থেকে পায়। তাহলে কল্যাণের অধিকারী হলে কেনই বা তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হবে, আর একটু দুঃখ পেলেই বা সে কেন এতো ভেংগে পড়বে? এমন আচরণের দ্বারা আসলে মানুষ নিজেকে সকল কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা থেকে সরিয়ে নেয় সর্বঅবস্থার ওপর যার মালিকানা বিরাজমান। এরশাদ হচ্ছে,

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহী আল্লাহর হাতে .... নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন সবকিছু করতে সক্ষম।' (আয়াত ৪৯-৫০)

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই দান। এরা আল্লাহর মেহেরবানীর প্রতীক, যাকে ইচ্ছা তিনি দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তিনি তুলে নেন। সবই তাঁর মেহেরবানী।

এরা মানুষের অন্তরের বড়ই কাছাকাছি বিষয়, আর মানুষ বড়ই অনুভূতিশীল জীব। এ জন্যে ইতিপূর্বে রেযেক বা জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কে অনেক কথা আল কোরআনে এসে গেছে। এখানে রেযেক সম্পর্কিত কথা সন্তান সন্তুতির উল্লেখ দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে, যেহেতু জীবনে মানুষের প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে তার মধ্যে সন্তান সন্তুতি অবশ্যই একটি। আর অন্যান্য ধন দৌলতের মতো সন্তান সন্তুতি ও আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আর এ কথা পেশ করা যে, আসমান ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহরই হাতে-এ কথার মধ্যে ছোট বড় এবং প্রত্যেক বস্তুর সকল

অংশ সবই আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সব কিছুর ওপর রয়েছে আল্লাহর বাদশাহী ও কর্তৃত্ব। এমনি করে বলা হয়েছে,

'তিনি যা চান তাইই সৃষ্টি করেন।'........

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব জানদার বা প্রাণী সত্ত্বার কথা যার ওপর এখানে কিছু আলোচনা আসছে। এই যে মানুষ ধন-সম্পদের জন্যে পাগল পারা তার গতি তো সৃষ্টিকতা আল্লাহরই দিকে, যিনি সকল কিছুকে পয়দা করেন। মানুষ খুশী হয় এমন জিনিসও তিনি পয়দা করেন, আবার এমন জিনিসও তিনি পয়দা করেন যাতে মানুষ দুঃখিত হয়। তিনি মানুষকে কখনও তার পছন্দনীয় জিনিস দান করেন, আবার কখনও তার থেকে তার প্রিয় জিনিস কেড়ে নেন।

এরপর দান করা ও কেড়ে নেয়ার অবস্থা সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আসছে, যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন পুত্র সন্তান, আবার কখনও পুত্র ও কন্যা জোড়ায় জোড়ায় দেন, অর্থাৎ পুত্র দেন কন্যাও দেন। আবার চাইলে কাউকে কিছু দেনও না, বানিয়ে দেন বন্ধ্যা....... অথচ এসব কিছু তো আল্লাহরই হুকুমের গোলাম। তিনি ছাড়া এ সব জিনিসের ওপর এখতিয়ার খাটানোর ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি তাঁর জ্ঞান মোতাবেক এসব কিছুকে পরিচালনা করেন। আর কাকে তিনি কী দেবেন, তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী তিনি পূর্বে সব কিছুই ঠিক করে রেখেছেন এবং বিশ্ব চরাচরের যা এসব কিছুকে তিনি তাঁর জ্ঞান ও কুদরত মোতাবেক চালিয়ে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন-সবার ওপর ক্ষমতাবান।'

ওহী নাযিলের অভাবনীয় অকল্পনীয় পদ্ধতি

সূরাটির সমাপ্তি পর্যায়ে এসে আলোচনা প্রসংগ আবার মোড় নিচ্ছে প্রথম সেই সত্যটির দিকে যাকে কেন্দ্র করে সূরাটির আলোচনা চলছিলো, আর তা হচ্ছে ওহী ও রেসালাত সম্পর্কিত কথা। বর্তমান আলোচনাকে আবার সেই দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে যেন এই আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সর্বোতভাবে এবং পরিপূর্ণ জোর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিবেদিত প্রাণ বান্দাদের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা ঘোষণা করছেন। বিশেষ করে জানাচ্ছেন তাঁর শেষ রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে তাঁর মহব্বতের কথা, যেহেতু তাঁর ওপরেই তাঁর সেই রেসালাত সমাপ্ত করতে যাচ্ছেন যাঁর মাধ্যমে বিশ্বের মানুষকে তিনি সর্বাধিক কল্যাণ দিতে চান এবং তাদেরকে সরল সঠিক ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করতে চান। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার সাথে ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন, অন্য কোনোভাবে নয়, অথবা তিনি তাঁর বার্তাবাহককে পাঠান যে তাঁর হুকুমের ততোটুকু বার্তা নিয়ে আসে যতোটুকু তিনি চান। অবশ্যই তিনি জানেন, বিজ্ঞানময়।' ...... শোনো, আল্লাহর দিকে ফিরে যায় সকল কাজ' (আয়াত ৫১-৫৩)

ওপরের আয়াতগুলো অকাট্যভাবে জানাচ্ছে যে মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে, মোহাম্মদ (স.) তাঁর রবকে দেখেছেন সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।(১)

মানুষের কাছে আল্লাহর ওহী এই তিন পদ্ধতির যে কোনো একটা পদ্ধতিতে আসে; (এক) সরাসরি ওহী যা মোহাম্মদ (স.)-এর অন্তরের মধ্যে কোনো মাধ্যম ছাড়াই এমনভাবে প্রেরণ করা

---

(১) বোখারী ও মুসলিম উভয়ের মধ্যেই হাদীসটি এসেছে।

হয় যে তিনি সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, তা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে এসেছে। (দুই) পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা হয়। যেমন মূসা (আ.)-এর সাথে তিনি পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেছিলেন। মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন। তার জবাবে বলা হয়েছিলো, না, 'মূসা, সরাসরি আমাকে তুমি দেখতে পারবে না, দেখার ইচ্ছা করে মূসা যখন তূর পাহাড়ের দিকে তাকালেন তখন সাথে সাথে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর যখন তার হুঁশ হলো, বললেন, মহা পবিত্র তুমি, হে আল্লাহ, আমি তাওবা করলাম। ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।' তিনি, 'অথবা তিনি একজন বার্তাবাহক পাঠান' আর তিনি হচ্ছেন ফেরেশতা সে তাঁরই নির্দেশে-যতোটা তিনি চান, ওহী নিয়ে আসে।' ফেরেশতার মাধ্যমে যে ওহী আসে তা কয়েকটি নিয়মে, যেমন রসূল (স.) থেকে জানা গেছে।

এক. তাঁর সাথে উক্ত ফেরেশতা এক ভয় বিজড়িত পরিবেশে এমনভাবে সাক্ষাত করেছেন যে, তিনি সেই ফেরেশতার উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করেছেন, কিন্তু তাকে চোখে দেখেননি, যেমন রসূল (স.) বলেন, 'সেই পবিত্র আত্মা আমার ভয় জড়িত অন্তরের মধ্যে এ কথা এনে দিতেন যে, কোনো মানুষ ততোক্ষণ মরবে না যতোক্ষণ না তার জন্যে বরাদ্ধ করা রেযেক সে পুরোপুরিভাবে পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর কাছে উত্তমভাবে চাও।'

দুই. রসূল (স.)-এর কাছে (উক্ত) ফেরেশতা একজন মানুষের রূপ ধরে আসতেন, অতপর তিনি এমনভাবে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে কথা বলতেন যে, তার বক্তব্য রসূল (স.)-এর অন্তরে সংরক্ষিত হয়ে যেতো।

তিন. তিনি জিবরাঈল ফেরেশতা রসূল (স.)-এর কাছে এক ঘন্টাধ্বনি আকারে আসতেন এবং এই আগমন রসূল (স.)-এর ওপর অত্যন্ত ভারী এক চাপ সৃষ্টি করতো, এমনকি এই ভারত্বের অনুভূতির তীব্রতায়, কঠিন শীতের দিনেও তিনি প্রচন্ডভাবে ঘেমে যেতেন। এই ভারত্বের লক্ষণ আরও যেভাবে প্রকাশ পেতো তা হচ্ছে, যখন উঁটের ওপর অবস্থান করা অবস্থায় এইভাবে ওহী আসতো তখন উঁটের পিঠ (সেই ভারত্বের তীব্রতায়) প্রায় মাটির সাথে মিশে যেতো। আরও স্পষ্টভাবে এই ভারত্বের লক্ষণ আর একটি ঘটনা থেকে জানা যায়।

একদিন যায়েদ ইবনে সাবেতের উরুর ওপর রসূল (স.)-এর উরুর কিয়দংশ স্পর্শ করে ছিলো। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, এমন সময়ে ঘন্টাধ্বনির মতো ওহী আসতে শুরু করলে তিনি তার উরুর ওপর চাপটা এতো বেশী অনুভব করছিলেন যে, মনে হচ্ছিলে যে তাঁর উরুর হাড্ডি চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

চার. সে ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে রসূল (স.)- অবিকল তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন এবং সে সময়ে তিনি রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহর বাণী ততোটা পৌঁছে দিয়েছেন, যতোটা তাঁকে পৌঁছুতে বলা হয়েছে। এই ভাবে (উক্ত ফেরেশতাকে আসল চেহারায়) দেখা রসূল (স.)-এর যিন্দেগীতে দুই বার সম্ভব হয়েছে। সূরায়ে নাজম এর উল্লেখ এসেছে।(২)

এই হচ্ছে ওহী আসার বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায় এবং ফেরেশতার সাথে রসূল (স.)-এর সরাসরি সাক্ষাতের অবস্থা। যিনি এসব বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যমে ওহী পাঠিয়েছেন,

'তিনি মহান, তিনি বিজ্ঞানময়।' ....

তিনি তাঁর মহান মর্যাদাপূর্ণ এসব পদ্ধতিতে ওহী পাঠিয়েছেন, তিনি যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে এসব বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ওহী পাঠান।

---

(২) ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে কাইয়েম রচিত 'যাদুল মাযাদ' গ্রন্থ থেকে এ রেওয়ায়াতটি পাওয়া গেছে।

আমার নিজের মানসিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি যখনই এমন কোনো আয়াত দেখেছি, যার মধ্যে ওহী অথবা এসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, তখনই ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এর সাথে সেই মিলনের প্রসংগটি আমার মধ্যে এক ভীষণ কম্পন সৃষ্টি করেছে। আমার প্রত্যেকটি অংগ প্রত্যংগ থরথর করে কাঁপতে থেকেছে.........তারপর চিন্তা এসেছে, কেমন করে ও কিভাবে মহান সেই সত্ত্বার সাথে আমাদের মিলন সংঘটিত হবে– যাঁর নেই কোনো আদি, নেই কোনো অন্ত। যিনি আছেন চিরদিন এবং থাকবেন চিরদিন, যাঁর ক্ষমতার কোনো সীমা–শেষ নেই, যাকে কোনো স্থান, কোনো সীমা বা সময়ের সাথে কল্পনা করা যায় না, যিনি জানেন সব কিছু এবং যাঁর ক্ষমতার আওতার মধ্যেই সব কিছু চলছে। যাঁর মতো কেউ নেই, কিছু নেই। একদিন অবশ্যই আসবে, যখন তাঁর সাথে আমাদের মিলন হবে, কিন্তু মহান রব্বুল আলামীন-এর সাথে আমাদের মিলন কিভাবে হবে? আমরা তো সীমাবদ্ধ জীব, সময়, স্থান ও স্থূলতার গন্ডীতে আমরা আবদ্ধ। কিভাবে আমরা পৌঁছুবো তাঁর কাছে? আমরা তো ধ্বংসশীল, এই নশ্বর দেহ কিভাবে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। সেই মহা জ্যোতির্ময় রবের সামনে আমাদের অস্তিত্ব কিভাবে স্থির থাকবে? এরপর, সেই মহা মিলনের কথা কিভাবে বুঝবো, কিভাবে বুঝাবো? কোনো ভাষা দিয়ে এ কথা প্রকাশ করবো!

এই অনুভূতির সাথে এসে জড় হয় সেই চিন্তা, কেমন করে এই নশ্বর দেহের মানুষের কাছে পৌঁছুবে সেই অবিনশ্বর, চিরন্তন ও সর্বশক্তিমান মাবুদের কথা? পৌঁছুবে তাঁর কথা, যাঁর কোনো সীমা নেই। নেই কোনো শেষ এবং নেই এমন কোনো রূপ বর্ণ বা আকার আকৃতি, যা আমরা বুঝতে পারি?

কেমন করে তা হবে? কিভাবে হবে? একের পর এক এসব প্রশ্ন মনে আসতে থাকে, কিন্তু এর কিছুই আমরা বুঝতে পারি না কেননা আমরা তুচ্ছ সীমাবদ্ধ বোধ ও অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

কিন্তু এরপরও আমি এ প্রসংগে আবারও ফিরে আসবো এবং নিজেকে বলবো, এ কী হলো তোমার, কেন জিজ্ঞাসা করছো এসব কথা? কিভাবে হবে, কেমনে হবে? তুমি জিজ্ঞাসা করছো, অথচ তোমাকে তো চিন্তা করতে হবে তোমার নিজের সীমাবদ্ধতার কথা খেয়াল রাখতে হবে তোমার সীমাবদ্ধতা, তোমার অক্ষমতা, তোমার বস্তুনির্ভরতা, তোমার মানবনির্ভরশীলতা ইত্যাদির গন্ডীর মধ্যে চিন্তা করা ছাড়া তোমার তো কোনোই গত্যন্তর নেই। হাঁ, অবশ্যই মানতে হবে যে, এ সত্য কথাটা ওপরের বর্ণনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ সত্যটা জীবন্ত ছবির মতো ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে যেসব লক্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আছেন এবং সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর অস্তিত্বের সাথে জড়িত রয়েছে।

এ সত্যটি বুঝা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে ভয় এবং কম্পন আমার যথারীতিই রয়ে গেছে। আর প্রকৃতপক্ষে এ ভয়টা থাকাও দরকার। অবশ্য নবুওত এক বিরাট নেয়ামত এবং ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত এটাও অবশ্যই এক বিরাট রহস্যপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা মানব মন্ডলীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এ নেয়ামত দেয়া হয়েছে। এ মহান নেয়ামতের মাধ্যমে যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইয়হে ওয়া সাল্লাম মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনি করে যারা এ মহান কেতাব পাঠ করে, তারাও এ কেতাবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ পয়দা করে। আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনিও কি আমার সাথে এখন এই চিন্তাই করছেন এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আল কোরআনের অবদান সম্পর্কে আপনি কি আমার সাথে একমত? এ কেতাব তো সেই ওহীরই প্রতিধ্বনি করে, যা সেই মহান পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে এসেছে! হাঁ, তাহলে আপনি কি আমার সাথে এই একইভাবে চিন্তা করবেন যা আমি করছি! এ কেতাব ওখান থেকেই এসেছে, আমি কি এ কথাটি বলবো? বলাটা কি আমার ঠিক হবে? না, কিছুতেই না (যদিও আমরা কথায় কথায় অনেক সময় এভাবে বলে ফেলি) প্রকৃতপক্ষে ওখান

থেকে এ কেতাব আসেনি, আসেনি কোনো বিশেষ স্থান থেকে। কোনো বিশেষ যামানার কোনো বিশেষ ক্ষেত্র থেকে, কোনো বিশেষ দিক থেকে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পাত্র থেকে অথবা কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে আসেনি। এসেছে সকল সত্ত্বার চূড়ান্ত সত্ত্বা থেকে, সে মহান সত্ত্বা চিরদিন আছেন, চিরদিন থাকবেন। এসেছে সকল ক্ষমতা ও শক্তির আধার সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে মানুষের কাছে। এই মানুষকেই নবী রসূল বানানো হয়েছে।

লক্ষ করার বিষয় যে, সেই অসীম সত্ত্বার অমর অক্ষয় বাণীসম্বলিত এ কেতাবটি এলো, সসীম ও ক্ষীণ আয়ু সম্বলিত এই দুর্বল মানুষের কাছে, অসীমের সাথে সসীমের এ সম্পর্ক তাঁর বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন হলো-এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কারণ, এতো এমন এক অলৌকিক কালাম, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রচনা করতে পারে না, সেই অমর অক্ষয় বাণীকে মরণশীল এই মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াটা কী আজব ব্যাপার তা একটু চিন্তা করলেই আঁচ করা হয়তো সম্ভব হবে। তবে যে উপায়ে এ বাণী পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে তা কতো রহস্য ভরা এবং তা কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন .... তিনিই এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। আর যে ব্যক্তিই এ কথাগুলো পড়ে, সেই অশান্ত ও উচ্ছৃংখল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আমার ভাই বোনেরা, সেই সব বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো সম্পর্কে, আপনারাও কি সেইভাবে অনুভব করেন যেভাবে আমি অনুভব করছি যা উল্লেখ করতে গিয়ে আমি ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠি, যা লিখতে গিয়ে আমার গোটা অস্তিত্ব মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছে? আমি যখন কল্পনা করছি, এ পাক কালামের অবতীর্ণ হওয়ার সেই মহাশ্চর্য মুহূর্ত সম্পর্কে তখন কেন যেন আমার ভয় লাগছে এবং কেন যেন আমি ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছি তা আমি বলতে পারবো না। এ বিষয়ে আমি কী বলবো তাও বুঝতে পারছি না, যেহেতু এ ঘটনাটাই অসাধারণ এবং এক অলৌকিক প্রকৃতির। এর দৃশ্যও অস্বাভাবিক, অথচ এই বাণী বারবার পৃথিবীর বুকে নাযিল হয়েছে। আর এ বাণীর অলৌকিক এবং অত্যাশ্চার্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ রসূল (স.)-এর যামানার লোকেরা বহুবার অনুভব করেছে, তারা নিজেদের চোখেই দেখেছে এ মর্যাদাপূর্ণ কালামের শক্তি। খোদ আয়শা (রা.) (যিনি ছিলেন রসূল (স.)-এর সব থেকে ঘনিষ্ঠ জীবন সাথী), মানবেতিহাসে এ মহান কালামের শক্তির যে নিদর্শন অবলোকন করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ঘটনা তিনি পেশ করছেন। বলছেন, 'রসূল (স.) বললেন, 'ওহে আয়শা, এই যে জিবরাঈল (আ.) এসেছেন, তিনি তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।' বললাম, তাঁর ওপরও সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এরপর তিনি বললেন, 'তিনি দেখছেন, যা আমরা দেখি না।(১)

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) নিজে এমন একটি মুহূর্তের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। বলছেন, এ সময় রসূল (স.)-এর উরু(র কিয়দাংশ) তার উরুর ওপর রেখে বসে আছেন এমন সময় ওহী এসে গেলো, তখন রসূল (স.)-এর উরু এত ভারী হয়ে গেলো যে মনে হতে লাগলো যে তার (যায়েদের) উরু ভেংগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। রসূল (স.)-এর আরও বহু সাহাবী এ ঘটনা দেখেছেন এবং ওহীর এ কঠিন চাপ রসূল (স.)-এর চেহারা দেখে তারা অনুভব করেছেন, অতপর তাঁরা সেই অবস্থায় রসূলকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছেন। অবশেষে ওহী আসা শেষ হয়েছে এবং তিনি হালকা হয়ে গেছেন। তখন তিনি উপস্থিত সাহাবীদের দিকে মনোযোগী হলেন এবং তারাও তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন।

আরো চিন্তার বিষয় এই যে ওহী, এর প্রকৃতি কী? যে মহান ও মর্যাদাপূর্ণ ফেরেশতা ওহী নাযিল করার উদ্দেশ্যে এসে তাঁর সাথে মিলিত হচ্ছেন তার প্রকৃতিই বা কী? রূহ রাজ্যের কোন

(১) হাদীসটি বোখারী শরীফে এসেছে।

ধাতু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তিনি আল্লাহ রব্বুল ইযযতের কাছ থেকে এ ওহী বহন করে এলেন মাটির সৃষ্টি মানুষ নবীর কাছে পৌছাতে পারছেন, তাঁর সাথে মোলাকাত করছেন এবং তাঁর অনুভূতিকে স্পর্শ করছেন?

এ রহস্য এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এটা একটা বাস্তব সত্য যে এর থেকেও আরও গভীর রহস্য ফুটে উঠেছে, যেখানে দূর থেকে উক্ত ফেরেশতাকে তিনি গোটা দিগন্ত বলয়ে অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছেন। এ অবস্থাটা বুঝা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

এসব অত্যাশ্চার্য ঘটনাবলীর সংস্পর্শে যিনি আসছেন তিনি স্বয়ং নবী মোহাম্মদ (স.), তাঁর হৃদয় তো এ নশ্বর দেহধারী মানবীয় হৃদয়। কি করে তিনি মাটির মানুষ হয়ে এই অকল্পনীয় ও অভাবনীয় বিষয়গুলো অনুভব করছেন? কিভাবেই বা গড়ে উঠছে সেই আলোকময় ফেরেশতার সাথে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর কিভাবেই বা তিনি সেই ফেরেশতার সাথে মোলাকাত করছেন? কি করে তাঁর হৃদয় গ্রন্থীগুলো সেই মোলাকাতের জন্যে খুলে গেলো, আর কিভাবেই বা তাঁর মধ্যে সেই শক্তির যোগান দেয়া হচ্ছে যার ফলে তার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে এবং তার গোটা সত্ত্বা আল্লাহর কথায় সাড়া দিচ্ছে?

কোন সে পরিচালনা, কোন সে রহমত এবং কোন সে মর্যাদা নিহিত রয়েছে এসব কিছু বানানোর উদ্দেশ্যের মধ্যে? এরপর মহান আল্লাহ তায়ালা দয়া বর্ষণ করছেন এবং চাইছেন মানুষ নামক এই দুর্বল ও তুচ্ছ মানুষের কাছে তাঁর উপদেশ বাণী পাঠিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে চলার ব্যাপারে সাহায্য করতে। এভাবে তাদের জীবনকে শোধরানোর জন্যে এবং তাঁর পথ তাদের সামনে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্যে তাদের কাছে তিনি তাঁর ওহী পাঠাচ্ছেন, এভাবে তিনি চাইছেন যে তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে না যায়। আর মানুষের পক্ষে একটি মশা তাড়ানোর কাজ থেকেও আল্লাহ তায়ালার কাছে এ কাজ অতি সহজ। তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের দিকে গভীর দৃষ্টিতে যখন তাকানো হবে তখন এটা বুঝা যাবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরিচালনা, হাঁ এটা এক জ্বলন্ত বাস্তবতা, বরং যদি মানুষ সুদূর সমুজ্জ্বল দিগন্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকায় তাহলে তারা বুঝতে পারবে, তারা যা কিছু অনুমান করে থাকে তার থেকে আল্লাহ তায়ালা বহু বহু উর্ধে। এরশাদ হচ্ছে,

ওহীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'আর এমনি করে আমি, মহান আল্লাহ, তোমার কাছে ....শোনো সকল কাজ (অবশেষে) তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।' (আয়াত ৫২-৫৩)

'ওয়া কাযালেকা'- এ শব্দটি দ্বারা বুঝায় এই নিয়মে এবং এই সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে,

'আমি পাঠাই তোমার কাছে'.............

অতপর আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী ওহী আসার কাজ ও সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছি, প্রচন্ড শক্তিমান রূহকে আমার আদেশে।' এ মোবারক রূহের মধ্যে যে জীবন প্রবাহ রয়েছে, তা তার প্রখর তেজকে প্রচন্ডভাবে ছড়িয়ে দেয় যা সর্বত্র সকল বিরোধিতাকে প্রতিহত করে, এরপর যা অন্তরের মধ্যে এবং প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে, বাস্তব কাজের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি করে। এ ঈমানী চেতনাই তোমাকে সঠিক পথে রেখেছে।

'এমন সময় যখন তুমি জানতে না ঈমান কি এবং কেতাবই বা কি।'

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর জীবনের চিত্র এঁকেছেন, অথচ এই ওহী দান করার পূর্ব থেকে তাঁকে বা তাঁর সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। রসূল (রসূল হওয়ার পূর্বেই) আসমানী কেতাব ও ঈমান সম্পর্কিত কথা শুনেছিলেন। যেহেতু আরব দেশে আরবদের মধ্যে

অনেক আহলে কেতাব (ইহুদী খৃষ্টান) বাস করতো এবং তাদের কিছু আকীদা ছিলো, কিন্তু সে আকীদার কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কেতাব ও এর মধ্যে উপস্থাপিত ঈমানের প্রতি দাওয়াতের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের অন্তরের মধ্যে এ কেতাবের তাৎপর্য অনুধাবন করানো এবং এ কেতাব সম্পর্কে চেতনা পয়দা করা, কিন্তু বিবেকের মধ্যে এসব কিছুর তাৎপর্য তখনই গভীরভাবে অনুভূত হবে যখন বুঝা যাবে যে, এই রূহ [জিবরাঈল (আ.)] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে। যিনি মোহাম্মদ (স.)-কে চূড়ান্তভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তিনি বলছেন,

'বরং আমি, (ঈমানকে) এক নূর হিসেবে বানিয়েছি, যার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করি।' ....

এইটিই হচ্ছে ঈমানের খাঁটি প্রকৃতি, এইটিই এই ওহীর প্রকৃতি।

এই রূহ এবং আল কেতাব।[১] অবশ্যই এ গুলো এক মহা দেদীপ্যমান আলো। এ নূর নিয়ে যে চলে, যে ব্যক্তি এ নূরের আলোতে আলোকিত হতে চায়, যে কেউ এ কেতাব অধ্যয়ন করে এবং নির্বোধ না হয়ে এর শিক্ষা অনুসারে জীবনকে গড়ে তোলে। তার জন্যে এ নূর বয়ে আনে শান্তি তার হৃদয়কে এ নূর হাসি খুশীতে ভরে দেয়। তবে তাকেই এ নূর আলোকিত করে, যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আলোতে চলবার তাওফিক দেন, যাকে এর তাৎপর্য বুঝার যোগ্যতা দান করেন, আর এ নূরের সাথে সাক্ষাত করার কাজটিই হৃদয়সমূহকে আলোকিত করে। এ নূর হচ্ছে হেদায়াতের পথে এক দিগ্বিজয়ী আলোকবর্তিকা। এর সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'(হে রসূল) তাদের অবশ্যই তুমি সঠিক পথ দেখাও, মানুষকে সরল সঠিক ও মজবুত পথের দিকে (এই নূর এর দ্বারাই) তাদের এগিয়ে দাও..........।'

এখানে এই পথ দেখানোর বিষয়ের ওপরই প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ হেদায়াতপ্রাপ্তি তো আল্লাহর ইচ্ছাতে সম্ভব হয়, অর্থাৎ সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে ব্যক্তি আল কোরআনের কাছে সম্পর্ক ও তাঁর প্রতি মহব্বত যে কোনো ব্যক্তিকে এ মহান কেতাবের খাস এলম (জ্ঞান) লাভ করার আকাংখী হওয়ার তাওফীক যোগাবে। আল কোরআনের সাথে গভীর মহব্বত ছাড়া এ মহান নেয়ামত কেউ পেতে পারে না। অপর দিকে রসূলুল্লাহ (স.) হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্ট লাভ করার একমাত্র মাধ্যম। এ কথা মনে রাখতে হবে, কোনো হৃদয় ততোক্ষণ হেদায়াতের আলো লাভ করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না রেসালাতের কাছে সে না পৌছুবে। কারণ রেসালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর মর্জি বাস্তবায়িত হবে!'

'তুমি সরল সঠিক অবিচল পথ দেখাবে, সে পথ আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক।'

---

(১) বারবার এ মহান কেতাবে, 'আল কেতাব' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারা সেই কেতাবকে বুঝানো হয়েছে যা 'আরশে মোয়াল্লাতে' লিখিত রয়েছে। যার শিক্ষা দুনিয়াতে অসংখ্য নবীর মাধ্যমে বারবার এসেছে। এই জন্যেই দেখা যায়, পরিবর্তিত হয়ে গেলেও, সমস্ত আসমানী কেতাবের মূল সুর একই। এমনকি যারা নবী রসূলের কথা বলে না, তারাও পরকালের কথা বলে এবং মানব কণ্যাণ সম্পর্কে একই শিক্ষা দেয়। সেই মূল কেতাব, তার আরবী ভাষায় উচ্চারিত শব্দাবলীসহ পরিপূর্ণভাবে শেষ নবী (স.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং এ জন্যেই এই সেই কেতাব- আল কোরআনকে হেফাযত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন আল কোরআন। অর্থাৎ সর্বাধিক এবং সর্বক্ষণ পঠিতব্য, আর বাস্তবেও এ কেতাব সদা সর্বদা পঠিত হচ্ছে কিনা এবং একে হেফাযত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া ওয়াদা তিনি পালন করছেন কিনা? তা লক্ষ্য করার বিষয় এই কেতাবকে এবং এর বাহক জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা নূর বলে অভিহিত করেছেন। মহব্বতের সাথে যে কেউ এ কেতাব পড়ে, বুঝে, চর্চা করে, সেও এ নূরের আলোকে নূরাণী হয়ে যায়।

এটাই হচ্ছে আল্লাহর পথে পৌছুনোর সঠিক দিকনির্দেশনা। এ হচ্ছে সেই পথ যেখানে এসে অন্যান্য সকল পথের মিলন ঘটেছে। যেহেতু এই পথটিই বিশ্বের মালিকের কাছে পৌছেছে। মালিক তিনি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর মালিক। অতএব, যে তাঁর পথে চলবে, সে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে নিয়ম দিয়েছেন সেই নিয়মের ওপরই চলবে এবং চলবে সেই শক্তি ও তাঁর দেয়া মেহেরবানীর ওপর যা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে সেই হেদায়াত পাবে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এদের মহা মহিমান্বিত মালিকের ওপর সদা সর্বদা মুখাপেক্ষী। তিনি তো সেই মহাসত্ত্বা যাঁর কাছে সবাই মুখাপেক্ষী। যাঁর কাছে সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'শোনো, আল্লাহর কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে।'

অর্থাৎ সব কিছু শেষ হয়ে যাবে তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর কাছে গিয়েই সবাই পরস্পর মিলিত হবে এবং তিনিই তার নিজ হুকুম বলে সব কিছুর ফয়সালা করে দেবেন।

ঈমানরূপী এই নূর, তাঁর সেই পথ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, যাতে করে তারা অবশেষে খুশী মনে ও আনুগত্য সহকারে সেই পথ দিয়ে চলে।

এভাবেই শেষ হচ্ছে আলোচ্য সূরাটি। ওহী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে যার আলোচনা শুরু হয়েছিলো, আর ওহীই হচ্ছে সেই প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বা মাঝের খুঁটা, যাকে কেন্দ্র করে সকল সমাধান আবর্তিত হয়, অর্থাৎ মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন যিনি, তিনি জানিয়েছেন যে, একেবারে প্রথম যুগ থেকে তিনি তাঁর প্রেরিত বার্তা পৌছানোর মাধ্যমে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে সব কিছু পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ একমাত্র তাঁরই পথ গ্রহণ করে, শুধু তাঁরই মত কবুল করে এবং তাঁরই বিধান মেনে চলে। মোহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর রেসালাতের আদর্শ অনুযায়ী মানবমন্ডলীর জন্যে নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়া যায়, যেন মোমেন জামায়াতের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন এবং সেরাতুল মোস্তাকীম পর্যন্ত তাদের পৌছে দেয়ার জন্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পন্ন করা যায়। এই হলো 'সেরাতুল মোসতাকীম' বা সহজ সরল ও মযবুত পথ। এ তো হচ্ছে তাঁরই পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই মুসলিম জামায়াতের বৈশিষ্ট্যগুলোও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এবং তাদের কথাও বলেছেন যারা এই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জামায়াতের অনুসারী হবে। এই জামায়াতই দুনিয়ায় সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে এবং জামায়াতই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া আমানতকে বহন করবে, এ হচ্ছে সেই আমানত যা পৃথিবীর বুকে সুদূর আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। এমন মহা আশ্চর্যজনক উপায়ে যার বর্ণনা আমরা ওপরে বিস্তারিতভাবে দেখতে পেয়েছি।

সূরা আয যোখরুফ

আয়াত ৮৯ রুকু ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾
وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ
صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾
وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ
بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা-মীম, ২. সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ, ৩. আমি একে আরবী (ভাষার) কোরআন বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা (এটা) অনুধাবন করতে পারো, ৪. এ (মহা) গ্রন্থ (কোরআন) আমার কাছে সমুন্নত ও আসল অবস্থায় মজুদ রয়েছে; ৫. (হে নবী তুমি বলো,) আমি কি (সংশোধনের কর্মসূচী থেকে) সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়ার কাজ (শুধু এ কারণেই) ছেড়ে দেবো যে, তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়! ৬. আগের লোকদের মাঝে আমি কতো নবীই না পাঠিয়েছি! ৭. (তাদের অবস্থা ছিলো,) যে নবীই তাদের কাছে আসতো ওরা তার সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ৮. তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থে প্রবল ছিলো আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এ ধরনের অনেক উদাহরণ আগে তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। ৯. তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাই পয়দা করেছেন। ১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, তাতে পথঘাট বানিয়েছেন যাতে করে তোমরা (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছুতে পারো, ১১. তিনি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছেন

السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا

تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ

عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا

إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ

أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَ

مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ

এবং (তা দিয়ে) মৃত ভূখন্ডকে জীবন দান করেছেন, (একইভাবে) তোমরাও (একদিন) পুনরুত্থিত হবে। ১২. তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, ১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, সেগুলোর ওপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থবান ছিলাম না, ১৪. আর নিসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাবো। ১৫. (এ সত্ত্বেও) এরা আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কার জন্যে (নাকি) তার (সার্বভৌমত্বের) কিছু অংশ দান করে, মানুষ স্পষ্টতই বড়ো অকৃতজ্ঞ;

রুকু ২

১৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন, আর তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান! ১৭. (অথচ) যখন এদের কাউকে সে (কন্যা সন্তানের) সুসংবাদ দেয়া হয়, যার বর্ণনা ওরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে দিয়ে রেখেছে– তখন তার (নিজের) চেহারাই কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপক্লিষ্ট হয় পড়ে। ১৮. একি (আশ্চর্য, কন্যা সন্তান)! যারা (সাজ) অলংকারে লালিত পালিত হয়, যারা (নিজেদের সমর্থনে) যুক্তি তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না– (তাদেরই তারা আল্লাহ তায়ালার জন্যে রাখলো?) ১৯. (শুধু তাই নয়,) এরা (আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশতাদেরও–

الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ
وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ
عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ
مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾
قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

যারা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র, নারী (বলে) স্থির করে নিলো; ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় এরা কি সেখানে মজুদ ছিলো (যে, তারা জানে এরা নর না নারী), তাদের এ দাবীগুলো (ভালো করে) লিখে রাখা হবে এবং (কেয়ামতের দিন) তাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করা হবে। ২০. এরা (আরো) বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা না করলে আমরা কখনো এ (ফেরেশতা)-দের এবাদাত করতাম না; এদের কাছে (আসলে) এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই, এরা শুধু অনুমানের ওপরই (ভর করে) চলে; ২১. আমি কি এর আগে তাদের (অন্য) কোনো কিতাব দিয়েছিলাম যা ওরা (আজ) আঁকড়ে ধরে আছে! ২২. (কোনো কিতাবের বদলে) তারা বরং বলে, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী মাত্র। ২৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগে যখনি কোনো জনপদে এভাবে সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি, তখনি তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী। ২৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছো– (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বললো, যে (দ্বীন) দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। ২৫. অতএব আমি তাদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিয়েছি, তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি (বীভৎস) পরিণাম হয়েছিলো!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরা ইসলামী আন্দোলনের এমন একটা অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে যখন তা ছিলো নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, সমস্যা-সংকট এবং প্রশ্ন ও আপত্তির বাণে জর্জরিত। সেই সাথে এটাও

দেখানো হয়েছে যে, কোরআন কিভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে, আর এই সব সমস্যার সমাধান দেয়ার মাধ্যমে কিভাবে বা সে মানুষের মন মগয থেকে জাহেলী যুগের বাতিল ধ্যান ধারণাকে দূর করে সেখানে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সব জাহেলী ধ্যান ধারণা, চরিত্র ও মানসিকতা শুধু তৎকালীন আরবের গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে তা আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান থাকে, আছে ও থাকবে।

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকেরা বলতো, মানুষের অধীনস্থ এই সব জীব জন্তুতে আল্লাহর একটা অংশ রয়েছে এবং আমাদের দেব দেবীদেরও একটা অংশ রয়েছে। *(সূরা আনয়ামের ১৬৬)*

জাহেলী সমাজে পশুদের সম্পর্কে নানারকমের কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। বিকৃত আকীদা বিশ্বাস থেকে এসব কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছিলো। এ সব কুসংস্কার অনুসারে কিছু পশুর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং কিছু পশুর গোশ্ত খাওয়া তারা নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো। *(সূরা আনয়াম-১৩৮)*

আলোচ্য সূরা যোখরুফে এসব বিকৃত আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন করা হয়েছে এবং মানুষকে প্রকৃত ও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে বলা হয়েছে যে, পশুরা সব আল্লাহর সৃষ্টি। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে এগুলোর যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের অনুগত বানিয়েছেন, যাতে তারা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শোকর আদায় করে। এ জন্যে নয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানাবে এবং পশুদের ব্যাপারে এমনসব মনগড়া নিয়ম-বিধি ও প্রথা তৈরী করে নেবে, যা আল্লাহ তায়ালা তৈরী করতে বলেননি। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করলেও-এর ফলশ্রুতিতে যে দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে, তা তারা স্বীকার করে না। এ সত্যটাকে তারা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং মনগড়া ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞেস কর, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।' *(আয়াত ৯-১৪)*

জাহেলী যুগের পৌত্তলিকরা বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে। যদিও তারা নিজেরা পছন্দ করতো না যে, তাদের কারো মেয়ে হোক, তবুও আল্লাহর জন্যে তারা মেয়ে পছন্দ করতো! আর এই ফেরেশতাদের তারা পূজো করতো ও বলতো, আমরা তো আল্লাহর ইচ্ছামতোই ওদের পূজো করি। আল্লাহর ইচ্ছে না থাকলে আমরা তা করতাম না। অথচ এটা ছিলো নিছক তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত তাদের কুসংস্কার। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা কোথাও মোশরেকদের যুক্তি দিয়েই তাদের দাবী খন্ডন করেছেন। আবার কোথাও সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক যুক্তি দিয়ে তাদের সামাজিক কুপ্রথার অসারতা প্রমাণ করেছেন। *(আয়াত ১৫-২২)*।

আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা মূর্তি ও গাছ-পালার পূজো করে থাকো, তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা দোজখের কাঠ, আল্লাহ ছাড়া আর যারই উপাসনা করা হোক উপাসকও জাহান্নামের কাঠ, তখন এই সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তারা বিকৃত করে এবং এ নিয়ে তর্ক বাধায়। তারা বলে, ঈসাকেও তো তার জাতি পূজো করে থাকে। তিনিও দোযখে যাবেন নাকি? তারা আরো বলে, মূর্তিগুলো হলো ফেরেশতাদের প্রতীক। আর ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। সুতরাং আমাদের উপাসনা খৃষ্টানদের উপাসনার চেয়ে ভালো। কেননা তারা হযরত ঈসার পূজো করে। হযরত ঈসা তো মানুষ। মানবীয় প্রকৃতির অধিকারী।

এই সূরায় তাদের কূটতর্কের জবাব দেয়া হয়েছে এবং হযরত ঈসার অনুসারীরা ঈসাকে আকাশে তুলে নেয়ার পর যেসব অপকর্ম করেছে, তার দায় দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। *(আয়াত ৫৭-৫৯)*

জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থেকেও মোশরেকরা দাবী করতো যে, তারা হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী। এদিক দিয়ে তারা নাকি ইহুদী খৃষ্টানদের চেয়ে উত্তম ধার্মিক।

এ জন্যে এ সূরায় হযরত ইবরাহীমের ধর্মের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, ওটা তো নির্ভেজাল তাওহীদ। সে তাওহীদের বাণী এখনো বহাল রয়েছে। সেই তাওহীদের বাণী নিয়েই রসূল (স.) এসেছেন। কিন্তু তারা সেই বাণী ও রসূল (স.)-কে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, হযরত ইবরাহীমের বংশধরের পক্ষে তা মোটেই শোভনীয় হয়নি। (২৬-৩০)

কোন যুক্তিতে ও কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে রসূলরূপে মনোনীত করেছেন, তা তারা উপলব্ধি করেনি। যে অসার ও নিকৃষ্ট জড়বাদী মূল্যবোধের নিরীখে তারা মানুষের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত, সেই সব মূল্যবোধই তাদেরকে উপলব্ধি করতে দেয়নি।

এ প্রসংগেই আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের সামনে বিচার বিবেচনার আসল মানদন্ড তুলে ধরা হয়েছে এবং তারা যেসব মূল্যবোধে বিশ্বাসী তার অসারতা ব্যক্ত করা হয়েছে। ..... (আয়াত ৩১-৩৫)

এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর একটা অংশ আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশটাতে দেখা যায়, ফেরাউন সেই সব অসার জড়বাদী মূল্যবোধ নিয়ে কেমন গর্বিত ছিলো, অথচ আল্লাহর কাছে ওগুলো ও ফেরাউন কতো তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলো। *(আয়াত ৪৬-৫৬)*

উল্লেখিত পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার, আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং উল্লেখিত ভ্রান্ত ও অসার মানদন্ড ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সূরাটা আবর্তিত এবং ওগুলোই সূরাটার আলোচ্য বিষয়। সূরাটা তিনটে অংশে বিভক্ত। এবার বিশদ তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

তাফসীর

আয়াত ১-২৫

হা-মীম, সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ। ...... *(আয়াত ১-৮)*

সূরাটা হা-মীম এই দুটো বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। এর পরপরই বলা হয়েছে সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ। আল্লাহ তায়ালা হা-মীম ও কেতাবের শপথ করছেন। হা-মীম ও কেতাব মূলত একই শ্রেণীভুক্ত। এই স্বচ্ছ, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল কেতাবখানা শাব্দিক আকৃতির দিক দিয়ে উক্ত অক্ষর দুটোরই শ্রেণীভুক্ত। আর এই অক্ষর দুটো মানবীয় ভাষায় অন্যান্য অক্ষরের মতো সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের উচ্চারিত ও উচ্চারণযোগ্য এই সব শব্দও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোরআন সংক্রান্ত আলোচনার প্রাক্কালে এই সব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার উল্লেখ্য গভীর তাৎপর্যবহ ও বিপুল অর্থবহ।

আল্লাহ তায়ালা হা-মীম ও সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ করছেন। কোরআনকে আরবদের পাঠোপযোগী করে আরবী ভাষায় পাঠিয়ে যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছেন, সেই উদ্দেশ্যটাই এই শপথের লক্ষ্যবস্তু। তাই বলছেন,

'আমি একে আরবী কোরআন বানিয়েছি, যেন তোমরা বুঝতে পারো।'

অর্থাৎ আরবরা এই কোরআনকে তাদের মাতৃভাষায় পেয়ে বুঝতে পারুক, এটাই উদ্দেশ্য। কোরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর ওহীর সমষ্টি। তাকে বর্তমান আরবী গ্রন্থের আকৃতি দিয়েছেন এ জন্যে যে, প্রথমে এই কোরআনকে গ্রহণ ও এর দায়-দায়িত্ব বহনকারী হিসাবে আরবদেরকেই

আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করেছেন। এই মনোনয়নের পেছনে যে যুক্তি ও যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তার একটা দিক আমি সূরা 'শুরার' তাফসীরে আলোচনা করে এসেছি। অপরদিকটা এই যে, আল্লাহ তায়ালা জানতেন এই জাতির ভেতরে ও এই ভাষার ভেতরে কোরআনের বাণী বহন করা ও তাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আর রসূলদেরকে প্রেরণ ও নিয়োগের সঠিক স্থান একমাত্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

আল্লাহর বাণীর মর্যাদা ও তা অস্বীকার করার পরিণতি

এরপর আল্লাহর শাশ্বত ও চিরন্তন বিচার বিবেচনায় এই কোরআনের মূল্য ও মর্যাদা কতখানি, তা বলা হচ্ছে।

'নিশ্চয় তা আমার কাছে প্রধান কেতাবের মধ্যে রয়েছে। তা অত্যন্ত মহিমান্বিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ।' (আয়াত ৪)

মূল আয়াতে উল্লেখিত 'উম্মুল কেতাব' তথা 'প্রধান কেতাব' দ্বারা লওহে মাহফুযকে বুঝানো হয়েছে, না আল্লাহর চিরন্তন ও শাশ্বত জ্ঞান ভান্ডারকে, সে বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। কেননা এই শব্দের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট শাব্দিক অর্থ নেই যা আমাদের বোধগম্য হতে পারে। তবে এ থেকে আমরা এমন একটা মর্ম উপলব্ধি করতে পারি, যা আমাদের একটা মৌল সত্য সম্পর্কে ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে। আমরা এ আয়াতটা (৪ নং) যখন পড়ি, তখন বুঝতে পারি মহান আল্লাহর জ্ঞানে ও বিবেচনায় এই কোরআনের স্থায়ী ও আসল মূল্যায়ন কতো উঁচু। এটুকু বুঝতে পারাই আমাদের যথেষ্ট। বস্তুত এই কোরআন 'আলী' অর্থাৎ মহিমান্বিত এবং 'হাকীম' অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ বা বিজ্ঞানময়। এ দুটো এমন গুণবাচক শব্দ, যা কোরআনের একটা বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীর মতো ভাবমূর্তি তুলে ধরে। কোরআন আসলেও তাই। যেন তার ভেতরে প্রাণ রয়েছে। সে প্রাণের যেন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যারা তাকে স্পর্শ করে, তাদের প্রতি সে যেন সাড়া দেয়। সে তার সমস্ত মহত্ব ও বিজ্ঞানময়তা নিয়ে মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়, তাকে সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তার স্বভাব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাকে নেতৃত্ব দেয়। আর তার বিবেকবুদ্ধি ও বাস্তব জীবনকে সেই সব মানদন্ড মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলে, যা 'আলী' ও 'হাকীম' (মহিমান্বিত ও বিজ্ঞানময়) এই দুটো গুণ থেকে উদ্ভূত।

আর কোরআন সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত দুটোতে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা কোরআনের ভাষাভাষী আরবদের চোখ খুলে দিতে সক্ষম। এ তথ্যগুলো দ্বারা তারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে যে, কোরআন তাদেরকে দেয়া আল্লাহর কতো বড় দান, কতো মূল্যবান নেয়ামত, আর এই কোরআনের প্রতি তারা যে সীমাহীন অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখিয়েছে তা কতো নিন্দনীয় এবং কতো শাস্তিযোগ্য। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কতো নিকৃষ্ট ধরনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা তাদের প্রাপ্য। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে তাদের মুখোস উন্মোচন ও সীমালংঘনের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে উপেক্ষা করার হুমকি দেয়া হয়েছে।

'তোমরা সীমালংঘনকারী বলে আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই উপদেশপূর্ণ কোরআন প্রত্যাহার করে নেবো?'

এটা খুবই বিস্ময়কর যে, মহামহিম আল্লাহ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং কারো ভালোমন্দের তোয়াক্কা করার তাঁর কোনো প্রয়োজন হয় না, তিনি আরবের এই মোশরেক গোষ্ঠীটার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন, তাদের ভাষায় একখানা কেতাব পাঠালেন, সেই কেতাবে তাদের মনের কথা বললেন, তাদের সামনে তাদের অন্তরাত্মাকে খুলে দেখালেন, তাদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করলেন, তাদেরকে প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী শোনালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর শাশ্বত বিধান স্মরণ করিয়ে দিলেন। অথচ এরপরও তারা উপেক্ষা ও অবহেলা অব্যাহত রেখেছে।

এরপর তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী ও তার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তাদের সেই জঘন্য ধৃষ্টতার শাস্তি দেয়ার জন্যে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে। আর এই হুমকির পাশাপাশি রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি কী, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। (আয়াত ৬-৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের চেয়েও দোর্দন্ড প্রতাপশালীদেরকে তাদেরই মতো অপরাধ করার কারণে অর্থাৎ রসূলদেরকে উপহাস করার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তখন তারা আর কিসের অপেক্ষায় আছে?

মোশরেকদের চরিত্রের একটা বিস্ময়কর দিক এই যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো এবং তিনি যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তাও বিশ্বাস করতো, অথচ এই দুটো জিনিসকে বিশ্বাস করার স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত ফলস্বরূপ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা ও তার প্রতি একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত হওয়ার যে দায়িত্ব ঘাড়ে চাপে, তা তারা স্বীকার করতো না। এ জন্যে আল্লাহর সাথে অন্যান্য জিনিসকে শরীক করতো, আল্লাহর সৃষ্টি করা কয়েক ধরনের পশুকে সেসব শরীকের জন্য নির্দিষ্ট করতো। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে দাবী করতো এবং তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজো করতো।

আল্লাহ তায়ালা যে আছেন এবং তিনি যে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যাপারে মোশরেকদের স্বীকৃতিকে কোরআন উদ্ধৃত করে, এর স্বতস্ফূর্ত ফলাফলকেও তুলে ধরে, যে প্রাকৃতিক যুক্তিকে তারা এড়িয়ে যেতে চায়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নৌকা ও পশুর ন্যায় যেসব নেয়ামত তাদেরকে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে। অতপর ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের উদ্ভট দাবীর অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে।

'যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে.......' (আয়াত ৯-১৪)

এ কথা সত্য যে, আরবদের মধ্যে কিছু কিছু সুস্থ আকীদা বিশ্বাসও ছিলো। আমার মনে হয়, এগুলো হযরত ইবরাহীমের রেখে যাওয়া তাওহীদী আকীদারই অবশিষ্টাংশ। তবে পরবর্তীকালে তার বিকৃতি ঘটে এবং তাতে মানুষের মনগড়া ধ্যান ধারণা ঢুকে পড়ে। কিন্তু মানুষের সহজাত বিবেক-বুদ্ধি যে কথাটা অস্বীকার করতে অপারগ, তা মোশরেকদের আকীদা বিশ্বাসেও টিকে রয়েছে। সেটা হলো, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন ও স্বতস্বিদ্ধ সত্য যে, কোনো স্রষ্টা ছাড়া এই মহাবিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না এবং এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু এই অকাট্য সত্যকে স্বীকার করে এর বাহ্যিক রূপ পর্যন্তই তারা থেমে থাকতো। এর পরে এর যে স্বাভাবিক দাবী রয়েছে, তা মানতো না। আল্লাহ বলেন,

'তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করলো, তাহলে তারা বলবে, মহা প্রতাপশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।'

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'আল-আযীয' (মহা প্রতাপশালী) ও আল আলীম (মহাজ্ঞানী) এই দুটো শব্দ তাদের কথার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তারা এ কথা স্বীকার করতো বটে যে, বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু ইসলাম আল্লাহর যে গুণাবলী বর্ণনা করেছে, তা তারা স্বীকার করতো না। ইসলামের প্রচারিত এ গুণগুলো এমন ইতিবাচক যে, এর প্রভাবে আল্লাহর সত্ত্বার একটা কার্যকর প্রভাব মানুষের অন্তরে, বাস্তব জীবনে ও এই সৃষ্টি জগতের জীবনে না পড়ে পারে না। তারা আল্লাহকে বিশ্বজগতের ও তাদের স্রষ্টা হিসাবে চিনতো। কিন্তু তারা তাঁর সাথে শরীকও মানতো কেননা আল্লাহর যে গুণাবলী শেরেকের ধারণাকে খন্ডন করে এবং শেরেককে অযৌক্তিক ও বাতিল বলে প্রমাণ করে, সেই গুণাবলী সহকারে চিনতো না।

কোরআন এখানে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, যে আল্লাহকে তারা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা হিসাবে জানে, তিনি 'আযীয' ও 'আলীম' অর্থাৎ অসীম শক্তিধর ও মহাজ্ঞানী। কোরআন তাদের এই স্বীকৃতি থেকে তাদের পিছু নেয় এবং এই স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপগুলোতেও তাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আল্লাহর অনুপম ব্যবস্থাপনা

এরপর কোরআন আল্লাহকে তাদের সাথে তার গুণাবলীর মাধ্যমে পরিচিত করতে আরেক ধাপ অগ্রসর হয় এবং সৃষ্টির পর তিনি তাদের ওপর আর কী কী অনুগ্রহ করেছেন, তা বর্ণনা করে।

'যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে যাতায়াতের পথ বানিয়ে দিয়েছেন।' (আয়াত ১০)

এই পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বিছানাস্বরূপ বানানোর তত্ত্বটা সব যুগের মানুষই কোনো না কোনো আকারে বুঝতে পারে। যারা কোরআনকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছে, তারা সম্ভবত পৃথিবীকে পায়ের নীচে দেখে বুঝতে পারে যে, তা চলাচলের যোগ্য, সামনে দেখে তাকে চাষাবাদের যোগ্য এবং সামগ্রিকভাবে তা জীবন যাপন ও উৎপাদনের উপযোগী। আজকে আমরা এ তত্ত্বটাকে আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে বুঝতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও তার দূর ও নিকটের ইতিহাস সম্পর্কে যতোদূর জেনেছে, ততোদূর আমরা জানি। অবশ্য এ সম্পর্কে আমাদের মতবাদ ও আন্দাজ-অনুমান যদি সঠিক হয়, তবেই এ জ্ঞান স্বার্থক। আমাদের পরে যারা পৃথিবীতে আসবে, তারা আমাদের চেয়েও অনেক বেশী তত্ত্ব ও তথ্য জানবে, ফলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায়ও আসবে অধিকতর ব্যাপকতা ও গভীরতা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যতোবেশী অগ্রসর হবে, ততোই আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার প্রশস্ততর হবে এবং মানুষ অজানাকে জানবে।

আজকে আমরা পৃথিবীর বিছানা হওয়া ও এতে চলাচলের রাস্তা হওয়া সম্পর্কে এতোদূর জেনেছি যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহটার রূপান্তর ঘটেছে যুগ যুগ কাল ধরে এবং শেষ পর্যন্ত তা মানব জাতির বসবাসযোগ্য (বিছানা সদৃশ) হয়েছে। রূপান্তর চলাকালে এক সময় ভূপৃষ্ঠে শুকনো পাথর থেকে উর্বর মাটিতে পরিণত হয়েছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে ভূপৃষ্ঠে পানি জন্মেছে। সে নিজের কক্ষপথে নিজেরই চারপাশে আবর্তিত হতে হতে তার দিনরাতের উত্তাপ ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে তাকে জীবন ধারণের যোগ্য বানিয়েছে। তার গতিবেগ এমন হয়েছে যে, তার পিঠের ওপর বস্তু ও প্রাণীসমূহ স্থির থাকতে পারে এবং মহাশূন্যে ছিটকে না পড়ে।

এ সত্য থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে মধ্যাকর্ষণ নামক এক শক্তি দিয়েছেন। ফলে সে নিজস্ব পদ্ধতিতে এমন একটা বায়ুস্তর সংরক্ষণ করেছে, যা জীবনের অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। এই গ্রহের চারপাশের বায়ুস্তরে যদি মধ্যাকর্ষণ না থাকতো তাহলে এর পিঠের ওপর জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না যেমন মধ্যাকর্ষণবিহীন অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকেনি, যেমন চাঁদ। মহান স্রষ্টা এই মধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও আবার পৃথিবীর আবর্তন থেকে উদ্ভূত ক্ষেপণ ক্ষমতার সাথে সমন্বিত করেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত প্রাণী ও বস্তুগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ও ছিটকে শূন্যে ছড়িয়ে না পড়ে, আবার সেই সাথে ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী চলাচলও করতে পারে। আকর্ষণ যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হতো, তাহলে বস্তু ও প্রাণী পৃথিবীর সাথে এমনভাবে সেঁটে থাকতো যে, তার নড়াচড়া ও চলাচল করা হয় অসম্ভব হতো, কিংবা তা কঠিন হয়ে পড়তো। অপরদিকে তাদের ওপর বায়ুর চাপও এতোবেশী হতো যে, ওগুলোকে পৃথিবীর সাথে মিশিয়ে দিতো কিংবা পিষে ধ্বংস করে ফেলতো। আবার এই বায়ুর চাপ যদি অতিমাত্রায় হালকা হতো তাহলে আমাদের বুক ও নাড়িভুড়ি ফেটে বেরিয়ে পড়তো।

অনুরূপভাবে পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানানো ও তার ওপর জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির তত্ত্ব থেকে আমরা আরো একটা বিষয় জানতে পারি। সেটা হলো মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে এমন কিছু সহায়ক উপাদান রেখে দিয়েছেন, যা মিলিত হয়ে মানুষের জীবন ধারণকে সম্ভব ও সহজসাধ্য করেছে। এই উপাদানগুলোর কোনো একটারও যদি অভাব ঘটতো, তাহলে এই জীবন ধারণ অসম্ভব অথবা দুঃসাধ্য হয়ে যেতো। এসব অনুকূল উপাদানের মধ্যে কয়েকটার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরো একটা উপাদান হলো, ভূপৃষ্ঠের ওপর সঞ্চিত পানির বড় বড় উৎসগুলো। যথা সাগর, মহাসাগর ইত্যাদিকে আল্লাহ তায়ালা সেসব বিষাক্ত গ্যাস শুষে নেয়ার পর্যাপ্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন, যা ভূপৃষ্ঠে নানা ধরনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়, আর এর আবহাওয়াকে এমন পর্যায়ে রেখেছেন যে, তা পৃথিবী জীবজগতের বাসোপযোগী রয়েছে। আরো একটা উপাদান হলো, জীবজগত জীবন ধারণের জন্যে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং তারা যে অক্সিজেন ত্যাগ করে- সেই উভয় অক্সিজেনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে গাছপালার সৃষ্টি করেছেন। এই ভারসাম্য রক্ষা করা না হলে কিছুকাল পর সকল প্রাণী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতো।

এভাবে 'পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানানো ও তার ওপর রাস্তাঘাট তৈরী করার ব্যাপারটা থেকে আমরা প্রতিনিয়ত আরো বহু তথ্যের সন্ধান পাই। কোরআনের প্রথম শ্রোতারা এ সম্পর্কে যা কিছু তথ্য জানতো, তার সাথে আরো বহু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এ সবই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা বিপুল জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। এ সব থেকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, যতো দূর দৃষ্টি যায় এবং কল্পনা শক্তি যতো দূর কল্পনা করতে পারে- সর্বত্র এক অসীম শক্তিধর ও বিচক্ষণ সত্ত্বা সদা সক্রিয় রয়েছেন। জানা যায় যে, মানুষকে অকারণে সৃষ্টি করা হয়নি এবং তাকে বিনা জবাবদিহীতে ছেড়ে দেয়াও হবে না। মহান আল্লাহর অদৃশ্য হাত তাকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে ও প্রতিটা পদক্ষেপে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন ও ধরে রেখেছেন।

'যেন তোমরা সঠিক পথে চালিত হও।'

অর্থাৎ এই সৃষ্টিজগত ও তার সুসমন্বিত বিধি ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা মানুষের মনকে জগত স্রষ্টার দিকে পরিচালিত করা ও তার সন্ধান দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। সৃষ্টির সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর রহস্যের মধ্যেই তার হেদায়াতের উপাদান সংরক্ষিত রয়েছে।

পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানানো ও তার ওপর রাস্তাঘাট তৈরী করে দেয়ার পর জীবন ও জগতের উন্মেষের দিকে পরবর্তী আয়াতে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'আর যিনি আকাশ থেকে পরিমিত মাত্রায় পানি নামিয়ে এনেছেন ....।' (আয়াত ১১)

আকাশ থেকে যে পানি নামে, সব মানুষই তা দেখে। অথচ এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখেও মানুষ কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তার অন্তরে একটুও আলোড়ন বা শিহরণের সৃষ্টি হয় না। কেননা এগুলো সে সারা জীবন দেখে এসেছে এবং বারবার দেখছে। পক্ষান্তরে রসূল (স.)-এর প্রতিটা ফোঁটাকে গভীর আবেগ উদ্দীপনা ও তীব্র আবেদন সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন। কেননা প্রতিটা ফোঁটা বৃষ্টি মহান আল্লাহর কাছ থেকে নেমে আসছে। আর তাঁর সজীব ও সতেজ অন্তর এই ফোঁটাগুলোতে মহান আল্লাহর প্রাণবন্ত সৃজনী কর্মের স্বাক্ষর হিসাবে প্রত্যক্ষ করতো এবং তার শিল্পী হাতের উপস্থিতি দেখতে পেতো। আল্লাহর সাথে ও মহাবিশ্বে সক্রিয় প্রাকৃতিক বিধানের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে, তারাও এগুলোকে একইভাবে প্রত্যক্ষ করবে বলে আশা করা যায়। কেননা প্রতিটা ফোঁটা এই প্রাকৃতিক বিধানেরই সৃষ্টি, যা মহাবিশ্বে সদা সক্রিয় রয়েছে। প্রতিটা ফোঁটার ওপর সর্বক্ষণ আল্লাহর চোখ ও আল্লাহর হাত কার্যকর রয়েছে। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, আকাশ থেকে নেমে আসা এই পানির উৎস হলো পৃথিবী থেকে উত্থিত সেই বাষ্প, যা মহাশূন্যে ঘনীভূত হয়ে বিরাজ করে। তাহলে কে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলো, কেই বা তাতে পানি

বর্ষালো? আর কেই বা তার ওপর উত্তাপ ও উষ্ণতা ছড়িয়ে রেখেছে? আর উত্তাপ পেলেই বাষ্পে পরিণত হবার স্বভাবটাই বা পানির মধ্যে কে দিয়েছে? বাষ্পকেই বা কে ওপরের দিকে আরোহণ করা ও ঘনীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে অবস্থান করার স্বভাব কে দিলো? প্রকৃতিকেই বা সেই সব বৈশিষ্ট্য কে দিলো, যা সেই ঘনীভূত বাষ্পকে বিদ্যুৎ দিয়ে ভরে দিলো, যার কারণে বৃষ্টি হয়? আর এই বিদ্যুতই বা কী? সেই সব রহস্য ও বৈশিষ্ট্য কী কী, যা বৃষ্টি বর্ষণকে অনিবার্য করে তোলে? আমরা বিজ্ঞান থেকে আমাদের অনুভূতির ওপর এমন অনেক ভারী বোঝা পড়ে থাকা টের পাই, যা আমাদের কাছ থেকে এই বিস্ময়কর প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টি রহস্যকে আড়াল করে রাখে। অথচ এই বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের হৃদয় হওয়া উচিত ছিলো আবেগাপ্লুত ও বিনয়াবনত।

'আর যিনি আকাশ থেকে পরিমিত মাত্রায় পানি বর্ষণ করেন'

অর্থাৎ এই বৃষ্টির পানি (সাধারণত) পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত। এটা এতো বেশী হয় না যে, পৃথিবী ডুবে যাবে। আবার এতো কম হয় না যে, পৃথিবী শুকিয়ে জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। আমরা এই চমকপ্রদ আনুকূল্য দেখতে পাই। আজ আমরা বুঝতে পারি জীবনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা।

'তা দিয়ে আমি মৃত নগরকে পুনরুজ্জীবিত করি।'

অর্থাৎ পানি থেকেই জীবনের উদ্ভব ঘটাই।

'এভাবেই তোমরা পুনরায় জীবিত হবে।'

অর্থাৎ যিনি জীবনের প্রথম স্রষ্টা, তিনিই পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন। আর যিনি মৃত ভূমি থেকে প্রথম জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তিনিই কেয়ামতের দিন পুনরায় প্রাণীদেরকে জীবন দেবেন। জানা কথা যে, প্রথম আরম্ভ থেকে পুনরারম্ভ সহজ। আর আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয়। তার কাছে সবই সহজ।

আর যেসব পশুর মধ্য থেকে তারা একাংশ আল্লাহর জন্যে ও একাংশ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের জন্যে নির্ধারণ করে, আল্লাহ তায়ালা ওগুলোকে এ জন্যে সৃষ্টি করেননি। এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসাবে। তারা নৌকার মতো এগুলোতেও আরোহণ করবে, এগুলোকে অনুগত করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর শোকার আদায় করবে এবং নেয়ামতের উপযুক্ত বিনিময় দেবে। (আয়াত ১২-১৪)

এ আয়াত থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, জোড়া জোড়া হওয়াই জীবনের মূলনীতি। সকল প্রাণীরই জোড়া রয়েছে। এমনকি প্রথম একক জীবকোষের ভেতরেও পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বরঞ্চ এ কথা বলাও হয়তো ভুল হবে না যে, জোড়া জোড়া হওয়া শুধু জীবনের নয় বরং গোটা সৃষ্টি জগতেরই বৈশিষ্ট্য। কেননা জগতের ভিত্তিই হলো একটা নেতিবাচক ইলেকট্রোন ও এ একটা ইতিবাচক প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত অণু। পদার্থ বিদ্যার গবেষণা থেকে এ যাবত এটাই জানা গেছে।

জোড়া জোড়া হওয়া প্রাণী জগতে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালাই মানুষ ও মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

'তিনি নৌকা ও পশুদের মধ্য থেকে তোমাদের ভারবাহী বানিয়েছেন।'

এই কথাটা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা মনোনীত করে তিনি তার ওপর কতো বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং কতো প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন? তারপর এই নেয়ামতের শোকর আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন, যখন নেয়ামত চোখে পড়বে বা ভোগ করা হবে, তখনই নেয়ামতদাতার শোকর আদায় করতে বলছেন। যাতে হৃদয় প্রতিটা কাজের সময় আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকে। (আয়াত ১৩)

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর নেয়ামতের বিনিময়ে অনুরূপ নেয়ামত দিতে সক্ষম নই। আমরা নেয়ামতের বিনিময়ে কেবল শোকরই করতে পারি।

তারপর এ কথাও স্মরণ করতে বলছেন যে, পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর তাদেরকে পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, যাতে এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনকালে সম্পাদিত সকল কাজের প্রতিফল দেয়া হয় এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে অনুগত করে দেয়ার বিনিময়ে শোকর আদায় করা হয়।

'আর আমরা আমাদের প্রভুর কাছে অবশ্যই ফিরে যাবো।'

নেয়ামতদাতার প্রতি এটাই হলো অপরিহার্য আদব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই আদব প্রতিপালনের নির্দেশ দিচ্ছেন। যাতে প্রত্যেক নেয়ামত ভোগ করার সময় তাকে স্মরণ করা হয়। কেননা আমরা নেয়ামতে আপাদমস্তক ডুবে থেকেও আল্লাহকে ভুলে থাকি।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা আচরণবিধি হৃদয়ের প্রশিক্ষণ ও বিবেকের পুনরুজ্জীবনের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এটা নিছক সাময়িক কোনো কাজ নয় যে, শুধু নৌকায় অথবা পশুর পিঠে আরোহণের সময়ই তা করতে হবে কিংবা নিছক কোনো দোয়া কালাম নয় যে বিড়বিড়িয়ে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে দিলেই হবে। এটা সমগ্র মানবীয় চেতনা-অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার নাম, যেন তা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর উপস্থিতির বাস্তবতাকে, তাঁর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাস্তবতাকে, মানব সমাজের প্রতিটি বিষয়ে প্রতিক্ষণে আল্লাহর প্রত্যক্ষ হাত থাকার বাস্তবতাকে এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটা জিনিসকে ভোগ করার ওপর আল্লাহর হাত থাকাকে কার্যকরভাবে অনুভব করে। বস্তুত মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া প্রতিটা জিনিস হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ, যার বিনিময়ে বান্দা কিছুই দেয়নি, দিতেও পারে না। আর আল্লাহর নেয়ামতের এই সার্বক্ষণিক স্মৃতি ও তাঁর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার অনুভূতি থাকাই কেবল যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহর মুখোমুখী হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন সারা জীবনের করা কর্মের হিসাব দিতে হবে- এই অনুভূতি থাকাও জরুরী। এসব চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তা মানুষের মনকে সদা সচেতন রাখতে পারে। ফলে মানুষের মন কখনো আল্লাহর তদারকী সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে না এবং কখনো তাকে ভুলে গিয়ে জড়তা ও স্থবিরতায় আক্রান্ত হতে পারে না।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণা

এরপর মোশরেকদের ফেরেশতা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ও তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করে পূজো করার বিষয়টা আলোচিত হচ্ছে। ফেরেশতারা যে আসলে আল্লাহর বান্দা সে কথা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১৫-২৫)

কোরআন এই ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের অপনোদন করে, তাদের স্বীকৃত মূলনীতি, যুক্তি ও বাস্তবতা দিয়ে তা খন্ডন করে এবং অতীতের যারা এই ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ ও প্রচার করতো, তাদের শোচনীয় পরিণতি দেখিয়েও তা প্রতিহত করে।

প্রথমে বলা হয়েছে, এই ধারণা চরম বিভ্রান্তিকর ও নির্বোধসুলভ এবং এর ভেতরে জাজ্বল্যমান অকৃতজ্ঞতা রয়েছে।

'তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকেই তার শরীক বানিয়েছে। নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্যভাবেই অকৃতজ্ঞ।' (আয়াত ১৫)

বস্তুত ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে ঠাওরানোর অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে বান্দার স্তর থেকে ওপরে তোলা এবং তাদেরকে আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা। অথচ তারা অন্যসব বান্দার মতোই বান্দা, সকল দাসের মতোই দাস। তাদের স্রষ্টা

ও মনিবের সাথে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে গিয়ে তাদেরকে দাসসুলভ বিশেষণ ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষণে বিশেষিত করার কোনো স্বার্থকতা নেই। আল্লাহর সকল সৃষ্টি তাঁর দাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এমতাবস্থায় মানুষ যদি ফেরেশতাকে বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে তাঁর দাস না বলে অন্য কিছু বলে তাহলে সে সন্দেহাতীতভাবে অকৃতজ্ঞ বলে চিহ্নিত হবে।

'নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্যভাবেই অকৃতজ্ঞ।'

এরপর কোরআন তাদেরই স্বীকৃত যুক্তি ও রীতিপ্রথা দিয়ে তাদের দাবীকে খন্ডন করে এবং তাদের সেই নির্বোধসুলভ দাবীর প্রতি বিদ্রূপ করে যাতে করে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে আখ্যায়িত করে।

'তিনি (আল্লাহ তায়ালা) কি নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে একটা শ্রেণীকে নিজের মেয়েরূপে গ্রহণ করলেন, আর তোমাদেরকে ধন্য করলেন ছেলে দিয়ে?'

অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি নিজের জন্য কিছু সন্তান-সন্তুতি গ্রহণ করতেই চেয়ে থাকেন, তাহলে এটা কেমন কথা যে, নিজের জন্যে কন্যা সন্তান গ্রহণ করলেন, আর তাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে কৃতার্থ করলেন? তাদের নিজেদের কন্যা সন্তান হলে তারা যখন বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহর সম্পর্কে তাদের এরূপ দাবী করা কি শোভা পায়?

'তারা দয়াময় আল্লাহর ব্যাপারে যে দৃষ্টান্ত দেয়, সেই কন্যা সন্তান সম্পর্কে যখন তাদের কাউকে সংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়।'

অর্থাৎ যে জিনিসের ব্যাপারে তাদেরকে খবর দিলে তারা বিরক্ত ও মর্মাহত হয়, এমনকি তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং তারা চাপা ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়, সেই জিনিসই তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে– এটা কি আদৌ শোভনীয় ও সম্মানজনক? এটাও কি আদৌ শোভনীয় ও সম্মানজনক যে, তারা আল্লাহর জন্যে এমন সন্তান বরাদ্দ করে, যা অলংকারে মন্ডিত হয়ে পরম আদর-আহ্লাদে প্রতিপালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক বা লড়াইতে অক্ষম প্রমাণিত হয়? অথচ তারা নিজেরা সর্বদা যুদ্ধের পরিবেশে ও যোদ্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা পছন্দ করে।

এভাবে কোরআন তাদেরই বোধগম্য যুক্তি দিয়ে তাদের দাবীকে খন্ডন করে এবং তাদেরকে এই বলে লজ্জা দিচ্ছে যে, তারা নিজেদের জন্যে যা ঘৃণা করে, সেটাই আল্লাহর জন্যে পছন্দ করছে? তারা যদি একান্তই আল্লাহর জন্যে কোনো সন্তান নির্ধারণ করতে চায়, তাহলে অন্তত নিজেদের জন্য যা পছন্দ করে, তা কেন আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে না?

এরপর তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে খন্ডন করা হচ্ছে? তারা দাবী করে যে, ফেরেশতারা নারী জাতীয়। কিসের ভিত্তিতে তারা এ দাবী করে?

'যে ফেরেশতারা দয়াময় আল্লাহর দাস মাত্র, তাদেরকে তারা নারী বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো?'....... (আয়াত ১৯)

অর্থাৎ তারা কি তাদের সৃষ্টিকে সচোক্ষে দেখেছে এবং নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে তারা নারী জাতীয়? সচোক্ষে দেখা একটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বটে। এর ভিত্তিতে কেউ কোনো দাবী করতে পারে। অথচ মোশরেকরা দাবী করতে সক্ষম নয় যে, তারা ফেরেশতাদের সৃষ্টি করতে দেখেছে। তবুও তারা না দেখওে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং এই উদ্ভট দাবী করছে। কাজেই উপস্থিত না থেকে সচোক্ষে না দেখে তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার দায়দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে।

'তাদের সাক্ষ্য লেখা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'

এরপর এই উদ্ভট দাবী অব্যাহত রেখে এর পক্ষে নানা ছলছুতো ও খোঁড়া ওজুহাত তৈরী করা হতো। (আয়াত ২০)

অকাট্য ও অখন্ডনীয় যুক্তিগুলোর সামনে লা-জবাব হয়ে তারা পালানোর চেষ্টা স্বরূপ আল্লাহর ইচ্ছার খোঁড়া ওজুহাত দাঁড় করাতো। তারা দাবী করতো যে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ফেরেশতার উপাসনায় সন্তুষ্ট। তা নাহলে তিনি এটা করতে দিতেন না, বরং বাধা দিতেন।

এ উক্তিটা আসলে সত্যকে খন্ডনের অপকৌশল। এ কথা সত্য যে, সৃষ্টি জগতের যেখানে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই ঘটে। তবে এটাও আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই ঘটেছে যে, তিনি মানুষকে সৎপথ কিংবা অসৎপথ অবলম্বনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাকে সৎপথ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে জানিয়েছেন। আল্লাহর সাথে কুফরি তথা অবাধ্যতা ও বিপথগামিতায় তিনি অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন, যদিও তাকে সুপথগামী অথবা বিপথগামী দুটোই হবার স্বাধীনতা দেয়াও তার ইচ্ছা ছিলো।

মোশরেকরা যখন আল্লাহর ইচ্ছার বরাত দেয়, তখন তাকে নিছক স্ববিরোধিতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেননা তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ তাদের ফেরেশতার পূজায় সন্তুষ্ট। নিশ্চিত হবেই বা কি করে? তারা তো চিরকাল আন্দাজ অনুমান করতেই অভ্যস্ত।

'আমি কি তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো কেতাব দিয়েছি। যাকে তারা শক্তভাবে ধারণ করেছে।'

অর্থাৎ আমার কেতাবের ওপর নির্ভর করেই কি তারা এ দাবী করে থাকে এবং এবাদত করে থাকে?

এভাবে কোরআন এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পিছু নিয়েছে। সে বলছে যে, আকীদা বিশ্বাস কোনো আন্দায-অনুমানের ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর ওহী বা কেতাবই একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে? যে ওহী বা কেতাবের বরাত দিয়ে কথা বলে, একমাত্র সেই নিশ্চিত ও অকাট্য সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

এই পর্যায়ে এসেই কোরআন তাদের এই উদ্ভট বিশ্বাসের একমাত্র উৎস কি তা জানিয়ে দিয়েছে। সে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা কোনো চাক্ষুস দর্শনের ফলও নয় কিংবা কোনো কেতাব বা ওহীর শিক্ষা থেকেও এর উদ্ভব ঘটেনি।

'বরং তারা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটা এই মতাদর্শের ওপর পেয়েছি এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করেই আমরা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছবো।'

এ কথাটা একদিকে যেমন যুক্তিবিহীন ও দুর্বল, অপরদিকে তেমনি কৌতুকপ্রদ ও হাস্যকরও। এটা কোনো চিন্তা ভাবনা, বিচার বিবেচনা ও যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই নিছক অন্ধ অনুকরণ ব্যতিত কিছু নয়। এটা সেই পশুপালের চিত্র তুলে ধরছে, যাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিকেই চলে যায় এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা জানতেও চায় না।

ইসলাম হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্ত ও অবাধ চেতনার আদর্শ। ইসলাম এই অন্ধ অনুকরণের অনুমতি দেয় না। পূর্ব পুরুষের পদাংক অনুসরণ করে পাপাচার ও প্রবৃত্তির গোলামীকে গর্বের বিষয় মনে করাকে অনুমোদন করে না। ইসলামের প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তি, প্রমাণ ও বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য। তারপরই বিশ্বাস ও উপলব্ধির ভিত্তিতে একটা পথ অবলম্বন করতে হবে।

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে অতীতের সেসব জাতির শোচনীয় পরিণতি তুলে ধরা হচ্ছে, যারা মক্কার কোরায়শের মতো এ ধরনের উক্তি করেছে, তাদের মতো অন্ধ অনুকরণ করেছে, নবীর দাওয়াতকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যথোচিতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলা সত্তেও জিদ ও হঠকারিতা অব্যাহত রেখেছে। (আয়াত ২৩, ২৪ ও ২৫)

এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হেদায়াত থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের চরিত্র ও ওজুহাত সকল যুগেই এক ও অভিন্ন। সর্বকালেই তারা পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত এবং কোনো নতুন দাওয়াতকে তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না-তা চাই যতোই উপকারী ও নির্ভুল হোক না কেন, যতোই যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া হোক না কেন। অবশেষে এই গোয়ার্তুমি ও একগুয়েমি এবং এই জিদ ও হঠকারিতার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও চূড়ান্ত বিনাশ ছাড়া আর কিছু হয় না। কেননা কোনোক্রমেই তাদের চোখ খোলে না। কোনো প্রকারেই তাদের মন ও বিবেক পুনর্বিবেচনায় রাযী হয় না এবং চেতনা ফিরে আসে না।

এ হচ্ছে সেই মানব গোষ্ঠীর পরিণতি। এটা এই উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে বর্তমান তাদের চলতি আচরণ পদ্ধতির পরিণাম তাদের জানা হয়ে যায়।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهٖٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِى
فَطَرَنِى فَإِنَّهٗ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾
وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّإِنَّا بِهٖ كٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا
نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ
رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن
يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

রুকু ৩

২৬. যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের তোমরা পূজা করো, ২৭. (হ্যাঁ, আমি এবাদাত শুধু তাঁরই করি) যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, নিসন্দেহে তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। ২৮. সে এ কথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে (তাওহীদের) একটি স্থায়ী ঘোষণা (হিসেবে) রেখে গেলো, যাতে করে তারা (তার বংশের লোকেরা এদিকে) প্রত্যাবর্তন করতে পারে। ২৯. (এ সত্ত্বেও আমি তাদের ধ্বংস করিনি,) বরং আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের (পার্থিব) সম্পদ দান (করা) অব্যাহত রেখেছি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে (আরেকজন) নবী এসে হাযির হয়েছে। ৩০. কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো হচ্ছে যাদু, আমরা তো (কিছুতেই) তা মেনে নিতে পারি না। ৩১. তারা (এও) বললো, এ কোরআন কেন দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না? ৩২. (হে নবী,) তারা কি তোমার মালিকের রহমত বন্টন করছে, (অথচ) আমিই তাদের দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, আমি তাদের একজনের ওপর আরেকজনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সমুন্নত করেছি, যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট (তারা যেসব সম্পদ জমা করে তার চেয়ে বড়ো)। ৩৩. যদি (এ কথার) আশংকা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব কয়টি মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ

لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن

يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ

لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا

قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن

يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنتَ

تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ

بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم

অস্বীকারকারী কাফেরদের ঘরের জন্যে আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার ওপর দিয়ে তারা উঠতো (নামতো), ৩৪. তাদের ঘরের জন্যে (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো, ৩৫. (প্রয়োজনে তা) স্বর্ণ নির্মিতও (করে দিতে পারতাম, আসলে), এর সব কয়টি জিনিসই তো হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; আর (হে নবী,) আখেরাত (ও তার সম্পদ) তোমার মালিকের কাছে (একান্তভাবে, তাদের জন্যে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে।

রুকু ৪

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথী হয়ে থাকে। ৩৭. তারাই অতপর তাদের (আল্লাহ তায়ালার) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, অথচ তারা নিজেরা মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের ওপরই রয়েছে। ৩৮. (এ) ব্যক্তি যখন (কেয়ামতের দিন) আমার সামনে হাযির হবে, তখন (তার শয়তান সাথীকে দেখে) সে বলবে, হায় (কতো ভালো হতো) যদি (আজ) আমার ও তোমার মাঝে দুই উদয়াচলের ব্যবধান থাকতো, (তুমি) কতো নিকৃষ্ট সাথী (ছিলে আমার)! ৩৯. (বলা হবে,) যখন তোমরা (শয়তানকে সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছিলে, তখন (আজও) তোমরা (এই) আযাবে একজন আরেকজনের অংশীদার হয়ে থাকো। (হে নবী), তুমি বলো, আজ এগুলো তোমাদের কোনো রকম উপকারই দেবে না। ৪০. (হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে পারবে, অথবা পারবে কি পথ দেখাতে সে অন্ধকে যে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত? ৪১. অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছ থেকে অবশ্যই (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেবো, ৪২. অথবা তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি তাদের

مُّقْتَدِرُوْنَ ۝٤٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤٣ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ۝٤٤ وَسْئَلْ مَنْ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝٤٥
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ۝٤٧ وَمَا
نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ۝٤٨ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا
لَمُهْتَدُوْنَ ۝٤٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۝٥٠

দিয়েছি (তাতেও এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। ৪৩. অতএব এ গ্রন্থ, যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে– তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছো। ৪৪. নিসন্দেহে এ (কোরআন)-টা তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ উপদেশ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৪৫. (হে নবী,) তোমার আগে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি কি (কখনো তাদের জন্যে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম– যার (আসলেই) কোনো এবাদাত করা যেতো!

রুকু ৫

৪৬. আমি মূসাকেও আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে (তাদের কাছে গিয়ে) বললো, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের রসূল। ৪৭. যখন সে (সত্যি সত্যিই) আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন সাথে সাথে তারা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো। ৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো আগেরটার চাইতে বড়ো, (সবই যখন ব্যর্থ হলো তখন) আমি তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, যাতে করে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে। ৪৯. (আযাব দেখলেই তারা মূসাকে বলতো,) হে যাদুকর, তোমার মালিক তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তার ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, (নিষ্কৃতি পেলে) আমরা সঠিক পথে চলবো। ৫০. অতপর আমি যখন তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা (মূসাকে দেয়া) অংগীকার ভঙ্গ করে বসলো।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫১. (একদিন) ফেরাউন তার জাতিকে ডাকলো এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো), মিসরের রাজত্ব কি আমার জন্যে নয়? এ নদীগুলো কি আমার (প্রাসাদের) নীচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি (কিছুই) দেখতে পাচ্ছো না? ৫২. আমি কি সে ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) নীচু (জাতের লোক) এবং সে তো (নিজের) কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না। ৫৩. (তাছাড়া নবী হলে) তাকে সোনার কংকণ পরানো হলো না কেন, কিংবা তার সাথে দল বেঁধে (আসমানের) ফেরেশতারাই বা কেন এলো না? ৫৪. (এসব বলে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে দিলো, (এক পর্যায়ে) তারা তার কথা মেনেও নিলো; নিসন্দেহে ওরা ছিলো এক নাফরমান সম্প্রদায়ের লোক! ৫৫. যখন তারা আমাকে দারুণভাবে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমিও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম।

রুকু ৬

৫৬. আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তাদের ইতিহাসের (উল্লেখযোগ্য) ঘটনা ও (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

তাফসীর

আয়াত ২৬-৫৬

কোরায়শরা বলতো, তারা হযরত ইবরাহীমের বংশধর। তাদের একথা নিসন্দেহে সত্য। কিন্তু তারা হযরত ইবরাহীমের আদর্শের উত্তরসূরী হিসেবে তারা যে দাবী করতো মোটেই সত্য নয়। কেননা হযরত ইবরাহীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাওহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন। আর এ জন্যেই তিনি নিজের পিতা ও জাতিকে পরিত্যাগ করে দেশান্তরিত হন। উক্ত তাওহীদের ওপরই তার আনীত শরীয়তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্যে তিনি তার বংশধরকে নির্দেশ দেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীমের আদর্শে শেরেকের কোন স্থান ও অবকাশ ছিলো না।

সূরার এ অংশটাতে এই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা হয়েছে। যাতে তার আলোকে কোরায়শের দাবীর যথার্থতা যাচাই করা যায়। এরপর রসূল (স.)-এর ওপর তাদের আপত্তি ও

অভিযোগ তুলে ধরা হয়। তারপর পর্যালোচনা করা হয় তাদের এই উক্তিটার। 'এই কোরআন দুই শহরে একজন মান্য গন্য ব্যক্তির ওপর নাযিল করা হলো না কেন?' তাদের এই উক্তিটার এবং এর ভেতরে যে ভ্রান্ত মূল্যায়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সত্যটা তুলে ধরার পর তাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার আগে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের এই হঠকারিতার কারণ হলো শয়তানের কুপ্ররোচণা। সবার শেষে রসূল (স.)-কে তাদের হঠকারিতা ও উপেক্ষা সম্পর্কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অন্ধকে পথ দেখানো ও বধিরকে কথা শোনানো তাঁর ক্ষমতার অতীত। অচিরেই তারা এর প্রতিফল পাবে, চাই তা আল্লাহর প্রতিশোধই হোক, অথবা সে প্রতিশোধকে বিলম্বিত করা হোক। এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহীকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা সকল নবীর ওপর নাযিল হতো। সকল নবী ও রসূল তাওহীদের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। (আয়াত ৪৫)

এরপর হযরত মূসার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে আরবরা তাদের রসূলের সাথে যে আচরণ করেছে, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এ যেন একই ঘটনা একই আপত্তির পুনরাবৃত্তি। আর ফেরাউনের কার্যকলাপের সাথে আরবের মোশরেকদের কার্যকলাপের কত গভীর মিল লক্ষ্য করুন।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রাণপুরুষ ইবরাহীম (আ.)

'যখন ইবরাহীম তার জাতিকে ও পিতাকে সম্বোধন করে বললো, আমি তোমাদের উপাস্যদের থেকে মুক্ত। (আয়াত ২৬-২৮)

যে তাওহীদের দাওয়াতকে আরবের মোশরেকরা না জানার ভান করতো, তা হচ্ছে তাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের দাওয়াত। এই দাওয়াত দিয়েই তিনি তার পিতা ও স্বজাতির সাথে সংঘাতের সূচনা করেন। তাদের বাতিল আকীদার বিরোধিতা করেন। তাদের পুরুষানুক্রমিক এবাদাত উপাসনার অনুকরণ থেকে বিরত থাকেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সেই পৌত্তলিক ধ্যান ধারণা থেকে নিজের সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করেন, যা অত্যন্ত বিব্রতকর ও অসৌজন্যমূলক মনে হয়েছিলো।

হযরত ইবরাহীমের উক্তি (২৬ নং আয়াত) এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য সমস্ত উপাস্যের উপাসনা থেকে তার সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা থেকে বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। তার সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতো এবং অন্যান্যদেরও উপাসনা করতো। তিনি তাদের যাবতীয় এবাদাতকে প্রত্যাখ্যান করলেন কেবল আল্লাহর এবাদাত ছাড়া। তিনি আল্লাহর সেই গুণটার উল্লেখ করলেন, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা মূলত এবাদাতের উপযুক্ত সাব্যস্ত হন। সেই গুণটা হলো, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি এবাদাত পাওয়ার যোগ্য যে, তিনি স্রষ্টা। তিনি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এই প্রত্যয়ও ব্যক্ত করলেন যে, তিনি তাকে হেদায়াত করবেন। কেননা তিনি তার সৃষ্টিকর্তা। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেনই এ জন্য যে, তাকে হেদায়াত দান করবেন। আর কিভাবে হেদায়াত দান করবেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন।

হযরত ইবরাহীমের এই উক্তি মানব জাতির জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাওহীদের এই কালেমার পক্ষে গোটা সৃষ্টিজগত সাক্ষ্য দিয়েছিলো। (আয়াত ২৮)

তাওহীদের এই কলেমাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে তা তার বংশধরদের মাধ্যমেই পৌছানোর ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। তার বংশধরের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক নবী ও রসূল এ কাজ করেন। তন্মধ্যে তিনজন সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান ও দৃঢ়চেতা, হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ

(স.)। আর বর্তমানে বহু শতাব্দী পর, বড় বড় ধর্মের অনুসারীদের মধ্য থেকে একশো কোটিরও বেশী লোক হযরত ইবরাহীমের তাওহীদী কাফেলার অনুসারী। তারাই এই কালেমাকে পরবর্তীকালের মানুষের জন্যে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের মধ্য থেকে যতো মানুষই বিপথগামী হোক, হতে পারে। কিন্তু এই কালেমা কখনো নষ্ট হবে না, কালেমা যেমন ছিলো তেমনই থাকবে এবং বাতিলের সাথে তার কোনো সংশ্রব থাকবে না। 'যাতে তারা ফিরে আসে।' অর্থাৎ তাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে আসে, অতপর তাকে চিনে নেয় ও তার এবাদাত করে, ফিরে আসে একক সত্যের দিকে এবং তাকে আঁকড়ে ধরে।

মানব জাতি হযরত ইবরাহীমের পূর্ব থেকেই তাওহীদের বাণীর সাথে পরিচিত হয়েছিলো। কিন্তু হযরত ইবরাহীমের পরে ছাড়া তা স্থীতিশীলতা লাভ করেনি। হযরত নূহ, হূদ, সালেহ এবং সম্ভবত হযরত ইদ্রিসের মুখ দিয়েও তাওহীদের বাণী প্রচারিত হয়। এ ছাড়া আরো বহু নবী ও রসূল ছিলেন। কিন্তু তাদের পর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সাথে এই কলেমা প্রচার করা হয়নি। একমাত্র হযরত ইবরাহীমের মুখ দিয়ে প্রচারিত হবার পরই তা পরবর্তী যুগে অব্যাহতভাবে প্রচারিত হতে থাকে। তারপর একের পর এক নবী ও রসূলরা আসতে থাকেন। মাঝে কোনো বিরতি বা ছেদ ঘটেনি। তার সর্বশেষ ও তার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাইলের বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন শেষ রসূল এবং তাওহীদের কলেমাকে তিনি সর্বশেষ সবচেয়ে ব্যাপক ও পূর্ণাংগরূপে তুলে ধরেছিলেন। এই কলেমার পেছনে সমগ্র মানব জীবন আবর্তিত হতে থাকে এবং মানুষের প্রতিটা কাজে ও চিন্তায় তার প্রভাব পড়তে থাকে।

এই হলো হযরত ইবরাহীমের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের কাহিনী। তিনি সেই হযরত ইবরাহীম, যার বংশধর হবার দাবী করে আরবরা গর্ববোধ করতো। আর এই হচ্ছে তাওহীদের সেই কালেমা, যাকে হযরত ইবরাহীম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যান। এই কলেমা হযরত ইবরাহীমেরই বংশোদ্ভূত একজনের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয়ে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত চলে এসেছে। এমতাবস্থায় যারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের বংশধর ও তাঁর আদর্শের উত্তরসূরী বলে দাবী করে, এই কালেমার আহবানে তাদের কিভাবে সাড়া দেয়া উচিৎ ছিলো, তা কারো কাছেই অজানা নয়।(১)

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে আরবরা হযরত ইবরাহীমের আদর্শকে ভুলে গিয়েছিলো এবং তাদের ভেতরে তাওহীদের কালেমা অজানা অচেনা হয়ে গিয়েছিলো। এই কালেমার প্রচারককে তারা অত্যন্ত খারাপ অভ্যর্থনা জানায় এবং আল্লাহর কাছ থেকে আগত রেসালাতকে তারা পার্থিব মানদন্ডে মূল্যায়ন করে। ফলে তাদের হাতে সমস্ত মানদন্ডই ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়। (আয়াত ২৯-৩২)

রেসালাত অস্বীকারে পাপিষ্ঠদের টালবাহানা

হযরত ইবরাহীমের কাহিনী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'বরং আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে জীবন ভোগের উপকরণ দিয়েছিলাম। অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এসে গেলো।' (আয়াত ২৯)

অর্থাৎ ইবরাহীমের কাহিনী রাখো। কেননা তার সাথে এদের কোনো সম্পর্কই নেই। এখন আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে আরবদের অবস্থার দিকে, যার সাথে ইবরাহীমের অবস্থার কোনোই মিল নেই। এরা ও এদের পূর্ব পুরুষেরা পার্থিব জীবনে অনেক ভোগের উপকরণ পেয়েছে। অবশেষে যখন এই কোরআনে তাদের জন্যে সত্যের বাণী এলো এবং তাদের কাছে একজন সুস্পষ্ট

(১) হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, নবীদেরকে আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। ...... হযরত ইবরাহীমকে দেখলাম, তিনি তোমাদের সহচরের সাথে [অর্থাৎ মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে] সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

বর্ণনাকারী রসূল এলেন, যিনি তাদের কাছে এই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন, তখন তারা তাকে অস্বীকার করলো। (আয়াত ৩০)

সত্য কখনো যাদুর সাথে মিশ্রিত হয় না। সত্য স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট কোরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করাটা যে তাদের একেবারে ভ্রান্ত কথা, তা তারা বুঝতে পেরেছিলো। কোরআন যে অকাট্য সত্য, সে কথা কোরায়শ নেতাদের মোটেই অজানা ছিলো না। তারা শুধু জনগণকে ধোঁকা দিতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো যে, এটা যাদু। আর এর প্রতি তাদের কুফরির কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করতো। তারা বলতো, 'আমরা একে অস্বীকার করি।' এ কথা বলে জনগণকে বুঝাতো যে, তাদের কথায় কোনো দোদুল্যমানতা বা সন্দেহ নেই এবং তারা যা বলছে, সে ব্যাপারে তারা আপোষহীন। এতে সাধারণ আরবরা তাদের অনুসারী ও অনুগত হবে বলে তাদের ধারণা ছিলো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার এই স্বভাবটা সর্বযুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থাকে। কেননা তারা ভয় পায় যে, তা না হলে জনগণের ওপর তাদের কোনো প্রভাব থাকবে না এবং তারা তাওহীদের ওপর ঈমান আনবে। আর এই তাওহীদের কলেমায় যে বিশ্বাসী হয় তার চোখে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কোনো মূল্য থাকে না এবং সে আর কারো গোলামীও করে না এবং কাউকে ভয়ও পায় না।

এরপর কোরআন তাদের অতি নিম্নমানের মানদন্ড ও মূল্যবোধের উল্লেখ করে এবং মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল নিয়োগে তারা যে আপত্তি জানিয়েছিলো তা তুলে ধরে।

'তারা বলে এই কোরআন দুই শহরের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না কেন?

দুই শহর দ্বারা তারা মক্কা ও তায়েফকে বুঝাতো। রসূল (স.) কোরায়শ বংশের মধ্যমনি ছিলেন। তিনি বনু হাশেমেরও মধ্যমনি ছিলেন। আর এই কোরায়শ বংশটা ছিলো আরবের মধ্যে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশ। ব্যক্তিগতভাবেও রসূল (স.) তার সমাজে নবুওতের পূর্ব থেকেই উচ্চ নৈতিক চরিত্রে ভূষিত ছিলেন। তবে তিনি কোনো গোত্রের সরদার ছিলেন না। অথচ এ ধরনের পদ তখন খুবই সম্মানজনক পদ ছিলো। 'দুই শহরের কোনো মান্য গন্য ব্যক্তি' কথাটা দ্বারা তারা এটাই বুঝিয়েছিলো।

আসলে কাকে রসূল নিয়োগ করতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। রেসালাতের উপযুক্ত যে ব্যক্তি, তাকেই তিনি মনোনীত করেছেন। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা এটা চাননি যে, রেসালাতের জন্যে অন্য কোনো পার্থিব মানদন্ড থাকুক। তাই তিনি এমন ব্যক্তিকে রসূল নিয়োগ করলেন, যার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য ছিলো চরিত্র। এটাই ইসলামী দাওয়াতের প্রধান স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। দাওয়াতের বাস্তবতা এরই দাবী জানায়। তাঁকে তিনি কোনো গোত্রের প্রধান, কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অথবা কোনো ধনবান ব্যক্তিরূপে মনোনীত করলেন না যাতে করে ইসলামী দাওয়াতের পদমর্যাদার সাথে অন্য কোনো দুনিয়াবী পদমর্যাদা মিলেমিশে একাকার হয়ে না যায়।

অর্থনৈতিক তারতম্যের ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্য

আরবের মোশরেকরা মোহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের বাহানা তুলে তারা রেসালাত অস্বীকার করার ফন্দি আঁটছিলো। আসলে পার্থিব ভোগ বিলাসিতায় যারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে এবং যারা ঊর্ধজগতের আহ্বানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি, তারাই এ ধরনের অভিযোগ করে, 'কোরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?' (আয়াত ৩১)

যারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে, যারা আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারে অভিযোগ করে, যারা ইহজগতের মূল্যবোধ আর উর্ধজগতের মূল্যবোধকে এক করে

দেখে, পবিত্র কোরআন তাদের এই অভিযোগকে খন্ডন করে, এর নিন্দা জানায়। আল্লাহর মানদন্ডে আল্লাহর দৃষ্টিতে এই মূল্যবোধের স্বরূপ কি, এর সঠিক মর্যাদা কী তা বর্ণনা করছে।

'তারা কি তোমার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি।' (আয়াত ৩২)

ওরা তোমার পালনকর্তার রহমত বন্টন করতে চায়? কি অদ্ভূত ব্যাপার, তোমার পালনকর্তার রহমতের সাথে ওদের কী সম্পর্ক? ওরা নিজেরাই তো নিজেদের কোনো কিছুরই মালিক নয়। ওরা তো নিজেদের জীবিকার যোগানই দিতে পারে না। এমনকি পৃথিবীর বুকে তারা যে সামান্য জীবিকার মালিক বনে আছে সেটাও আমি দিয়েছি। এই জীবিকা আমিই দিয়েছি বিশেষ নিয়মের অধীনে এবং পরিমাণমত বন্টন করেছি শুধু পৃথিবীটা আবাদ করার জন্যে, এই জীবনের বিকাশের জন্যেই আমার এই ব্যবস্থা।

পার্থিব জীবনে জীবিকার ব্যাপারটি নির্ভর করে ব্যক্তির প্রতিভার ওপর, পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর। ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে জীবিকা বন্টনের অনুপাতে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তা ওই সব কয়টি উপাদানের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে। এই পার্থক্য বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, আর সেটাও হয়ে থাকে সেই সমাজের প্রচলিত নিয়ম নীতি ও এর সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু সমাজে এ বৈশিষ্ট্যটি এখনও অবশিষ্ট আছে, এমনকি সেই সব সমাজেও যা উৎপাদন ও বন্টন নির্ভর মতবাদ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, সেখানেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জীবিকায় বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের কারণ সমাজ ও নীতির বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হলেও এই বৈষম্য কিন্তু আজও অবিকল সেভাবেই আছে। সমাজের সকল সদস্যের জীবনমান একই পর্যায়ের হয়েছে এমনটি কখনও হয়নি। এমনকি সেই উৎপাদন ও বন্টন নির্ভর কৃত্রিম সমাজেও হয়নি। তাই এই সত্যটির প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে,

'এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি।'

প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক পরিবেশে এবং প্রত্যেক সমাজে এই বৈষম্যের পেছনে যে গভীর তাৎপর্যটি কাজ করছে তা হলো, 'যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে।'

অর্থাৎ যাতে তোমরা একে অপরকে কাজে লাগাতে পারো। জীবন চাকা যখন ঘুরে তখন মানুষ নিশ্চয়ই একজন আরেকজনকে কাজে লাগায়। এই কাজে লাগানোর কারণে কেউ কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। এর কারণে শ্রেণী শ্রেণীর ওপর এবং ব্যক্তি ব্যক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করবে, এমনটি কখনও হতে পারে না। এটা যারা মনে করে তারা নির্বোধ। আল্লাহর অমর বাণীর এমন অর্থ গ্রহণ করা মোটেও সমীচীন নয়। এই অমর বাণীর মর্ম মানব সমাজের যাবতীয় পরিবর্তন ও বিবর্তনের উর্ধে থাকবে এবং পরিস্থিতির বিবর্তন আবর্তনেরও উর্ধে থাকবে। এতে সন্দেহ নেই, প্রত্যেক মানুষ একে অপরকে সেবা করে যাচ্ছে। এরই ফলে জীবনের চাকা ঘুরছে। সকল অবস্থায় এবং সকল পরিস্থিতিতে মানুষ একে অপরকে সেবা করে যাচ্ছে। অসচ্ছল ব্যক্তির কাছ থেকে সচ্ছল ব্যক্তি সেবা পাচ্ছে। এর বিপরীতও মাঝে মাঝে দেখা যায়, অর্থাৎ অসচ্ছল ব্যক্তিও সচ্ছল ব্যক্তির কাছ থেকে সেবা পাচ্ছে। কারণ, সে নিজের প্রয়োজন মেটানোর মতো অর্থ তার কাছ থেকে পাচ্ছে। এই হিসেবে উভয়ই উভয়ের কাছ থেকে সেবা পাচ্ছে এবং একে অপরকে কাজে লাগাচ্ছে। সম্পদের পার্থক্যের কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আর এরই ফলে জীবন গতিশীল। একজন শ্রমিক যখন কাজ করে তখন তার এই কাজ হয় সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং মালিকের জন্যে। ওদিকে প্রকৌশলী যখন কাজ করে, তখন তার এই কাজ হয় শ্রমিকের জন্যে এবং মালিকের জন্যে। আবার মালিক নিজে যখন কাজ করে, তখন তার এই কাজ হয় শ্রমিকের

জন্যে এবং প্রকৌশলীর জন্যে। মোটকথা, শ্রমিক, মালিক এবং প্রকৌশলী প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে কাজ করছে। এদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজ থেকে সেবা গ্রহণ করছে। আর এভাবেই তারা সকলেই পৃথিবীর চাকা সচল রাখছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রতিভা ও যোগ্যতার তারতম্যের কারণে, অনেকটা জীবিকা ও কাজের তারতম্যের কারণে।

আমার ধারণা, আধুনিক মতবাদের প্রচারকদের অনেকেই এই আয়াতটিকে ইসলামের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কোনো কোনো মুসলমানও এই আয়াতটির সামনে এসে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। ভাবখানা এই, যেন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ তারা খন্ডন করছে।

আমি মনে করি, মুসলমানদের উচিত নিজেদের জীবন বিধানকে নিয়ে হীনমন্যতায় না ভোগা, আত্মরক্ষার মনোভাব নিয়ে না চলা; বরং তাদের উচিত মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। কারণ, ইসলাম সেসব শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে যা প্রকৃতির সাথে মিশে আছে, যা ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বিধানেরই অধীন।

ব্যক্তির প্রতিভার তারতম্য এবং ব্যক্তির কর্মক্ষমতার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করেই এই মানব জীবন টিকে আছে। এই পৃথিবীকে আবাদ করতে হলে এবং এই পৃথিবীকে সচল রাখতে হলে কর্ম, যোগ্যতা ও প্রতিভার এই তারতম্যের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক মানুষ যদি একে অপরের সমপর্যায়ের হতো, তাহলে পৃথিবী এখন যেভাবে চলছে, সেভাবে কিছুতেই চলতে পারতোনা। এমন অনেক কাজই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো যা সম্পূর্ণ করার মতো যোগ্য লোক পাওয়া যেতো না। যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন, তিনি এর অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান, এর বিকাশ চান। তিনি বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভা সৃষ্টি করেছেন। যোগ্যতা ও প্রতিভার বিভিন্নতার কারণে সম্পদের মাঝেও পার্থক্য হয়। এটাই নিয়ম। তবে সম্পদের মাঝে যে পার্থক্য ও বৈষম্য দেখা যায় তাও আবার একপর্যায়ের নয়। একেক সমাজ একেক নিয়মের অধীনে চলছে, কিন্তু সর্বত্রই তা জীবনের বিকাশের জন্যে আবশ্যক প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এ কারণেই আজ পর্যন্ত কোনো কৃত্রিম ও বানোয়াট জীবন ব্যবস্থা বা মতবাদের ধারকরা একজন শ্রমিক ও প্রকৌশলীর বেতনের মাঝে যে বিস্তর ব্যবধান থাকে, তা দূর করতে পারেনি। এমনিভাবে একজন সাধারণ সৈনিক ও একজন সেনানায়কের বেতন ও ভাতাদির মধ্যকার বৈষম্যও তারা দূর করতে পারেনি। অথচ তারা বৈষম্যহীন তথাকথিত সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে নিজেদের সেই মনগড়া মতবাদ বাস্তবায়িত করার জন্যে কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের সামনে তারা সবাই হেরে গেছে। এই নিয়মের বাস্তবতাকেই পবিত্র কোরআনের এই আলোচ্য আয়াতটি প্রতিষ্ঠিত করছে, এই আয়াত জীবনের জন্যে অপরিহার্য একটা চিরন্তন নিয়মের পরিচয়ই এখানে তুলে ধরেছে। পার্থিব জগতে জীবন ও জীবিকার এটাই নিয়ম। কিন্তু এর বাইরে আরও একটি জিনিস আছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও দয়া। তাই বলা হচ্ছে,

'তারা যা সঞ্চয় করে, তোমার পালনকর্তার রহমত তা অপেক্ষা উত্তম'

এই রহমত তিনি কেবল তাদেরকেই দান করেন, যাদেরকে তিনি এর উপযুক্ত বলে মনে করেন। দুনিয়ার ধন-সম্পদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনিভাবে এই জাগতিক জীবনের কোনো মূল্যবোধের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এসব মূল্যবোধ আল্লাহ তায়ালার কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য। এ কারণেই জাগতিক জীবনের ধন-সম্পদে ভাল ও মন্দ সবাই সমান। এই ধন-সম্পদের মালিক একজন সৎলোকও হতে পারে এবং একজন অসৎ লোকও হতে পারে। অপরদিকে আল্লাহর রহমত কেবল তারই বিশেষ বিশেষ বান্দা ছাড়া আর কেউ পাবে না।

এই পার্থিব জগতের ধন সম্পদ আল্লাহর কাছে এতোই তুচ্ছ ও নগন্য যে, তিনি একজন কাফেরকেও তা অঢেল পরিমাণে দিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা। সেই সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'যদি মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো.........।' (আয়াত ৩৩-৩৫)

দুনিয়ার ধন দৌলত ও ভোগ বিলাসিতার প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ আছে। এটা মানবিক দুর্বলতা, এই দুর্বলতার কথা আল্লাহ তায়ালা জানেন। তিনি ভালো করেই জানেন, এই ধন দৌলত ও ভোগ বিলাসিতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয় এবং ঈমানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যদি এমন আশংকা না থাকতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এমন অট্টালিকা দান করতেন যার ছাদ হতো রূপার, সিঁড়িগুলো হতে স্বর্ণের, যার অসংখ্য দরজা থাকতো এবং হেলান দিয়ে বসার জন্যে স্বর্ণখচিত বাহারী পালংক থাকতো। অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং জাগতিক বিলাস সামগ্রী আল্লাহর কাছে এতোই তুচ্ছ ও নগণ্য যে, তিনি একজন কাফেরকেও এসব দিতে পারেন। কারণ,

'এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র।'

অর্থাৎ এসব হচ্ছে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এর স্থায়িত্ব পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাই এসব পার্থিব জীবনের জন্যেই মানায়।

অপরদিকে পরকালীন জীবনের সুখ শান্তি হচ্ছে কেবল তাদের জন্যেই, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে। এই আল্লাহভীতির জন্যেই পরকালে তারা সম্মান পাবে, মর্যাদা পাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এই সম্মান ও মর্যাদা পরকালের জন্যে সঞ্চয় করে রাখছেন, যা হবে চিরস্থায়ী ও অধিকতর মূল্যবান। তাদের এই মর্যাদা কাফেরদের মান মর্যাদার তুলনায় উর্ধের ও অনেকটা স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। কারণ কাফেরদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে সেসব তুচ্ছ ও মূল্যহীন সামগ্রী দান করেন যা তিনি অন্যান্য প্রাণীকেও দান করে থাকেন।

দুনিয়ায় ধন দৌলত, ভোগ বিলাসিতা ও জৌলুস অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এর ফলে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে যখন তারা দেখে, পাপীরা এসব ভোগ করছে, আর সৎলোকেরা এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছে, অথবা যখন দেখে, সৎ লোকেরা অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করছে, আর অসৎ ও পাপী-তাপী লোকেরা ধন দৌলত, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক বনে আছে। আল্লাহ তায়ালা জানেন, এসব বিষয় মানুষের মনে নানা অশুভ প্রভাবের সৃষ্টি করে। তাই তিনি মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব মূল্যহীন ও মর্যাদহীন; এসব তুচ্ছ ও নগন্য। অপরদিকে পরকালে সৎলোকদের জন্যে যা কিছু রাখা আছে তা অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ। এই প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা জানার পর মোমেনদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং সৎ ও অসৎ লোকদের জন্যে তিনি যা পছন্দ করে রেখেছেন, সে ব্যাপারেও তাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়।

এই পার্থিব জগতের ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিত একজন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন বলে যারা অভিযোগ করতো, যারা ধন সম্পদ ও পদের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করতো, তারা এসব আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারছে যে, পার্থিব জীবনের ধন সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী কতো তুচ্ছ ও নগন্য, তাই সেগুলো এমন লোকদেরকেও দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, পার্থিব ধন দৌলত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দের পরিচয় বহন করে না।

এভাবেই পবিত্র কোরআন প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে এবং এর যথার্থ স্থান নির্ণয় করে দেয়। সাথে সাথে ইহকাল ও পরকালে মানুষের প্রাপ্য জীবিকা বন্টনের আল্লাহর বিধানের স্বরূপ কি, তার ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং আল্লাহর কাছে চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি, তার পরিচয় তুলে ধরে। যারা মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালতের ব্যাপারে আপত্তি করে এবং যারা ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীদেরকে ভক্তি করে তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআন এসব বক্তব্য তুলে ধরেছে।

আলোচ্য আয়াত আমাদের সামনে এমন কিছু মৌলিক নীতি এবং চিরন্তন বাস্তব সত্য তুলে ধরছে যা স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনশীল, যা জীবনের বিবর্তন, ব্যবস্থার তারতম্য, মতবাদের বিভিন্নতা এবং পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে প্রভাবিত হয় না। তাই বলা যায়, জীবনের এমন কিছু নিয়মনীতি আছে যা স্থিতিশীল, যাকে কেন্দ্র করে জীবন আবর্তিত হয়। গতিশীল হয়, তবে জীবনকে তার নিজস্ব সীমারেখা থেকে বিচ্যুত করে না। যারা পরিবর্তনশীল জগত ও পরিবেশের কারণে চিরন্তন বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে অক্ষম, তারা কখনও এই আল্লাহর বিধানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, যা জীবনের মূল কাঠামোতে এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার মাঝে সমন্বয় সাধন করে। তারা মনে করে, সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। স্থিতিশীল বলতে এখানে কিছু নেই, অব্যাহত বিবর্তন ধারাই হচ্ছে তাদের কাছে চিরন্তন সত্য। কিন্তু যারা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, তারা মনে করে জীবন ও জগতের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি দিকে স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে সত্যটি উচ্চারণ করেছেন, তাই সত্য এবং তাই বাস্তব। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে যে, মানুষের জীবন ও জীবিকার মাঝে যে বৈষম্য দেখতে পাই তা স্থিতিশীল। অপরদিকে এই বৈষম্যের যে অনুপাত ও কারণ বিভিন্ন সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থায় দেখতে পাই তা পরিবর্তনশীল। স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার প্রমাণ এই উদাহরণ ছাড়া আরও অনেক আছে।

শয়তানকে যখন মানুষের সহচর বানিয়ে দেয়া হয়

যখন স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী আল্লাহর কাছে মর্যাদাহীন এবং কোনো অসৎ ও পাপী লোক এসবের মালিকানা লাভ করলে তা দ্বারা তার মর্যাদা ও কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না, তখন সাথে সাথে সেসব লোকদের পরিণতি কিভাবে ভালো হতে পারে যারা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করা সত্তেও এবং যেকের থেকে গাফেল থাকা সত্তেও এসব ধন সম্পদের অধিকারী হয়, ভোগ বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। এদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই.............।' (আয়াত ৩৬-৩৯)

আরবী ভাষায় 'আশা' চোখের এক ধরনের রোগকে বলা হয়। যার ফলে মানুষ সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো সহ্য করতে পারে না। এর ফলে মানুষ রাতের অন্ধকারেও দেখতে পায় না। এদেরকে রাতকানা বলা হয়। এখানে এই শব্দ দ্বারা মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি উভয়টির বৈকল্যের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। ফলে এ জাতীয় মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়, আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর খবরদারীর বিষয়টি মনেপ্রাণে অনুভব করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই.....।'

এটাই আল্লাহর বিধান। এই বিধানের দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়বে তখন শয়তানকে নিজের সহচর হিসেবে পাবে। সারাক্ষণ এই শয়তান তার সাথে থাকবে, তাকে কুমন্ত্রণা দেবে, মন্দকে তার সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে। আলোচ্য আয়াতে একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে এই সত্যটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যখনই আল্লাহর স্মরণের ক্ষেত্রে গাফলতি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ পাবে তখনই অনিবার্য ফল স্বরূপ শয়তানের সাহচর্য্য ভাগ্যে জুটবে। এটা আল্লাহর ফয়সালা।

অসৎ সংগী হিসেবে শয়তান যখন কারও সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকবে তখন তাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। অথচ সে মনে করবে সে সঠিক পথেই আছে। বলা হচ্ছে,

'শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর মানুষ মনে করে, তারা সৎপথে রয়েছে।' (আয়াত ৩৭)

শয়তান তার সংগীর সাথে কি ঘৃণ্য আচরণ করছে। তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনছে আবার তাকে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার মাঝে ডুবিয়ে রাখছে যেন সে তার ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় সঠিক পথে ফিরে না আসতে পারে। তার মনে এই ধারণা দিচ্ছে যে, সে সঠিক পথে এবং কাংখিত লক্ষ্যেই ছুটে চলছে। ফলে ভুলপথে চলতে চলতে এক সময় সে দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হবে অথচ সে বুঝতেও পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে ঘটমান বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে.......।' তাঁরা মনে করে' ......ইত্যাদি। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, শয়তানের এই ক্রিয়াকান্ড এখনও অব্যাহত চলছে যা অন্যরা দেখছে। কিন্তু যারা শয়তানের জালে আটকা পড়ে ভুলপথে চলছে কেবল তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু যখন এই ভুলের পরিণতি হঠাৎ করেই সামনে আসবে তখন তাদের করার আর কিছুই থাকবে না। তাই বলা হচ্ছে, 'অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে.......।' (আয়াত ৩৮)

আর এভাবেই আমরা এক নিমিষে ইহজগতের দৃশ্য থেকে পরকালের দৃশ্যে চলে আসলাম। হইজগতের দৃশ্যের এখানেই সমাপ্তি ঘটছে। এখানে আমরা নতুন দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। এই দৃশ্যে সেই অন্ধ ও গাফেল ব্যক্তির শেষ পরিণতি দেখতে পাচ্ছি। এখানে এসে হঠাৎ করেই তার অন্ধত্ব ঘুচে যায়। এখন সে তার অসৎ সংগীকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, যে তাকে ভুল পথে চালিয়ে বলেছিলো যে, সে ঠিক পথেই চালাচ্ছে, যে তার মন্দ কাজকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপে দেখিয়েছিলো আর এভাবেই সে তাকে ধ্বংসের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ সারাপথ সে তাকে শান্তির বাণী শুনিয়েছে।

সে অত্যন্ত রাগের চোখে তাকিয়ে সেই অসৎ সংগীকে লক্ষ্য করে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব থাকতো।' অর্থাৎ আমাদের মাঝে যদি কোনো সাক্ষাতই না ঘটতো।

এরপর সে তার সংগীকে 'কত হীন সংগী' বলে মন্তব্য করে। তার এই মন্তব্য পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে।

এই দৃশ্যের যবনিকা পতনের মুহূর্তে নেপথ্য থেকে উভয়ের জন্যে যে হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি তা হলো, 'তোমরা যখন যুলুম করছিলে, তখন আজকের তোমাদের সবাইকেই আযাবে শরীক হতে হবে, আজ কিছুই কোনো কাজে আসবে না।' (আয়াত ৩৯)

অর্থাৎ উভয়ের জন্যে আযাব পরিপূর্ণরূপে হবে। কেউ কারও শাস্তি ভাগা-ভাগি করে নিয়ে অপরের শাস্তি লাঘব করতে পারবে না।

দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধতা ও জবাবদিহীতা

এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির দৃশ্যপট থেকে সরে গিয়ে এখন প্রসংগ চলে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স.) -এর দিকে। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে সান্ত্বনাবাণী শুনাচ্ছেন। ওহীর মাধ্যমে তাঁকে যে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তার ওপর অনড় ও অটল থাকতে আদেশ করছেন। কারণ এই নির্দেশনা সত্য ও চিরন্তন, এই নির্দেশনা প্রত্যেক নবীকেই দেয়া হয়েছে। এ প্রসংগে বলা হচ্ছে,

'তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে কি পথ প্রদর্শন করতে পারবে?......... (আয়াত ৪০-৪৫)

এই ধরনের সান্ত্বনাবাণী পবিত্র কোরআনে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তাঁকে জানানো হয়েছে যে, হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে সম্পর্কিত, এ ব্যাপারে নবী-রসূলদের করণীয় কিছুই নেই। তাকে আরও জানানো হয়েছে যে, নবুওয়তের উচ্চতর মর্যাদা লাভের পরও নবী-রসূলরা সীমিত মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অবাধ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এই সান্ত্বনাবাণীর পাশাপাশি আলোচ্য আয়াতে তাওহিদের সূক্ষ্ম অর্থটিও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন

'তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে কি পথপ্রদর্শন করতে পারবে?'

বলা বাহুল্য, আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা সত্যিকার অর্থে অন্ধ ও বধির নয়। কিন্তু তারা অন্ধ ও বধিরদের মতই। কারণ তারা সত্য পথ দেখতে পায় না এবং সত্য বাণী শুনতে পায় না। আর রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে, যে শুনতে পায়, তাকে শুনানো এবং যে দেখতে পায়, তাকে পথ দেখানো। এখন যদি কারও অংগ-প্রত্যংগ বিকল হয়ে পড়ে এবং তার হৃদয় ও আত্মার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে এদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার সামর্থ্য রসূলের থাকবে না। কাজেই তারা পথভ্রষ্ট হলে রসূলের করারও কিছু থাকবে না। কারণ তিনি নিজ দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করেছেন।

রসূল তাঁর ওপর অর্পিত নির্ধারিত দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। এখন তার দায় দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। তাই বলা হচ্ছে,

'অতপর আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো ....।' (আয়াত ৪১-৪২)

অর্থাৎ দুই অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে। হয় নবীর মৃত্যুর পর তাঁর অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে তিনি নিজেই প্রতিশোধ নেবেন, অথবা তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি তাদের জন্যে যে শাস্তির ফয়সালা করে রেখেছেন তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন। এই উভয়টিই তিনি করতে সক্ষম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। গোটা বিষয়টাই আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে। কারণ দাওয়াত ও তবলীগের নির্দেশদাতা স্বয়ং তিনি। আর রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে এই নির্দেশের বাস্তবায়ন। তাই রসূলকে উপদেশ দিয়ে বলা হচ্ছে,

'অতএব তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। নিসন্দেহে তুমি সরলপথে রয়েছো।' (আয়াত ৪৩)

অর্থাৎ তুমি যে পথে আছো, তার ওপর স্থির থাকো। সেই পথেই চলতে থাকো। তোমার সাথে কে চললো আর না চললো, সেদিকে খেয়াল করার দরকার নেই। শান্তচিত্তে তোমার পথে তুমি চলতে থাকো। কারণ তুমি সঠিক পথেই চলছো। এই পথ সোজা ও সরল। এই পথে চললে তুমি দিকহারা হবে না, লক্ষ্যবস্তু থেকে বিচ্যুত হবে না।

এই বিশ্বাস ও আদর্শের সম্পর্ক হচ্ছে মহাসত্যের সাথে এবং এই আকিদা বিশ্বাস সেই শাশ্বত নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যার ওপর ভিত্তি করে এই জগত টিকে আছে। সেই শাশ্বত নিয়ম যেমন সরল, তেমনি সরল এই আকিদা বিশ্বাসও, তাই উভয়ের মাঝে বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই। আর তাই এই আকিদা বিশ্বাসের ধারককে এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার পথে পরিচালিত করে। আর এই চলার পথে সে স্থিরতা ও অবিচলতা লাভ করে।

এই বাস্তব সত্যটি প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা একদিকে তাঁর রসূলের মনে সাহস জোগাচ্ছেন, অপরদিকে সেই সকল বান্দাদের মনেও সাহস জোগাচ্ছেন যারা রসূলের পরে দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। ফলে চলার পথে তারা বিপথগামীদের কোনো চক্রান্তেই বিভ্রান্ত হবে না।

এরপর বলা হচ্ছে, 'এটা তোমার ও তোমার জাতির জন্যে স্মরণিকা এবং শীঘ্রই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।' (আয়াত ৪৪)

এই আয়াতের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই কোরআন তোমার জন্যে ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশস্বরূপ। পরকালে তোমাদেরকে সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন কোনো ওযর আপত্তি চলবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই কোরআন তোমার ও তোমার জাতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। দেখা গেছে বাস্তবে তাই ঘটেছে।

আর সে কারণেই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দরূদ সালাম ধ্বনিত হয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের ও বেশী ধরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্তরা তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করে চলেছে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা তাদের প্রিয় নবীর নাম স্মরণ করতে থাকবে।

আর তাঁর জাতি ইসলামের পূর্বে একটা অজ্ঞাত ও অখ্যাত জাতি ছিলো। আর যখন থেকে তারা এই কোরআনকে আঁকড়ে ধরেছিলো তখন থেকে তারা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই কোরআনের বদৌলতে গোটা বিশ্বে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং যতোদিন তারা এই কোরআনকে নিজেদের চলার পথে দিকনির্দেশক হিসেবে দেখতে থাকে ততোদিন পর্যন্ত গোটা পৃথিবী তাদের বাধ্য ছিলো, তাদের করায়ত্ত ছিলো। আর যখন থেকে তারা এই কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকে পৃথিবীও তাদেরকে ভুলে গিয়েছে ও হীন মনে করছে। তাদেরকে নেতৃত্বের সারি থেকে টেনে এনে পেছনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পর্কে উম্মতকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ, এই দ্বীনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মনোনীত করেছিলেন, উদ্ভ্রান্ত ও দিশাহারা মানবতার কাফেলাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। অথচ তারা এই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। কাজেই তাদেরকে সেই ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ। তাই আমার আলোচনার প্রাধান্য এদিকে বেশী।

যুগ যুগান্তের সকল মোমেন একই কাফেলার সদস্য

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার পূর্বে আমি যে রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ....। (আয়াত ৪৫)

তাওহীদই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের একমাত্র ভিত্তি। যুগে যুগে আল্লাহর নবীরা এই তাওহীদের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাহলে যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যান্য মনগড়া উপাস্যদের পূজা অর্চনা করে, তারা কিসের ভিত্তিতে এটা করে? এই প্রশ্নটা উত্থাপন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন,

'তোমার পূর্বে যাদেরকে রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, দয়াময় ব্যতীত আমি অন্য কোনো উপাস্যকে উপাসনা করার জন্যে সৃষ্টি করেছি কিনা?'

এই প্রশ্নের যে অকাট্য উত্তর প্রত্যেক নবী ও রসূলের কাছ থেকে আসবে তা এখানে উহ্য রাখা হয়েছে। এটাও কোরআনের এক অভিনব বর্ণনা ভংগী। মনের মাঝে এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর হয়।

লক্ষণীয় যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর মাঝে এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী রসূলদের মাঝে স্থান ও কালের বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এর চেয়ে বড় ব্যবধান রয়েছে জীবন ও মৃত্যুর। কিন্তু এসব ব্যবধান এই শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যটির সামনে এসে ঘুচে যায়। সে সত্যটি হচ্ছে রেসালতের অভিন্নতা সম্পর্কিত সত্য, যার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। এই সত্যের যখন বহিপ্রকাশ ঘটে, এই সত্য যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন স্থান কাল ও জীবন মৃত্যুর ব্যবধানসহ সকল প্রাকৃতিক ব্যবধান এখানে দূর হয়ে যায়। এই সত্যের মাঝে এসেই মিশে যায় অতীতের সকল জীবিত ও মৃত মানব সন্তান, যেন তাদের মাঝে রয়েছে কতো দীর্ঘদিনের পরিচয় ও সহযোগিতা। এটাই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর বর্ণনা ভংগী।

তবে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর অন্যান্য নবী-রসূল ভাইদের মাঝে ও তাঁদের পালনকর্তার মাঝে যেন কোনো অন্তরায়ই থাকে না। কাছেও নয় এবং দূরেরও নয়। তাদের মাঝে সবসময়ই এমন অপার্থিব মুহূর্ত বিরাজ করে যখন সকল বাধা অপসারিত হয়ে যায়, সকল অন্তরায় দূরীভূত হয় এবং পর্দার আড়াল থেকে আদি ও শাশ্বত সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন জীবন, জগত ও সৃষ্টি একাকার হয়ে যায়, এক ও অভিন্ন সত্ত্বারূপে প্রকাশ পায়। সেখানে কালের কোনো ব্যবধান থাকে না, স্থানের ব্যবধান থাকে না এবং থাকে না আকৃতি ও অবয়বের ব্যবধান। এই অপার্থিব মুহূর্তেই রসূলুল্লাহ (স.) এ প্রশ্ন করেন এবং তাঁকে উত্তর দেয়া হয়। মেরাজের রাতে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মাঝে কোনো বাধা থাকে না, কোনো পর্দা থাকে না।

এসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা প্রত্যক্ষ করি, যা অনুভব করি, তার বাইরে আমাদের কিছু চিন্তা করা সম্ভব হয় না। সচরাচর যা ঘটছে বা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাই একমাত্র সত্য নয়। আসলে আমরা এই সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কেবল ততোটুকুই জানতে পারি ও অনুভব করতে পারি যতোটুকু দৃশ্যমান অথবা যতোটুকু প্রভাব আকারে বিরাজমান। আর এতোটুকুও কেবল তখন জানতে পারি যখন এই সৃষ্টিজগতের মাঝে ক্রিয়াশীল নিয়মের কোনো অংশের সাথে পরিচিত হতে পারি। এ ছাড়া স্বয়ং আমাদের অস্তিত্বের মাঝে, আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাঝে এবং এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা অনুভব করি তার মাঝেও আড়াল রয়েছে। যে মুহূর্তে আত্মা এ সকল বাধা ও অন্তরায় থেকে মুক্ত হতে পারে কেবল তখনই বিমূর্ত

মানব সত্ত্বার সাথে অন্য যে কোনো বিমূর্ত সত্ত্বার মিলন ঘটতে পারে এবং এটা মূর্ত সত্ত্বার সাথে কোনো মূর্ত সত্ত্বার মিলনের চেয়েও সহজ।

ফেরাউনের ঘটনা ও জনগণকে বোকা বানানোর কারসাজী

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করায় আপত্তি উত্থাপন করেছিলো এবং এই পার্থিব জীবনের নশ্বর ও ভ্রান্ত মূল্যবোধগুলো নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। তাই ওপরের আয়াতগুলোতে রসূলকে সান্ত্বনা বাণী শুনানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখন মূসা (আ.)-এর সাথে এবং ফেরাউন ও তার পারিষদের কি ঘটনা ঘটেছিলো, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা যেমন অহংকারে বশবর্তী হয়ে বলেছিলো, কোরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?' অনুরূপভাবে ফেরাউনও তার ধন-শক্তি, জনশক্তি ও রাজ্যশক্তির অহংকারে বশবর্তী হয়ে বলেছিলো, 'আমি কি মিসরের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নই? এই নদীগুলো কি আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় না?

প্রতিপত্তি এবং পার্থিব ধন সম্পদের জোরে আল্লাহর বান্দা ও রসূল মূসা (আ.)-এর সামনে আত্মগরিমায় ফুলে যেতো। সে বলতো,

'আমি যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়'

মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা যেমনটি বলে ছিলো, তেমনটি ফেরাউনও বলেছিলো। সে বলেছিলো, 'তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হলো না? অথবা কেন ফেরেশতারা দল বেঁধে তার সংগে আসলো না?'

মনে হয় যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে অথবা একই রেকর্ড পুনরায় বাজানো হচ্ছে।

এরপর বলা হয়েছে, প্রতারিত ও বোকা জনগণ ফেরাউনের ডাকে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলো এবং বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে মূসা (আ.)-কে তার পালনকর্তার কাছে বিপদ দূর করার জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ জানিয়েছিলো। অথচ মূসা (আ.) তাদের সামনে মোজেযাও প্রদর্শন করেছিলেন।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে, দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বশেষ সুযোগটিও যখন তারা গ্রহণ করেনি তখন তাদেরকে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যেমন 'অতপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।'

কিন্তু পরবর্তী লোকেরা এসব ঘটনা থেকে কোনোই উপদেশ গ্রহণ করেনি।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একদিকে রেসালাত আদর্শ ও পন্থার অভিন্নতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে, অপরদিকে সত্যের ডাকের উত্তরে অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের চরিত্র, পর্থিব জীবনের তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বিলাস সামগ্রীর প্রতি তাদের গর্ববোধ এবং তাদের স্বভাবচরিত্র ফুটে উঠেছে, যাদেরকে শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীনরা যুগে যুগে বোকা বানিয়ে এসেছে।

আয়াতে বলা হয়েছে, ' আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর সে বলেছিলো, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল ....।' (আয়াত ৪৬-৪৭)

এখানে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মাঝে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হচ্ছে। কেবল মূল অংশগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব অংশের সাথে মক্কার মোশরেকদের ঘটনার সাথে মিল রয়েছে। এখানে মূসা (স.)-এর রেসালতের স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল' এটাই হচ্ছে রেসালতের স্বরূপ যার বাহক ছিলেন প্রত্যেক নবী ও রসূল। তাঁদেরও সেই একই বক্তব্য ছিলো। অর্থাৎ তারা রসূল এবং যিনি তাদেরকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন, 'রব্বুল আলামীন' বা বিশ্ব প্রতিপালক।

এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সেই সব অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে যা মূসা (আ.) তার জাতির সামনে পেশ করেছিলেন। এসকল ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে তারা হেসে ওঠে। বোকা এবং অহংকারী লোকেরা এমনটাই করে থাকে।

এরপর ফেরাউন ও তার লোকজনদেরকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা কি কি ভাবে পাকড়াও করলেন যার বিস্তারিত বর্ণনা অন্যান্য সূরায় এসেছে যেদিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হতো পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বড়। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম ....।' (আয়াত ৪৮-৪৯)

মূসা (আ.)-এর হাতে যে সকল অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিলো, তা তার সম্প্রদায়ের লোকদের ঈমান গ্রহণে সহায়ক হয়নি। একের পর এক অলৌকিক ঘটনা তাদের সামনে আসতে থাকে, আর তাদের অবাধ্যতাও ততোই প্রকাশ পেতে থাকে। এর দ্বারা আল্লাহর এই বক্তব্যের সত্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যারা হেদায়াতের যোগ্য নয়, তারা কখনও অলৌকিক ঘটনা দেখে হেদায়াত লাভ করতে পারে না। তাই রসূলকে বলা হয়েছে, বধিরকে শুনানো সম্ভব নয় এবং অন্ধকে রাস্তা দেখানোও সম্ভব নয়।

এখানে ফেরাউন ও তার লোকজনদের এক অদ্ভূত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, 'হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনর্কতার কাছে সে বিষয়ে প্রার্থনা করো, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন...............।' (আয়াত ৪৯)

তারা বিপদের সম্মুখীন এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে তারা মূসা (আ.)-এর কাছে সাহায্য কামনা করছে। তারপরও তারা তাঁকে 'যাদুকর' বলে সম্বোধন করছে এবং বলছে, 'তোমার প্রভু তোমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন সে বিষয়ে আমাদের জন্যে দোয়া করো।' অথচ তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্ব প্রতিপালকের রসূল। অর্থাৎ শুধু তাঁর নিজ প্রতিপালকের রসূলই নন। কিন্তু ওদের মনে অলৌলিক ঘটনাবলীরও কোনো রেখাপাত করেনি এবং রসূলের কথাও কোনো রেখাপাত করেনি। এমনকি ঈমানের কোনো স্পর্শও ওদের মনে লাগেনি। অথচ ওরা দাবী করছে, 'আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতপর যখন আমি তাদের থেকে আমার আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অংগীকার ভংগ করতে লাগলো।' (আয়াত ৫০)

জনসাধারণের মনে অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা রেখাপাত করতে পারে এবং তাদের প্রতারিত মনে অনেক সময় সত্যের আলো ঝিলিক দিয়েও উঠতে পারে। তাই ফেরাউন তার পূর্ণ শান শওকত ও চাকচিক্যময় পোশাক পরিচ্ছদসহ জনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছে এবং সহজ সরল গণমানুষের মনকে আকৃষ্ট করার জন্যে সেই পন্থায়ই অবলম্বন করছে, যা যুগে যুগে অহংকারী ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী তাদের দাসসম প্রজাদের বেলায় করে আসছে। তারা শস্তা জৌলুসপূর্ণ ও চাকচিক্যময় জীবন ধারার মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে ডেকে বললো......।' (আয়াত ৫১-৫৩)

বলাবাহুল্য, মিসরের সাম্রাজ্য এবং ফেরাউনের প্রাসাদের নিচে প্রবাহিত নদীগুলো জনগণের চোখের সামনেই ছিলো। তা দেখে তারা বিমোহিত হতো। এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে বোকা বানানো খুব সহজ ছিলো। কিন্তু আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তার মালিকানা ছিলো ভিন্ন জিনিস। এর সাথে মিসর সাম্রাজ্যের মালিকানার কোনো তুলনাই হতে পারে না। অবশ্য এই সত্যটুকু উপলব্ধি করার জন্যে ঈমানের আলোকে আলোকিত একটি হৃদয়ের প্রয়োজন। কেবল এমন হৃদয়ই আসমান ও যমীনের মালিকানা আর মিসরের মতো তুচ্ছ সাম্রাজ্যের মালিকানার পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম।

গণমানুষের পক্ষে এই বিশাল জগতের মালিকানার বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাদের বুদ্ধি এত ঊর্ধের নয়। তারা তো বাহ্যিক চাকচিক্যেই মত্ত থাকে। চোখের সামনে যা পায় তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সে কারণেই ফেরাউন বুঝতে পারে, এদের মন নিয়ে কিভাবে খেলা যায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে এদেরকে কিভাবে ভুলানো যায়। সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'আমি কি তারচেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, যে নীচ এবং কথাও বলতে পারে না....।' (আয়াত ৫২)

সে মূসা (আ.)-কে নীচ বলছে এই কারণে যে, তিনি কোনো রাজা বাদশা নন, কোনো রাজকুমার নন, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ধন-দৌলতের মালিক নন। অথবা এই কারণে বলেছে যে, তিনি পরাধীন জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাইলের লোক ছিলেন। অপরদিকে 'সে কথাও বলতে পারে না.........' এর দ্বারা সে মূসা (আ.)-এর তোতলামীর দোষটি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। এটা ছিলো মিসর ত্যাগ করার আগে। পরবর্তীকালে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, 'হে আমার পারণকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তার মুখের জড়তা বা তোতলামী দূর হয়ে যায়। ফলে তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন।

সরল-সোজা গণমানুষের কাছে মূসা (আ.)-এর তুলনায় ফেরাউনই ছিলো শ্রেষ্ঠ। কারণ সে মিসরের অধিপতি, প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক এবং তার প্রাসাদের নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। অপরদিকে মূসা (আ.) সত্যের বাহক, নবুওতের মর্যাদার অধিকারী এবং কঠিন আযাব থেকে মুক্তির জন্যে প্রার্থনাকারী হওয়া সত্তেও গণমানুষের সামনে তার কোনো আবেদন নেই।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হলো না?'

কি তুচ্ছ ও বাজে জিনিসের আব্দার! স্বর্ণের মাধ্যমে ওরা একজন নবীর নবুওতকে প্রমাণ করতে চায়! ওরা স্বর্ণের কয়টি বালাকে সেসব অলৌকিক ঘটনার চেয়েও বড় বলে মনে করে যা আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অথবা তারা কি স্বর্ণবলয় পরিধান করানোর দ্বারা সিংহাসনে আরোহন বুঝাতে চায়? অর্থাৎ মূসা (আ.) একজন রাজা বাদশা কেন হলেন না। হয়তো সেই যুগে এই প্রথার মাধ্যমেই রাজা বাদশাদের অভিষেক হতো।

এরপর বলা হয়েছে, 'অথবা তার সাথে ফেরেশতারা কেন দল বেঁধে নিচে এলো না?'

এটা আর এক ধরনের অভিযোগ। এর দ্বারা গণমানুষকে আর বেশী বোকা বানানো যায়। তাই একই অভিযোগ একাধিক রসূলের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, 'অতপর সে তার জাতিকে বোকা বানিয়ে দিলো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো............।' (আয়াত ৫৪)

স্বৈরাচারী শাসকরা জনসাধারণকে সব সময়ই বোকা বানায়। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এরা প্রথমে জনগণকে জ্ঞানের সকল পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এরপর সত্য ঘটনা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, যেন সেগুলো তারা ভুলে যায় এবং সেগুলো নিয়ে আর কখনও ঘাটাঘাটি না করতে পারে। এরপর ইচ্ছামতো তাদের মন মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মন মানসিকতা সেই কৃত্রিম ছাঁচেই গড়ে ওঠে। ফলে বোকা বানানো সহজ হয়, তাদেরকে ইচ্ছামত চালানো যায় এবং যেদিক ইচ্ছা সেদিকে হাঁকিয়ে নেয়া যায়। এতে তারা কোনো আপত্তি করে না।

স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের সাথে এই আচরণ কেবল তখনই করতে পারে যখন তাদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে, যখন তারা সৎপথ থেকে ছিটকে পড়ে, আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে পড়ে এবং ঈমানের মানদন্ড তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অপরদিকে যারা বিশ্বাসী, যারা ঈমানদার, তাদেরকে ধোঁকা দেয়া, তাদেরকে বোকা বানানো বা তাদেরকে নিয়ে তামাশা করা এতো সহজ নয়। সেই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের সম্প্রদায়কে বোকা ও অসৎ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এখন পরীক্ষার পর্ব শেষ, উপদেশের পর্ব শেষ এবং সতর্কীকরণের পর্বও শেষ। এখন আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন যে, এই অসৎ জাতি আর ঈমান গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ক্ষমতার দম্ভে আত্মহারা ফেরাউনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সতর্কবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'অতপর ওরা যখন আমাকে রাগান্বিত করলো, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম' (আয়াত ৫৫)

আল্লাহকে তারা রাগান্বিত করেছিলো বলেই তিনি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার লোক-লস্কর সহ সকলকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন। ওরা মূসা (আ.)-কে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু মাঝ দরিয়ায়ই আল্লাহ তায়ালার ওদের ডুবিয়ে দেন। আর এভাবেই ওরা পরবর্তী যুগের প্রত্যেক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ ওদের নির্মম ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

মূসা (আ.)-এর ঘটনা আর মক্কার আরবদের ঘটনার মাঝে এভাবেই একটা মিল খুঁজে পাই, অর্থাৎ ওরাও তাদের নবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো, তাঁকে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু রসূল এবং তাঁর অনুসারী মোমেনরাই জয়ী হয়েছিলো, তারাই ময়দানে টিকে ছিলো। তাই মূসা (আ.)-এর ঘটনার মাধ্যমে অভিযোগকারী মোশরেকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অনুরূপ পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হচ্ছে।

আলোচ্য পর্বের অবস্থা এবং এর উপস্থাপনের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে উল্লেখিত ঘটনার তাৎপর্য সুসামঞ্জস্যরূপে মিলে যাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে উল্লেখিত ঘটনাটি ঐশী আদর্শের জন্যে শিক্ষার একটা উপকরণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এবার হযরত মূসার কাহিনীর এই অংশ শেষ করে হযরত ঈসার কাহিনীর একটা অংশ বর্ণনা করা হচ্ছে। একশ্রেণীর খৃষ্টান হযরত ঈসার পূজা করে, এই ওজুহাত দেখিয়ে আরবরা তাদের ফেরেশতা পূজার সাফাই দিতো। এই খোঁড়া ওজুহাত খন্ডন করার জন্যে এ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এটাই এ সূরার শেষ অধ্যায়।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا

خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ

إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا

مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا

وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ

৫৭. (হে নবী, তাদের কাছে) যখনই মারইয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন সাথে সাথে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা সে কারণে (খুশীতে) চীৎকার জুড়ে দেয়। ৫৮. তারা বলতে থাকে, আমাদের মাবুদরা ভালো না সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা ভালো, আসলে); এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশেই এসব কথা উপস্থাপন করে; বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতিই বটে। ৫৯. (মূলত) সে ছিলো আমারই একজন বান্দা, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্যে আমি (আমার কুদরতের) একটা অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়েছিলাম; ৬০. আমি চাইলে তোমাদের বদলে আমি ফেরেশতাদের পাঠাতাম, (সে অবস্থায়) তারাই (দুনিয়ায় আমার) প্রতিনিধিত্ব করতো! ৬১. সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা) হবে (মূলত) কেয়ামতের একটি নিদর্শন (হে নবী, তুমি বলো), তোমরা সে (কেয়ামতের) ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না, তোমরা আমার আনুগত্য করো; (কেননা) এটাই (তোমাদের জন্যে) সহজ সরল পথ। ৬২. শয়তান যেন কোনো অবস্থায়ই (এ পথ থেকে) তোমাদের বিচ্যুত করতে না পারে (সেদিকে খেয়াল রেখো), নিসন্দেহে সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন! ৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে (তার লোকদের) বললো, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা (যে আমার অবস্থান সম্পর্কে) নানা মতবিরোধ করছো তা আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেবো, অতএব তোমরা (আল্লাহ তায়ালার আযাবকে) ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ৬৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; এটাই হচ্ছে সরল পথ। ৬৫. (এ সত্ত্বেও)

الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ

الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا

مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم

بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ

الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ

তাদের বিভিন্ন দল (তাকে নিয়ে) নিজেদের মধ্যে (নানা) মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর দুর্ভোগ ও কঠিন দিনের আযাব তাদের জন্যেই যারা (অযথা) বাড়াবাড়ি করলো। ৬৬. তারা কি (এ ফয়সালার জন্যে) কেয়ামত (-এর ক্ষণটি) আসার অপেক্ষা করছে, তা (কিন্তু একদিন) আকস্মিকভাবেই তাদের ওপর এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে না। ৬৭. সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

রুকু ৭

৬৮. (সেদিন আমি পরহেযগার বান্দাদের বলবো,) হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ডর-ভয় নেই, না তোমরা আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, ৬৯. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে, (মূলত) তারা ছিলো (আমার) অনুগত বান্দা। ৭০. (আমি আরো বলবো,) তোমরা এবং তোমাদের সংগী সংগিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারী করা হবে! ৭১. সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছুই (তাদের) মন চাইবে এবং যা কিছুই তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে (উপরন্তু তাদের বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে, ৭২. আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিময় যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো। ৭৩. (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-পাকড়া (মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে পারবে, ৭৪. (অপর দিকে) অপরাধীরা থাকবে নিশ্চিত

فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط
قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ
كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوْا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ
سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ط بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ
وَلَدٌ ق فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ
الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاۤءِ إِلٰهٌ وَّفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ط
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

জাহান্নামে, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন, ৭৫. (মুহূর্তের জন্যেও শাস্তি) তাদের থেকে লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে, ৭৬. (এ আযাব দিয়ে কিন্তু) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম করিনি, বরং তারা (বিদ্রোহ করে) নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ৭৭. ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে প্রহরী, (আজ) তোমার প্রতিপালক (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদের ব্যাপারটা শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো); সে (প্রহরী) বলবে, (না, তা কিছুতেই হবার নয়, এভাবেই) তোমাদের (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। ৭৮. (নবী বলবে,) আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই (এ থেকে) অনীহা প্রকাশ করেছিলো। ৭৯. তারা কি (নবীকে কষ্ট দেয়ার) পরিকল্পনা গ্রহণ করেই ফেলেছে (তাহলে তারা শুনুক), আমিও (তাকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর) আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি, ৮০. তারা কি ধরে নিয়েছে, আমি তাদের গোপন কথা ও সলাপরামর্শসমূহ শুনতে পাই না; অবশ্যই (আমি তা শুনতে পাই), তাছাড়া আমার পাঠানো (ফেরেশতা)– যারা তাদের (ঘাড়ের) পাশে (বসে) আছে, তারাও (তো) সব লিখে রাখছে। ৮১. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমিই তার প্রথম এবাদাতগোযারদের মধ্যে অগ্রণী হতাম! ৮২. আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, মহান আরশের তিনি অধিপতি, এরা যা কিছু তাঁর সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র। ৮৩. অতএব (হে নবী), তুমি এদের (সেদিন পর্যন্ত) অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় (মত্ত) থাকতে দাও, যখন তারা সে (কঠিন) দিনটির সম্মুখীন হবে, যার ওয়াদা (বার বার) তাদের কাছে করা হয়েছে। ৮৪. তিনি হচ্ছেন আসমানে মাবুদ, যমীনেও মাবুদ; তিনি বিজ্ঞ, কুশলী, সর্বজ্ঞ।

وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ
السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ
الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ
خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৫. (প্রভূত) বরকতময় তিনি, আসমানসমূহ, যমীন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে (যেখানে) যা কিছু আছে, (এ সব কিছুর একক) সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, কেয়ামতের সঠিক খবর তাঁর কাছেই রয়েছে, পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকে, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) সুপারিশের (কোনো) ক্ষমতাই রাখে না, তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং (সত্যকে) জানবে (তাদের কথা আলাদা)। ৮৭. (হে নবী, তুমি) যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে তাদের পয়দা করেছেন, তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, (তাহলে বলো) তোমরা (তাঁকে বাদ দিয়ে) কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো? ৮৮. (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর (রসূলের) এ বক্তব্য (সম্পর্কেও জানেন), হে আমার মালিক, এরা হচ্ছে এমন লোক যারা কখনোই ঈমান আনবে না। ৮৯. (হে রসূল,) অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো, (এদের ব্যাপার) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং (তাদের উদ্দেশে) বলো সালাম; (কেননা) অচিরেই ওরা সত্য মিথ্যা জানতে পারবে।

তাফসীর

আয়াত ৫৭-৮৯

সূরার এ শেষ অধ্যায়ে ফেরেশতা পূজা সংক্রান্ত আরবদের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে তারা শেরেকের পক্ষে যেসব ওজুহাত খাড়া করতো, তাও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই ধরনের ওজুহাত ও কুযুক্তি দাঁড় করিয়ে তারা তাদের ভিত্তিহীন আকীদা বিশ্বাসের সাফাই দিতে চেষ্টা করতো। এ দ্বারা প্রকৃত সত্য উদঘাটন তাদের লক্ষ্য ছিলো না। লক্ষ্য ছিলো শুধু তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া ফ্যাসাদ করে পানি ঘোলা করা।

তাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'তোমরা ও আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা পূজো করে থাকো, সবাই জাহান্নামের কাঠ হবে।' (সূরা আল আম্বিয়া ৯৮) এ দ্বারা ফেরেশতাদের সেই সব প্রতিমূর্তিকে বুঝানো হয়েছিলো। যা তারা নিজ হাতে বানাতো এবং পূজা করতো। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব কিছুর উপাসকও দোযখে যাবে। এই কথাটা বলার পর মোশরেকদের কেউ কেউ হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ামের উদাহরণ দিলো। একদল বিপথগামী খৃষ্টান হযরত ঈসার উপাসনা করতো, মোশরেকরা এই উদাহরণ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হযরত ঈসাও কি তাহলে দোযখে যাবেন? এটা ছিলো আসলে নিছক তর্কের খাতিরেই তর্ক। তারপর তারা এ কথাও বললো যে, আহলে

কেতাবরা যখন হযরত ঈসার উপাসনা করে, যিনি একজন মানুষ মাত্র, তখন আমরা যেহেতু আল্লাহর মেয়ে ফেরেশতার উপাসনা করি, তাই আমরাই অধিকতর সঠিক পথপ্রাপ্ত। আসলে বাতিল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের এই দাবীও ছিলো বাতিল।

এই প্রসংগেই কোরআন হযরত ঈসার কাহিনীর একটা অংশ তুলে ধরছে। এতে হযরত ঈসার প্রকৃত পরিচয় এবং তার দাওয়াতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে, আর তাঁর জাতি এই দাওয়াতের কেমন বিরোধিতা করেছিলো তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর যারা সঠিক আকীদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সহসাই কেয়ামত এসে যেতে পারে। এই পর্যায়ে কেয়ামতের এক দীর্ঘ দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যেখানে একদিকে সৎলোকদের পুরস্কার এবং অপরদিকে অসৎ লোকদের শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এখানে ফেরেশতা সম্পর্কে আরবদের যাবতীয় ভিত্তিহীন ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। মহান আল্লাহর নামে তারা যে সব অপবাদ রটনা করতো, তা থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কিছু প্রকৃত গুণের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তিনিই যে আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে, সে কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরার শেষে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন মোশরেকদের ক্ষমা করে দেন, তাদের নিয়ে আর মাথা না ঘামান এবং তাদের পরিণতি ভোগ করার জন্যে তাদেরকে ছেড়ে দেন। এত অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সহকারে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়ার পরও যারা বৃথা তর্ক-বিতর্ক করে, তাদের জন্যে এতে রয়েছে সমুচিত প্রচ্ছন্ন হুমকি।

মৃত মানুষদের ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্য

'যখন মরিয়মের ছেলের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো ....।' (আয়াত ৫৭-৬৫)

ইবনে ইসহাক স্বীয় সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন রসূল (স.) মাসজিদুল হারামে (পবিত্র কাবা সংলগ্ন মসজিদে) ওলীদ ইবনে মুগীরার সাথে বসেছিলেন। সহসা নযর ইবনুল হারেস এসে তাদের সাথে বসলো। সেই মজলিসে কোরায়শ নেতাদের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলো। রসূল (স.) তাদের সাথে কথা বললেন। নযর ইবনুল হারেসকে দেখতে পেয়ে তার সাথেও কথা বললেন এবং তাকে লা জবাব করে দিলেন। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতটা (৯৮ নং) পড়লেন, 'তোমরা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা করো তারা জাহান্নামের কাঠ। তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।' এরপর রসূল (স.) চলে গেলেন। এই সময় আব্দুল্লাহ ইবনুয যাবয়ারী আত-তামীমী এসে মজলিসে বসলো। ওলীদ ইবনে মুগীরা তাকে বললো, আজ নযর ইবনুল হারেস আব্দুল মোত্তালেবের পৌত্রের সামনে টিকতেই পারেনি। মোহাম্মদ (স.) দাবী করেছে যে, আমরা ও আমরা যে সব দেবতার উপাসনা করি, তারা জাহান্নামের কাঠ। আব্দুল্লাহ ইবনুয যাবয়ারী বললো, আল্লাহর শপথ, আমি যদি মোহাম্মদকে পেতাম, তবে তার সাথে তর্ক করতাম। তোমরা মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যার যার পূজো করা হয়, তারা সবাই কি তাদের পূজারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে? আমরা তো ফেরেশতাদের পূজা করি। ইহুদীরা ওযায়েরের পূজা করে এবং খৃষ্টানরা মারইয়ামের ছেলে ঈসার পূজা করে।' আব্দুল্লাহ ইবনুয যাবয়ারীর কথায় ওলীদ ও তার সাথীরা চমৎকৃত হলো। তারা দেখলো যে, সে জোরদার যুক্তি উত্থাপন করেছে এবং তর্কে জয় লাভ করার যোগ্যতা লাভ

করেছে। অবিলম্বে প্রশ্নটা রসূল (স.)-এর কাছে করা হলো। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিকল্প উপাস্য সেজে উপাসনা পাওয়ার প্রত্যাশা করবে, সেই তার উপাসকদের সাথে থাকবে। কেননা তারা একমাত্র শয়তানের ও শয়তান যাকে পূজা করার আদেশ দেয় তারই পূজা করে থাকে। এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা আম্বিয়ার ১০১ নং আয়াত নাযিল করলেন, 'যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।' অর্থাৎ হযরত ওযায়ের, হযরত ঈসা এবং অন্যান্য বিদ্বান ও পুন্যবান ব্যক্তিরা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়া সত্তেও লোকেরা তাদের উপাসনা করেছে। তাঁদের তিরোধানের পর পরবর্তী কালের পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদেরকে উপাস্য ও মনিবরূপে গ্রহণ করেছে। তারা জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবেন। এ আয়াতটা নাযিল হয় হযরত ঈসা সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তার উপাসনাও করা হয় বলে যে ওজুহাত খাড়া করা হয়, সেই বিষয়ে। ওলীদ ও তার উপস্থিত সাথীরা রসূল (স.)-এর উপস্থাপিত এই যুক্তিতে লা-জবাব হয়ে গেলো ও থতমত খেয়ে গেলো।

'আর যখনই মারইয়ামের ছেলের উদাহরণ দেয়া হলো, অমনি তোমার জাতি হৈ চৈ শুরু করে দিলো।'

অর্থাৎ তোমার আদেশ ও আহ্বান থেকে মানুষকে দূরে সরানোর জন্যে হৈ চৈ শুরু করে দিলো।

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, রসূল (স.) যখন কোরায়শের সামনে এই আয়াত পড়লেন, 'তোমরা নিজেরা ও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের তোমরা উপাসনা করো তারা জাহান্নামের কাঠ' তখন তারা তার প্রতি ভীষণ ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হলো। আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যারয়ারী বললো, 'হে মোহাম্মদ, এ ব্যাপারটা কি শুধু আমাদের ও আমাদের দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না সকল জাতির জন্যে? রসূল (স.) বললেন, তোমাদের জন্যে, তোমাদের দেবতাদের জন্যে এবং সকল জাতির জন্যে।' সে বললো, তাহলে কাবার অধিপতির শপথ, আমি তোমার সাথে তর্ক না করে ছাড়ছিনে।' তুমি কি দাবী করো না যে, মারইয়ামের ছেলে ঈসা একজন নবী? তুমি তো তার ও তার মায়ের প্রচুর প্রশংসা করে থাকো। তুমি এও জানো যে, খৃষ্টানরা ওদের উভয়কে (ঈসা ও মারইয়ামকে) উপাসনা করে থাকে। ওযায়েরেরও উপাসনা করা হয়। ফেরেশতাদেরও উপাসনা করা হয়। এরা সবাই যদি দোযখে যায়, তাহলে আমরা ও আমাদের দেবতারাও তাদের সাথে দোযখে যেতে রাযী আছি।' এরপর তারা খুব উল্লাস প্রকাশ করে ও অট্টহাসি করে। রসূল (স.) নীরব হয়ে যান। এই সময় আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'নিশ্চয় যাদের সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে' (আম্বিয়া ১০১) আর এই আয়াতটা (যোখরুফ ৫৭) নাযিল হলো। ৫৭ নং আয়াতটার মর্ম হলো, আব্দুল্লাহ ইবনুয যারয়ারী যখন মারইয়ামের ছেলে হযরত ঈসার উদাহরণ দিলো এবং খৃষ্টানরা তার উপাসনা করে থাকে এই বলে রসূল (স.)-এর সাথে তর্ক শুরু করে দিলো, তখনি তোমার গোত্রের লোকেরা-অর্থাৎ কোরায়শ এই উদাহরণ শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লো ও হৈ চৈ শুরু করে দিলো। কারণ তারা শুনেছিলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যারয়ারীর যুক্তিতে তিনি থতমত খেয়ে গেছেন ও লা জবাব হয়ে গেছেন-যেমনটি কোনো জনগোষ্ঠী একটা বিষয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ জয় লাভ করলে হৈ চৈ ও শোরগোল করে থাকে। অবশ্য এই শব্দটা 'ইয়াসুদ্দুনা' উচ্চারণ করলে তার অর্থ হচ্ছে, তারা এই উদাহরণের ফলে আসকারা পেয়ে সত্য থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং নিজেরাও সত্যকে এড়িয়ে যায় ও উপেক্ষা করে।

শব্দটা 'ইয়াসেদ্দু' ও 'ইয়াসুদ্দু' দুই ভাবেই উচ্চারিত হয়ে থাকে, যেমন ইয়াকুফু ও ইয়াকেফু ইত্যাদি। আর তারা বলে, আমাদের উপাস্য ভালো, না উনি? অর্থাৎ আমাদের উপাস্যরা তো তোমার মতে ঈসার চেয়ে ভালো নয়। আর ঈসাই যখন দোযখের কাঠ হবে, তখন আমাদের উপাস্যদের ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য।

কাশশাফ প্রণেতা এই তাফসীর কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। অবশ্য মোটামুটিভাবে ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে এর মিল রয়েছে।

উভয় ব্যাখ্যা থেকেই মোশরেকদের বক্রতা ও তর্কপ্রিয়তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোরআন তাদের স্বভাব প্রকৃতির যে চিত্র এঁকেছে, এখানে অবিকল সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে। কোরআন বলেছে,

'তারা হলো একটা ঝগড়াটে গোষ্ঠী।'

অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদে তারা যেমন জেদী ও হঠকারী, তেমনি চতুর ও ধড়িবাজ। তারা প্রথম থেকেই জানে রসূল (স.) তাদেরকে কী বলতে চান এবং কোরআন তাদেরকে কিসের দাওয়াত দেয়। সবকিছু জেনে বুঝেও তারা সহজ সরল কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জটিল ও বক্র বানানোর চেষ্টা করে। তারা সাধারণ ও সহজবোধ্য শব্দের ভেতরে কৃত্রিম বিতর্কের মাধ্যমে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। এ ধরনের তর্কে কোনোই লাভ হয় না। কেবল ক্ষতিই হয়ে থাকে। কৃত্রিমতা, নিষ্ঠাহীনতা, অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা, সত্যের ব্যাপারে হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শব্দে, বাক্যে বা পটভূমিতে সংশয় সৃষ্টি, এই সব খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্টই এ জাতীয় তর্ক থেকে অর্জিত হয়ে থাকে। এ জন্যেই রসূল (স.) এমন বিতর্কে অংশগ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যার উদ্দেশ্য সত্যকে পাওয়া নয়, বরং যেন তেন প্রকারে বিজয়ী হওয়া।

ইবনে জরীর বলেন, হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত যে, একবার রসূল (স.) মুসলিম জনতার সামনে এসে দেখলেন, তারা কোরআন নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছে। তিনি এতে এতো রেগে গেলেন যে, মনে হচ্ছিলো, যেন তাঁর মুখে সের্কা ঢেলে দেয়া হয়েছে। তারপর বললেন, আল্লাহর কেতাবের একাংশ দিয়ে অপর অংশকে আঘাত করো না। মনে রেখো, কোনো জাতি তখনই পথভ্রষ্ট হয়, যখন কলহ কোন্দল ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। তারপর পড়লেন, 'তোমার সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যেই তারা এই উদাহরণ দিয়েছে। আসলে তারা হচ্ছে একটা ঝগড়াটে মানবগোষ্ঠী।'

'তারা বললো, আমাদের উপাস্যরা ভালো, না তিনি?'

মহান আল্লাহর এ উক্তিটার আরো একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। তাদের ফেরেশতা সংক্রান্ত ভিত্তিহীন ধারণার বিবরণ সম্বলিত আয়াতগুলো থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেই সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটা হলো, তারা এ দ্বারা বুঝিয়েছে যে, খৃষ্টানদের একাংশ কর্তৃক হযরত ঈসার উপাসনার চেয়ে তাদের ফেরেশতার উপাসনা অনেক ভালো। কেননা তাদের ধারণা অনুসারে ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে বিধায় তারা হযরত ঈসার চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা বংশগত এবং চরিত্রগত উভয় দিক দিয়ে। আর তারা নিছক তর্কের খাতিরে ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে এই উদাহরণ দেয়নি, 'আসলে তারা তর্কপ্রিয় গোষ্ঠী' এই উক্তি দ্বারা যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা দ্বারা ইবনুয় যারয়ারীর কথাও বুঝানো হয়েছে যে, খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসার উপাসনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা অর্থহীন। কেননা খৃষ্টানদের তাওহীদ বিচ্যুতি কোনো যুক্তি নয় বরং তাদের নিজেদের মূর্তিপূজা ও ফেরেশতা পূজার মতোই ওটাও একটা বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা। এক বিকৃতি আর এক বিকৃতির পক্ষে যুক্তি হতে পারে না। আর এক বিকৃতিকে অন্য বিকৃতির চেয়ে

শ্রেষ্ঠ বলাও যায় না। কারণ দুটোই ভ্রষ্টতা। কোনো কোনো তফসীরকার এই ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাখ্যা মানানসইও বটে। এ জন্যেই এর পরে মন্তব্য করা হয়েছে!

'সে তো একজন বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়, যার ওপর আমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছি..........।'

অর্থাৎ সে কোনো মাবুদ নয় যে, তার উপাসনা করতে হবে। যেমন খৃষ্টানদের একটা গোষ্ঠী তার উপাসনা করে থাকে। সে আল্লাহর একজন অনুগৃহীত বান্দা মাত্র। তারা তার উপাসনা করায় ঈসা (আ.)-এর কোনো দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন শুধু এ জন্যেই যেন সে বনী ইসরাঈলের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়। তারা তার দিকে তাকাবে এবং তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা তার দৃষ্টান্ত ভুলে গিয়েছিলো এবং বিপথগামী হয়েছিলো।

পুনরায় ফেরেশতা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রসংগ তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদের মতোই আল্লাহর একশ্রেণীর সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদেরকে তাদের উত্তরাধিকারী বানাতে পারতেন, অথবা কতক মানুষকে ফেরেশতায় রূপান্তরিত করে পৃথিবীতে তাদের উত্তরাধিকারী বানাতে পারতেন। (আয়াত ৬০)

মোদ্দাকথা, সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাই শেষ কথা। তিনি যা সৃষ্টি করতে চান, তা-ই হয়। আল্লাহর কোনো সৃষ্টিরই তাঁর সাথে বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নিছক স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, বান্দা ও মাবুদের সম্পর্ক, উপাসক ও উপাস্যের সম্পর্ক। এর বেশী কিছু নয় এবং এ থেকে পৃথক কিছুও নয়।

ঈসা (আ.)-এর সঠিক ইতিহাস ও কেয়ামতের পূর্বে তার অবতরণ

এরপর হযরত ঈসা কিভাবে তাদেরকে কেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'আর সে তো (ঈসা) কেয়ামতের প্রতীক ....।' (আয়াত ৬১)

বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে কেয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে হযরত ঈসার পৃথিবীতে নেমে আসার সংবাদ দেয়া হয়েছে। সে তো কেয়ামতের প্রতীক, এই কথাটা দ্বারা সেই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কেয়ামতের আগমন বার্তা বয়ে আনবেন। অন্য এক কেরাতে 'আলামুন' পড়া হয়েছে, যার অর্থ আলামত বা নিদর্শন। ইলমুন ও আলামুন। উভয়টা প্রায় একই অর্থ বহন করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল (স.) বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অচিরেই তোমাদের মধ্যে মারইয়ামের ছেলে ঈসা ন্যায়বিচারক শাসক হয়ে আসবেন, তিনি ক্রুশ ভাংবেন, শূয়োর হত্যা করবেন, জিযিয়া আরোপ করবেন এবং এতো সম্পদ বিতরণ করবেন যে, নেয়ার মতো লোক পাওয়া যাবে না। তখন একটা সেজদা দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে মূল্যবান হবে। (মালেক, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত জাবের থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন, আমার উম্মাতের একটা দল সত্যের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে এবং বিজয়ী হবে। তখন মারইয়ামের ছেলে ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। তখন তাদের নেতা বলবে, 'আসুন, আমাদেরকে নামায পড়ান। তিনি বলবেন, না। তোমরাই একে অপরের নেতা। আল্লাহ তায়ালা এভাবে এই উম্মাতকে সম্মানিত করেছেন।' (সহীহ মুসলিম)

এটা সেই সব অজানা ও অদৃশ্য সত্যের অন্যতম, যার পূর্বাভাস দিয়েছেন রসূল (স.) এবং যার উল্লেখ এই কোরআনেও করা হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত অটুট এই দুই উৎস কোরআন ও

হাদীসে এ সম্পর্কে যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তা ছাড়া কোনো মানুষের কাছ থেকে এ সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না।

'অতএব, তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সংশয় করো না। আমার অনুসরণ করো। এটা সঠিক পথ।'

তারা কেয়ামত সম্পর্কে সংশয়াপন্ন ছিলো। কোরআন তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দিয়েছে। রসূলের মুখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করার আহ্বানও জানিয়েছে। কেননা একমাত্র তিনিই নির্ভুল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন, যার অনুসরণ করলে আর গোমরাহ হবার ভয় থাকে না। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের বিপথগামিতা ও ভ্রষ্টতা শয়তানের অনুসরণের ফল। আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হলে রসূলের আনুগত্য করাই উত্তম, শয়তানের নয়। (আয়াত ৬২)

মানুষের সাথে শয়তানের যে চিরন্তন যুদ্ধ তাদের আদি পিতা হযরত আদমের সময় থেকে চলে আসছে, তার কথা কোরআন সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয়। সবচেয়ে নির্বোধ হলো সেই ব্যক্তি, যে জানে যে, তার একজন শত্রু সব সময় তার বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে আছে, তারপরও সে তার ব্যাপারে সতর্ক হয় না; বরং তার তাঁবেদার হয়ে যায়।

মানুষ এই পৃথিবীতে যতোদিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন সে যাতে শয়তানের সাথে এই চিরন্তন লড়াইতে বিজয়ী হয়ে টিকে থাকতে পারে, সে জন্যে ইসলাম তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। আর এই লড়াইয়ে জিতলে তার জন্যে এতো পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আবার এ লড়াইয়ে হেরে গেলে তার জন্যে এতো শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে, যা তার ধারণারও অতীত। এভাবেই সে তার ভেতরেই লড়াইয়ের শক্তিকে এই চিরন্তন লড়াইয়ে নিয়োজিত করেছে। এ লড়াই মানুষকে খাঁটি মানুষ বানায়। তাকে সকল সৃষ্টির সেরা বানায়। ইসলাম এই পৃথিবীতে মানুষের তার ওই চিরশত্রু শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করাকে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কেননা এভাবেই সে অকল্যাণ, অন্যায় ও অসত্যের ওপর বিজয়ী হবে এবং সত্য, কল্যাণ ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

এরপর হযরত ঈসা ও তার আনীত আদর্শের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং তার আগমনের আগে ও পরে তারা যে মতভেদে লিপ্ত হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে। (আয়াত ৬৩-৬৫)

এ আয়াতগুলোর সারকথা এই যে, ঈসা (আ.) তার জাতির কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। এসব প্রমাণাদির মধ্যে সেই সব অলৌকিক জিনিসও অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দিয়ে সংঘটিত করেছিলেন, আর সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দানকারী বাণী ও নির্দেশণাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি তার জাতিকে বলেছিলেন, আমি তোমাদের কাছে হেকমত তথা প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে এসেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সে বিপুল কল্যাণ লাভ করে, যাবতীয় পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকে, উদাসীনতা ও শৈথিল্য থেকে রক্ষা পায় এবং তার সকল কাজে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়। হযরত ঈসা এসেছিলেন তাদের কিছু মতভেদের মীমাংসা করে দিতে। হযরত মূসার শরীয়তের বহু বিষয়ে তারা মতভেদের শিকার হয় এবং বহু দল উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর অনুগত্যের আহ্বান জানান এবং নির্ভেজাল ও আপোসহীন তাওহীদের বাণী বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করেন।

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু।'

তিনি এ কথা বলেননি যে, আমি একজন 'ইলাহ' বা মাবুদ। তিনি এও বলেননি যে, 'আমি আল্লাহর ছেলে'। এমনকি তিনি ঘুনাক্ষরেও ইংগিত দেননি যে, তার পক্ষ থেকে দাসত্ব আর সারা

বিশ্বের প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রভুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, এ হচ্ছে সঠিক ও সহজ সরল পথ এতে কোনো বক্রতা নেই, নেই কোনো ভ্রষ্টতা বা পদস্খলন। কিন্তু তার পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে পূর্ববর্তীদের মতোই। দলে দলে বিভক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ও বিনা প্রমাণে।

'অতএব তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা অন্যায় করেছে ....। (আয়াত ৬৫)

হযরত ঈসা বনী ইসরাইলের রসূল হয়ে এসেছিলেন। তারা রোম সম্রাটের অধীনে যে যুলুমের শিকার হচ্ছিলো তা থেকে তাদেরকে হযরত ঈসা (স.) মুক্ত করবেন এই আশায় তারা তার অপেক্ষায় ছিলো। অথচ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর তিনি যখন এলেন, তখন তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করলো, এমনকি তাকে শূলে চড়ানোর চক্রান্ত পর্যন্ত করলো।

হযরত ঈসা (আ.) যখন এলেন, তখন বনী ইসরাঈলকে বহুসংখ্যক দলে উপদলে বিভক্ত দেখলেন। তন্মধ্যে চারটে দলই ছিলো প্রধান।

১. সাদুকীয়ীন : 'সাদুক' এর নেতৃত্বাধীন দল। হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.) থেকে যে ধর্মীয় নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিলো, সাদুক ও তার পরিবার তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শরীয়ত মোতাবেক তার বংশ পরম্পরা হযরত মূসার ভাই হারুন থেকে নির্গত। কেননা তাঁর বংশধরই 'হায়কালে সোলায়মানীর' দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। তারা তাদের এই কাজ ও পেশার দাবীতে এবাদাতের বাহ্যিক আকৃতি ও নিয়ম কানুনে অত্যধিক কঠোর ছিলো। তারা বেদয়াতকে অস্বীকার করতো। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তারা স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষপাতী ছিলো এবং জীবনের স্বাদ উপভোগ করতো এমনকি তারা কেয়ামতের অস্তিত্বও স্বীকার করতো না।

২. ফিররীসীন : এ দলটা সাদুকীয়ীনদের প্রতিপক্ষ ছিলো। আনুষ্ঠানিক এবাদাতে এবং তার বাহ্যিক আকৃতি ও নিয়ম কানুনে সাদুকীয়ীনদের কঠোরতাকে তারা পছন্দ করতো না। সাদুকীয়ীনদের আখেরাত ও কেয়ামতের হিসাব নিকাশ অস্বীকার করারও তারা ঘোর বিরোধী ছিলো। ফিররীসীনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো সুফীবাদ ও দুনিয়ার আরাম আয়েশ পরিহার। অবশ্য তাদের কেউ কেউ জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বান হওয়ার সুবাদে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়ে গিয়েছিলো। হযরত ঈসা (আ.) তাদের এই দোষটার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

৩. সামেরীয়ন : এই দলটা ইহুদী ও আশোরীদের সংমিশ্রণে গঠিত ছিলো। এরা আদি যুগের পাঁচ খানা পুস্তক মেনে চলতো। এই পাঁচ খানা পুস্তক মূসার পুস্তক নামে পরিচিত। এছাড়া পরবর্তী কালের আর সব পুস্তককে তারা অস্বীকার করতো, যদিও অন্যরা তার পবিত্রতাকে স্বীকার করে।

৪. আসেয়ীন বা আসেনীয়ীন : এরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। এরা অন্যান্য ইহুদী উপদল থেকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে থাকতো। ব্যক্তিগত জীবনে তারা কঠোর ব্যয় সংকোচের নীতি অবলম্বন করে আর সামষ্টিক জীবনে তারা শৃংখলা ও ঐক্যের অনুসারী।

এ ছাড়া সেখানে আরো বহু ছোট ছোট উপদলও ছিলো এবং বনী ইসরাঈলের ভেতরে আকীদা বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ব্যাপক বিশৃংখলা ও মতানৈক্য বিরাজ করতো। বনী ঈসরাইল রোমাণ সাম্রাজ্যের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে প্রত্যাশিত ত্রাণকর্তার হাতে মুক্তি লাভের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণছিলো।

এ সময়েই হযরত ঈসা (আ.) তাওহীদের বাণী নিয়ে তাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তায়ালাই আমাদের ও তোমাদের একমাত্র প্রভু। কাজেই তোমরা তাঁর এবাদাত করো।'

তিনি এমন এক শরীয়ত চালু করলেন যাতে বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতের আগে উদারতা, আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

এ প্রসংগে হযরত ঈসা (আ.)-এর কয়েকটা সুপ্রসিদ্ধ বাণী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন,

'তারা বড় বড় বোঝা তৈরী করে এবং জনগণকে তা বহন করতে পীড়াপীড়ি করে, অথচ নিজেরা তার দিকে একটা আংগুলও এগিয়ে দেয় না। তারা কেবল লোক দেখানো কাজ করে। তারা তাদের আকর্ষণীয় বেশভূষা ও লম্বা চওড়া পোশাক পরে, বড় বড় মজলিসে ও ভোজের আয়োজনে সর্বাগ্রে আসন লাভের চেষ্টা করে এবং হাট বাজারে চলবার সময় লোকজনের সালাম ও অভিবাদন পাওয়ার প্রত্যাশা করে। তারা চায়, লোকেরা তাদেরকে সর্বত্র স্যার স্যার ও হুযুর হুযুর করুক।'

তাদের জন্যে হযরত ঈসার বক্তব্য, হে অন্ধ সমাজপতিরা, যারা সামান্য মশামাছি নিয়ে বাছবিছার করো, আর আস্ত উট গিলে খাও। তোমরা পেয়ালা ও থালার বহিরাংশ খুব পরিষ্কার করো বটে। তবে ভেতরে ভেতরে তোমরা নোংরামি ও ব্যাভিচারে লিপ্ত। হে লেখক সম্প্রদায় ও লোক দেখানো ফিররীসীনরা, তোমাদের পোড়া কপাল। তোমরা হচ্ছো সুসজ্জিত সমাধি সৌধের মতো। তার বহিরাংগন খুবই সুন্দর ও রংগীন আর ভেতরে হাড্ডি ও কংকাল।'

হযরত ঈসা (আ.)-এর এই উক্তিগুলো অধ্যয়ন করার সময় আমাদের এ যুগের পেশাদার ধর্মীয় নেতাদের চেহারা মানসপটে ভেসে ওঠে। মনে হয় এ শ্রেণীর পেশাদার ধার্মিকেরা পৃথিবীতে বার বার আসে এবং লোকেরা প্রতিনিয়তই তাদেরকে দেখতে পায়।

এরপর হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। তারপর তার অনুসারীরা নানা মতভেদের শিকার হলো এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউবা তাকে খোদা বানিয়ে নিলো, কেউবা তাকে আল্লাহর ছেলে ঠাওরালো। অন্যরা আল্লাহকে তিন উপাস্যের তৃতীয় জন বলে আখ্যায়িত করার ধৃষ্ঠতা দেখালো। এই তিন জনের একজন তাদের দৃষ্টিতে মারইয়ামের ছেলে ঈসা (আ.)। এভাবে হযরত ঈসা যে তাওহীদের বাণী নিয়ে এলেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তিনি জনগণকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়া ও এককভাবে তার এবাদাত করার যে আহ্বান জানালেন, তা বৃথা হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর তাদের ভেতর থেকে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতো অবলম্বন করলো। .... (আয়াত ৬৫)

কোরআনের ক্যানভাসে মোমেন ও পাপীদের পরকালীন চিত্র

এরপর আরবের মোশরেকরাও রসূল (স.)-এর সাথে হযরত ঈসা (আ.)-কে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। হযরত ঈসা পরবর্তীকালের দল-উপদলগুলোর অপতৎপরতা ও নানা রকমের বিভ্রান্তিকর গুজব ও অপবাদ রটনার কারণেই এই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে।

যুলুমবাজ ও অপরাধপ্রবণ মোশরেকদের সম্পর্কে কথা বলার পর এবার হযরত ঈসার পরবর্তী সেই সব কোন্দলরত দল-উপদলগুলোকে রসূল (স.)-এর সময়কার বিতর্ককারীদের সাথে একীভূত করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন এক কাতারে সমবেত হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, আর এই সাথে জান্নাতে অবস্থানকারী সম্মানিত মোত্তাকীদের বিবরণও দেয়া হচ্ছে। (আয়াত ৬৬-৭৭)

শুরুতে দেখানো হয়েছে তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে কেয়ামতের আগমনের দৃশ্য। (আয়াত ৬৬)

এই আকস্মিক ঘটনা একটা নতুন দৃশ্যের অবতারণা ঘটাবে, দুনিয়ার জীবনে শত্রু ও বন্ধুর যে অবস্থান সবার কাছে পরিচিতি ছিলো, তা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে,

'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে মোত্তাকীরা ছাড়া।' (আয়াত ৬৭)

বন্ধুদের এভাবে শত্রুতে পরিণত হওয়ার কারণটা তাদের বন্ধুত্বের কারণের মধ্যেই নিহিত। তারা দুনিয়ার জীবনে অন্যায়ের ওপর একমত থাকতো এবং একে অপরকে গোমরাহীর ব্যাপারে

উৎসাহিত করতো। কেয়ামতের দিন তারা পরস্পরকে ভর্ৎসনা করবে এবং গোমরাহী ও আযাবের জন্যে একে অপরকে দায়ী করবে। কেয়ামতের দিন তারা অন্তরংগ বন্ধু থেকে প্রকাশ্য শত্রুতে রূপান্তরিত হবে। তবে মোত্তাকীদের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। তাদের বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকবে। (এমনকি দুনিয়ার জীবনে কোনো ভুল বুঝাবুঝি মনোমালিন্য থেকে থাকলে তাও দূর করে দেয়া হবে। (আল হেজর আয়াত ৪৭) কেননা তারা হেদায়াতের পথের ওপর ঐক্যবদ্ধ ছিলো। সত্য ও কল্যাণের ব্যাপারে এবং আখেরাতের মুক্তির ব্যাপারে তারা পরস্পরের শুভাকাংখী ছিলো।

বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হয়ে যখন ঝগড়া বিবাদ ও পারস্পরিক কলহ কোন্দলে লিপ্ত হবে, তখন মোত্তাকী ও পরহেযগারদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্বোধন করবেন।

'হে আমার বান্দারা! তোমাদের আজ কোনো ভয় নেই ....।' (আয়াত ৬৮-৭১)

অর্থাৎ আজ তোমরা আনন্দে মাতোয়ারা থাকবে।

তারপর কল্পনার চোখে দেখা হচ্ছে, যেন স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে ঘোরা হচ্ছে, বেহেশতে মনে যা চায়, তাই পাওয়া যাচ্ছে এবং মন যা চায়, তা ছাড়াও যা দেখলে চোখ জুড়ায় তাও সেখানে বিদ্যমান। আর সৌন্দর্য ও পূর্ণতার সকল সাজ সরঞ্জামও সেখানে রয়েছে।

'তাদের কাছ দিয়ে স্বর্ণের পানপাত্র ও থালা ঘোরানো হবে এবং যা মনে চায় এবং যা দেখলে চোখ জুড়ায়, তার সবই সেখানে থাকবে।'

আর এই নেয়ামতের সাথে সাথে থাকবে এর চেয়েও বড় ও উত্তম জিনিস, সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন,

'আর তোমরা সেখানে চিরদিন বসবাস করবে। ওটা হচ্ছে সেই জান্নাত, তোমাদেরই কৃত কর্মের কল্যাণে যার তোমরা মালিক হবে ....।' (আয়াত ৭১-৭৩)

এরপর শুরু হয়েছে অপরাধীদের অবস্থার বিবরণ, 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাব চিরস্থায়ী হবে।'

বস্তুত এটা হলো চিরস্থায়ী আযাব। তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে। যা এক মুহূর্তের জন্যেও কমবে না বা ঠান্ডা হবে না। তারা মুক্তির আশার কোনো আলোর ঝলকও দেখতে পাবে না। তারা হতাশায় ভেংগে পড়বে। (আয়াত ৭৫)

তারা এভাবেই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের জায়গায় নিক্ষেপ করেছে। (আয়াত ৭৬)

এরপর দূর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা যাবে, যা হতাশা, বেদনা ও মর্ম যাতনায় পরিপূর্ণ,

'তারা ডাকবে, হে মালেক, (দোযখের প্রহরী) তোমার প্রভু আমাদেরকে মেরে ফেলুক' (আয়াত ৭৭)

এই আর্ত চিৎকার অনেক দূর থেকে ভেসে আসবে। জাহান্নামের রুদ্ধদ্বার কক্ষগুলো থেকে ভেসে আসবে। এটা আসলে সেই সব অপরাধীর চিৎকার। তারা মুক্তি বা সাহায্য চাইবে না। কেননা তেমন কোনো আশা থাকবে না। তারা নিজেদের তাৎক্ষণিক মৃত্যু চাইবে। এটা তাদেরকে শান্তি দেবে বলে তাদের মনে হবে।

মৃত্যুই যেন প্রত্যাশায় পরিণত হবে। এই চিৎকার থেকেই বুঝা যায় কতো কঠিন বিপদ মুসিবতে তারা থাকবে। এই আর্তনাদের আড়াল থেকে আমরা এমন কিছু লোকের সন্ধান পাই যারা আযাবের ভয়াবহতায় দিশেহারা হয়ে যাবে ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আযাবের যন্ত্রণা

তাদের ধৈর্যের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলবে। ফলে সেই তিক্ত চিৎকার ধ্বনিটা স্বতস্ফুর্তভাবেই বেরিয়ে আসবে, 'হে মালেক, তোমার প্রভু আমাদেরকে মেরে ফেলুক।'

কিন্তু এর জবাবটা আসবে অত্যন্ত অপমানজনক ও বেপরোয়া কণ্ঠে,

'সে বলবে, তোমাদেরকে তো এ অবস্থায়ই থাকতে হবে।'

অর্থাৎ মুক্তিও নেই, মৃত্যুও নেই, যেমন আছ, তেমনিই থাকবে।'

এই ভয়ংকর দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে এই সব সত্যদ্রোহীকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা হেদায়াত থেকে বিমুখ হওয়ায় এই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। সর্ব সমক্ষে তাদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এটা বিস্ময়ের সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ। (আয়াত ৭৮-৮০)

সত্য ও ন্যায়কে অপছন্দ ও ঘৃণা করার এই মনোভাবটাই তাদের ও সত্যের অনুসারীদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছিলো। সত্যকে বুঝতে তাদের বাকী ছিলো না এবং রসূল (স.)-এর সত্যবাদিতায় তাদের সন্দেহের লেশমাত্রও ছিলো না। কেননা যাকে তারা কখনো কোনো মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে দেখেনি, সে আল্লাহর ব্যাপারে কিভাবে মিথ্যা বলবে?

যারা সত্যের বিরোধী, তাদের বেশীর ভাগই নিশ্চিতভাবে জানে যে, ওটা সত্য। কিন্তু তারা তা অপছন্দ করে। কেননা সেই সত্য তাদের প্রবৃত্তির খায়েশ ও কামনা বাসনার বিরোধী এবং তাদের খেয়ালখুশী ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার পথে বাধা দেয়। তারা তাদের প্রবৃত্তির লালসার সামনে কাপুরুষ ও দুর্বল। কিন্তু সত্য ও তার আহ্বায়কদের সামনে খুবই সাহসী ও স্পর্ধিত। হয়তো বা প্রবৃত্তির লালসার সামনে তাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই সত্যের সামনে তাদের দৃষ্টতা ও সাহসিকতার ইন্ধন যোগায়।

এ কারণেই মহাশক্তিধর এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে আগত মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়েছেন ৭৯ ও ৮০ নং আয়াতে। সত্য যেখানে উপস্থিত সেখানে বাতিলের ওপর বাতিলপন্থীদের জিদ ধরার কারণে মহান আল্লাহও বদ্ধপরিকর হন যে, সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেনই। আল্লাহ তায়ালা তার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দ্বারা তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও কূটিল চক্রান্তের জবাব দেবেন। এই দুর্বল সৃষ্ট জীবেরা যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহর মোকাবেলায় দাঁড়ায়, তখন এই মোকাবেলার পরিণতি কী হতে পারে, তা কারো অজানা থাকতে পারে না।

এই ভয়ংকর হুমকির পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছেড়ে দেন এবং রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেন,

'বলো, আল্লাহর যদি কোনো সন্তান থেকে থাকে তবে আমিই সর্বপ্রথম তার উপাসনা করবো ....।' (আয়াত ৮১-৮৩)

তারা ফেরেশতাদের উপাসনা করতো এই ধারণার ভিত্তিতে যে, তারা আল্লাহর মেয়ে। আর যদি সত্যিই আল্লাহর কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আল্লাহর নবী ও রসূলই সবার আগে জানতেন এবং তাদের উপাসনা করতেন। কেননা তিনি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি। তার এবাদাতও আনুগত্য করা ও তার সন্তান থেকে থাকলে সে সন্তানের যথোচিত শ্রদ্ধা করার কাজটা তিনিই সবার আগে করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করেন না। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কোনো সন্তান থাকার ব্যাপারে তারা যে দাবী করে, তার কোনোই ভিত্তি নেই। আল্লাহ তায়ালা এমন উদ্ভট দাবী থেকে পবিত্র।

'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক, আরশের প্রতিপালক তাদের অপবাদ থেকে পবিত্র।' (আয়াত ৮২)

মানুষ যখন এই আকাশ ও পৃথিবী এর শৃংখলা, সমন্বয় এবং এর বিধি ব্যবস্থা ও পরিচালনার পেছনে যে মহা শক্তি ও পরাক্রম লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তখন উল্লেখিত ধরনের যাবতীয় দাবী দাওয়া ও ধারণা তার কাছে বাতিল বলে মনে হয়। সে স্বভাবতই অনুধাবন করতে পারে যে, এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টার সমকক্ষ কেউ থাকতে পারে না। যে সৃষ্টির জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বংশ বৃদ্ধি আছে, সে সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার সমান হতে পারে না। তাই উক্ত দাবী নিছক কৌতুক ও ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আর এ ধরনের জিনিস আলোচনার যোগ্য নয় বরং তা উপেক্ষার যোগ্য এবং এ ধরনের লোকদেরকে সাবধান করে দেয়াই ন্যায়সংগত। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতএব ওদেরকে ছেড়ে দাও বাকবিতন্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত থাকুক৷যতোদিন তারা প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন না হয় ...... ' (আয়াত ৮৩)

অর্থাৎ যে দিনের কিছু চিত্র তাদেরকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে।

এরপর তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দানের পর মহান স্রষ্টার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। (আয়াত ৮৬)

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীতে মাত্র একজনই ইলাহ বা মাবুদ রয়েছেন, যার গুণাবলীতে আর কেউ শরীক নেই। তার সব কাজই বিজ্ঞানসম্মত ও প্রজ্ঞাময় এবং বিশাল প্রকৃতির রাজ্যে তার জ্ঞান অপরিসীম। এরপর পুনরায় 'তাবারাকা' শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে। এ শব্দের অর্থ হলো, তিনি তাদের কল্পিত দাবীর অনেক উর্ধে। তিনি আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার সব কিছুর প্রতিপালক। একমাত্র তিনিই কেয়ামতের সঠিক তথ্য জানেন এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে ও শরীক মনে করা হতো। তাদের কেউ সেদিন কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। অথচ তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে সমর্থ বলে মনে করতো। কেননা সত্যকে স্বীকার করেনি৷এমন কেউ সুপারিশ করার ও পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর সত্যের প্রতি যে সাক্ষ্য দিয়েছে ও ঈমান এনেছে, সে সত্যের বিরোধীর পক্ষে সুপারিশ করবে না।

এরপর স্বাভাবিক যুক্তি নিয়ে তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। এটা সেই যুক্তি, যা নিয়ে তারাও সন্দেহ পোষণ করে না এবং তর্ক করে না। সেটা হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের স্রষ্টা। সুতরাং তাঁর সাথে অন্য কাউকে তারা কিভাবে শরীক করে কিংবা যে শরীক করে তাকে কিভাবে সুপারিশের যোগ্য মনে করে? (আয়াত ৮৭)

অর্থাৎ যে সত্যকে তাদের প্রকৃতি অস্বীকার করে না, বরং মেনে নেয়, সে সত্য থেকে তারা কিভাবে দূরে সরে যায় এবং কিভাবে তার অনিবার্য দাবীকে অস্বীকার করে?

সূরার শেষে রসূল কর্তৃক মহান আল্লাহর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানানোকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (আয়াত ৮৯)

এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ বাচনভংগী এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এই ফরিয়াদের জবাবে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে এড়িয়ে যান, তাদের পরোয়া না করেন, তাদেরকে নিয়ে মাথা না ঘামান, নিশ্চিন্ত থাকেন এবং ঠান্ডা মাথায়, শান্ত মনে, উদারচিত্তে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। এই নির্দেশ হচ্ছে কেয়ামত সম্পর্কে,

অতএব, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং বলো, 'সালাম।' তারা শীঘ্রই জানতে পাবে।

সূরা আদ দোখান

আয়াত ৫৯ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۗ اِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾
فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾ يَّغْشَى النَّاسَ ۗ هٰذَا
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা-মীম, ২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, ৩. আমি একে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি, অবশ্যই আমি হচ্ছি (জাহান্নাম থেকে) সতর্ককারী! ৪. তার মধ্যে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা (স্থিরীকৃত) হয়, ৫. (তা স্থিরীকৃত হয়) আমারই আদেশক্রমে, (কাজ সম্পাদনের জন্যে) আমি নিসন্দেহে (আমার) দূত পাঠিয়ে থাকি, ৬. (এটা সম্পন্ন হয়) তোমার মালিকের একান্ত অনুগ্রহে; অবশ্যই তিনি (সবকিছু) শোনেন, (সবকিছু) জানেন। ৭. তিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক। যদি তোমরা ঈমানদার হও (তাহলে তোমরা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না) ৮. তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের মালিক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও মালিক। ৯. (এ সত্ত্বেও) তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (এর সাথে) খেল তামাশা করে চলেছে। ১০. অতএব (হে নবী), তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ (তার) স্পষ্ট ধোঁয়া (নীচের দিকে) ছেড়ে দেবে, ১১. তা (অল্প সময়ের মধ্যে গোটা) মানুষদের গ্রাস করে ফেলবে; এটা হবে এক কঠিন শাস্তি। ১২. (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের মালিক, আমাদের কাছ থেকে এ আযাব সরিয়ে নাও, আমরা (এক্ষুণি) ঈমান আনছি।

أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا

مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ

نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ

فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوْٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ إِنِّيْ لَكُمْ

رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَّأَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾

وَإِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ

فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهٗٓ أَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا

إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾

১৩. (কিন্তু এখন) আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়, তাদের কাছে সুস্পষ্ট (মর্যাদাবান) রসূল তো এসেই গেছে, ১৪. (তা সত্ত্বেও) তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা বলেছে, (এগুলো হচ্ছে) পাগল ব্যক্তির শেখানো কতিপয় বুলি মাত্র! ১৫. আমি (যদি) কিছু সময়ের জন্যে আযাব সরিয়েও দেই (তাতে কি লাভ?) তোমরা তো নিসন্দেহে আবার তাই করবে। ১৬. একদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (এবং এদের কাছ থেকে) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবো। ১৭. এদের আগে আমি ফেরাউনের জাতির (লোকদেরও) পরীক্ষা করেছি, তাদের কাছেও আমার একজন সম্মানিত রসূল (মূসা) এসেছিলো, ১৮. (মূসা ফেরাউনকে বললো,) আল্লাহ তায়ালার এই বান্দাদের তোমরা আমার কাছে দিয়ে দাও; (কেননা) আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত নবী (হয়ে এসেছি), ১৯. (সে বললো,) তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ করো না, আমি তো (নবুওতের) এক সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসেছি; ২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি, ২১. যদি তোমরা আমার ওপর ঈমান না আনো তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। ২২. অতপর সে (এদের নাফরমানী দেখে) তার মালিকের কাছে দোয়া করলো (হে আমার মালিক), এরা হচ্ছে একটি না-ফরমান জাতি (তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে মুক্তি দাও)। ২৩. (আমি বললাম,) তুমি আমার বান্দাদের সাথে করে রাতে রাতেই (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো, (সাবধান থেকো, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে, ২৪. সমুদ্রকে শান্ত রেখে তুমি (পার হয়ে) যেও; নিসন্দেহে তারা (সমুদ্রে) নিমজ্জিত হবে।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا

فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ

السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا

فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى

وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ

قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

২৫. (যাবার সময়) ওরা নিজেদের পেছনে কতো উদ্যান, কতো ঝর্ণা ফেলে গেছে, ২৬. (ফেলে গেছে) কতো ক্ষেতের ফসল, কতো সুরম্য প্রাসাদ, ২৭. কতো (বিলাস) সামগ্রী, যাতে ওরা নিমগ্ন থাকতো, ২৮. এভাবেই আমি আরেক জাতিকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম। ২৯. (এ ঘটনার ফলে) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম অশ্রুপাত করলো– না যমীন (ওদের এ পরিণামে একটু) কাঁদলো, (আযাব আসার পর) তাদের আর কোনো অবকাশই দেয়া হলো না।

রুকু ২

৩০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলদের অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি– ৩১. ফেরাউন (ও তার গোলামীর শৃংখল) থেকে (তাদের আমি নাজাত দিয়েছি), অবশ্যই সে ছিলো সীমালংঘনকারী (না-ফরমান)-দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ৩২. আমি তাদের (জাতি বনী ইসরাঈলদের) দুনিয়ার ওপর জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, ৩৩. আমি তাদের (এমন কতিপয়) নিদর্শন দিয়েছি, যাতে (তাদের জন্যে) সুস্পষ্ট পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো। ৩৪. এ (মূর্খ) লোকেরা (মুসলমানদের) বলতো– ৩৫. এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু, আমরা (আর) কখনো পুনরুত্থিত হবো না। ৩৬. তোমরা যদি (কেয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো! ৩৭. (শক্তি সামর্থের দিক থেকে) কি তারা বড়ো, না 'তুব্বা' জাতি ও তাদের আগে যারা ছিলো তারা (বড়ো); আমি তাদের (মতো শক্তিশালীদেরও) ধ্বংস করে দিয়েছি, অবশ্যই তারা ছিলো (জঘন্য) না-ফরমান জাতি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝٣٨ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا

بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٩ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ

اَجْمَعِيْنَ ۝٤٠ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝٤١ اِلَّا

مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٤٢ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝٤٣ طَعَامُ

الْاَثِيْمِ ۝٤٤ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۝٤٥ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۝٤٦ خُذُوْهُ

فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝٤٧ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ

الْحَمِيْمِ ۝٤٨ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝٤٩ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ

تَمْتَرُوْنَ ۝٥٠ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝٥١ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٢ يَّلْبَسُوْنَ

مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٥٣ كَذٰلِكَ ۟ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٤

৩৮. আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই খেল তামাশার ছলে পয়দা করিনি। ৩৯. এগুলো আমি যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে) কিছুই জানে না। ৪০. অতপর এদের (সবার জন্যেই পুনরুত্থান ও) বিচার ফয়সালার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে। ৪১. সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের (সেদিন কোনো রকম) সাহায্য করা হবে! ৪২. অবশ্য যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (তার কথা স্বতন্ত্র); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও দয়ালু।

রুকু ৩

৪৩. অবশ্যই (জাহান্নামে) যাক্কুম (নামের একটি) গাছ থাকবে, ৪৪. (তা হবে) গুনাহগারদের (জন্যে সেখানকার) খাদ্য, ৪৫. গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে, ৪৬. ফুটন্ত গরম পানির মতো! ৪৭. (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) ধরো একে– অতপর হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও, ৪৮. তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও; ৪৯. (তাকে বলা হবে, আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো, তুমি (না ছিলে দুনিয়ার বুকে) একজন শক্তিশালী ও অভিজাত মানুষ! ৫০. (আর) এ শাস্তি সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলোই) ছিলে (বেশী) সন্দিহান! ৫১. (অপরদিকে) পরহেযগার লোকেরা নিরাপদ (ও অনাবিল) শান্তির জায়গায় থাকবে, ৫২. (মনোরম) উদ্যানে ও (অমিয়) ঝর্ণাধারায়, ৫৩. মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামনাসামনি হয়ে বসবে, ৫৪. এমনই হবে (তাদের পুরস্কার, উপরন্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলোচনা (পরমা সুন্দরী) হুর;

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝٥٥ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ

الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٦ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيْمُ ۝٥٧ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ

مُّرْتَقِبُوْنَ ۝٥٩

৫৫. তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল ফলাদির অর্ডার দিতে থাকবে, ৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের মালিক) তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন, ৫৭. (হে নবী, এ হচ্ছে মোমেনদের প্রতি) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ : (সত্যিকার অর্থে) এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য। ৫৮. অতএব (হে নবী), আমি এ (কোরআন)-কে তোমারই (মাতৃ)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ৫৯. সুতরাং তুমি (এদের পরিণাম দেখার জন্যে) অপেক্ষা করতে থাকো, আর ওরা তো প্রতীক্ষা করেই যাচ্ছে!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে প্রায় মিত্রাক্ষর শব্দসম্বলিত এই মক্কী সূরার তীব্র সূরের ঝংকার, ভয়াবহ দৃশ্য ও তাৎপর্যময় শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে প্রচন্ড ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

সমগ্র সূরা একটা অখন্ড ও এককেন্দ্রিক একক বলে মনে হয়। সেই কেন্দ্রের সাথে এর সব কটা অংশ এক সূত্রে বাঁধা, চাই সে অংশ কেসসা কাহিনী সম্বলিত হোক, কেয়ামতের দৃশ্য সম্বলিত হোক, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাহিনী সম্বলিত হোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত হোক। এগুলো সবই মানুষের হৃদয়ে চেতনা সঞ্চারে কার্যকর ও সহায়ক এবং কোরআন মানুষের অন্তরে ঈমানের যে সতেজ ও প্রাণবন্ত বীজ বপন করে, তাকে সাদরে গ্রহণের জন্যে প্রেরণাদায়ক ও উদ্বুদ্ধকারী।

সূরাটা কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে এবং তাকে সেই কল্যাণময় রজনীতে নাযিল করার বর্ণনা দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে রাতে প্রতিটা প্রজ্ঞাময় আদেশ বিতরণ করা হয় তা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়। অতপর মানুষের কাছে তাদের প্রতিপালককে পরিচিত করা হয়, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু। তারপর তার একত্ব প্রকাশ করে তাকে জীবন ও মৃত্যুর মালিক এবং অতীত ও বর্তমানের সকলের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করা হয়।

এরপর প্রসংগ পরিবর্তন করে আরবদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে,

'বরং তারা সংশয়ে পতিত হয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

আর এর অব্যবহিত পর এই সংশয় ও ছিনিমিনি খেলার জন্যে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে, *(আয়াত ১০-১১)*

এরপর আযাব দূর করার জন্যে তাদের দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেদিন আযাব এসে পড়বে, সেদিন তা আর দূর হবে না। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই আযাব

এখনো আসেনি, এখনো এই আযাব তাদের কাছ থেকে দূরে আছে, কাজেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে তাদের এই সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। কেননা আল্লাহর কাছে ফিরে গেলে আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। *(আয়াত ১৬)*

আযাব, প্রতিশোধ ও কঠিনতম পাকড়াও এর দৃশ্য সংক্রান্ত ভয়ংকর ঘোষণা প্রদানের পর ফেরাউন ও তার দলবলের ধ্বংসের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেদিন ফেরাউনের কাছে আল্লাহর রসূল এসেছিলো এবং বলেছিলো, আমার কাছে আল্লাহর বান্দাদেরকে সোপর্দ কর, আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল, আল্লাহর সাথে বাড়াবাড়ি করো না। তারা তার কথায় কর্ণপাত করলো না। ফলে আল্লাহর রসূল হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এত হাম্বি তাম্বি ও দম্ভোক্তি করার পরও ফেরাউন ও তার দলবল চরম অসহায় অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেলো। *(আয়াত ২৫-২৯)*

এরপর এই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাদের আখেরাত প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত বক্তব্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই শেষ কথা। আমাদের আর পুনরুজ্জীবিত হতে হবে না। বেশ, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে এসো'। 'তুব্বা' নামক জাতির ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। কেননা আরবরা তাদের চেয়ে ভালো নয় যে, তাদের ন্যায় পরিণতি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

এরপর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও আখেরাতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। *(আয়াত ৩৮-৩৯)*

একটুপরেই কেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ৪০) এরপর যাক্কুম গাছ ও অন্যান্য আযাবের উপকরণ সহ ভয়াবহ আযাবের দৃশ্য তুলে ধরে চরম বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলা হয়েছে, 'নাও, স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো পরম সম্মানিত ও প্রতাপশালী, এই যে সেই জিনিস, যা নিয়ে তুমি সন্দেহ প্রকাশ করতে।'

এর পাশাপাশিই দেখানো হয়েছে জান্নাতের গভীর উপভোগ্য দৃশ্য। জাহান্নামের আযাব যতো কঠিন, জাহান্নামের নেয়ামত ততোই সুখময়। সূরার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এই তুলনামূলক বিবরণ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরার শুরুর মতো সমাপ্তিও টানা হয়েছে কোরআন সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে। সেই সাথে একটা প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারীও দেয়া হয়েছে সর্বশেষ আয়াতে, 'অতএব অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষায় আছে।'

সূরাটা শুরু শেষ পর্যন্ত এর দ্রুত ও ক্রমাগত ধ্বনি দ্বারা এবং এর বিভিন্ন দৃশ্য ও রকমারি তাৎপর্যময় বক্তব্য দ্বারা থেকে মানুষের মনের ওপর ক্রমাগত ও প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকে। তাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বিভিন্ন জগত, দুনিয়া আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, অতীত ও বর্তমান, দৃশ্য ও অদৃশ্য অংগন, জীবন ও মরণ এবং সৃষ্টির বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানায়। এককথায় বলা যায়, সূরাটা অপেক্ষাকৃত ছোটো হলেও এতে রয়েছে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের এক বিরাট তথ্যভান্ডার।

তাফসীর

আয়াত ১-৫৯

কোরআন নাযিলের বরকতময় মুহূর্ত

'হা-মীম- সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ ....।' (১-৮)

সূরাটা হা-মীম এই দুটো অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে এই অক্ষর দুটোর এবং এই অক্ষর দুটো দিয়ে লেখা এই কেতাবের শপথ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার

উপস্থিতি নিয়ে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। এসব বর্ণমালার কসম খাওয়াটা কোরআনের কসম খাওয়ার মতোই। কেননা প্রত্যেকটা বর্ণই একটা যথার্থ অলৌকিক নিদর্শন অথবা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি, তাকে বাক শক্তি দান, তার বর্ণমালা উচ্চারণের উচ্চারণস্থল বিন্যাস, অক্ষরের নাম ও ধ্বনির প্রতীক নির্ণয় এবং মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা লাভের নিদর্শন। এর প্রত্যেকটাই এক একটা বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। প্রতিনিয়ত দেখতে দেখতে অভ্যাস ও পরিচিতি গড়ে ওঠার কারণে মানব মনে এগুলোর গুরুত্ব হালকা হয়ে যায়। এই অভ্যাস ও পরিচিতির উর্ধে উঠে চিন্তা করলে এ জিনিসগুলো সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, কিসের জন্যে এই কসম খাওয়া হলো? এর উদ্দেশ্য হলো, একটা পবিত্র ও কল্যাণময় রাতে এই কোরআন নাযিল হয়েছে এ কথা বলার। (আয়াত ১-৬)

যে পবিত্র কল্যাণময় রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে, সেটা কোনটা? এ সম্পর্কে নিগুঢ়তম সত্য ও নির্ভুলতম তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে আমরা এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এটা রমযানের কোনো এক রাত, যখন এই কোরআন নাযিল হওয়ার সূচনা হয়েছে। কেননা কোরআনে বলা হয়েছে, 'রমযান মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে।' এ কথা সুবিদিত যে, সেই রাতে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রে নাযিল হয়নি। তবে এই রাতে পৃথিবীর সাথে এর যোগাযোগ শুরু হয়েছে। 'কল্যাণময় রাতে কোরআন নাযিল করেছি' এ উক্তির তাফসীর প্রসংগে এটুকু বলাই যথেষ্ট।

বস্তুত যে রাতে মানবজাতির ওপর এই বিজয়াভিযান শুরু হয়েছে, যে রাতে মানবজাতির জীবনে এই ঐশী বিধানের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে, যে রাতে কোরআনের মাধ্যমে মহাজাগতিক বিধানের সাথে মানুষের সংযোগ শুরু হয়েছে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, যে রাতে মানুষের সহজাত বিবেক একে অত্যন্ত বিনম্রভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর ভিত্তিতে একটা স্বভাবসিদ্ধ স্থীতিশীল যে সৃষ্টিজগতে সে বাস করে, তার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ রক্ষা করে মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে, পবিত্র ও পরিচ্ছন্নভাবে এবং ঐশী জগতের সাথে পূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবন যাপনের প্রক্রিয়া যে রাতে শুরু হয়েছে, সে রাত যথার্থই কল্যাণময় ও পবিত্র।

যাদের কাছে সর্বপ্রথম কোরআন নাযিল হয়েছিলো, তারা মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটা বিস্ময়কর যুগ অতিক্রম করেছে। মহান আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম তাদের ভেতরকার ভালো-মন্দ, যোগ্যতা, ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাদের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রেখেছেন। এই দৃষ্টির কথা তারা তাদের প্রতিটা মুহূর্তে মনে রাখতো। আর প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সর্বপ্রথম তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতো, কেননা তারা বিশ্বাস করতো যে, তিনি অত্যন্ত নিকটবর্তী ও কার্যকর আশ্রয়দাতা।

সেই প্রজন্ম চলে গেছে। তারপর কোরআন উন্মুক্ত গ্রন্থ হিসাবে এবং মানব হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত গ্রন্থ হিসাবে বহাল রয়েছে। মানব হৃদয়ে তা এমন প্রভাব সৃষ্টি করে, যা যাদুও করতে পারে না। আর মোমেনের চেতনা ও আবেগে এমন পরিবর্তন সাধন করে, যা অনেক সময় রূপকথার মতো মনে হয়।

এরপর এই কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত কালের জন্যে একটা পূর্ণাংগ ও ন্যায়ভিত্তিক বিধান হিসেবে বহাল রয়েছে, যাতে সে সকল যুগে ও সকল পরিবেশে এমন আদর্শ মানব জীবন গড়ে তুলতে পারে, যা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আল্লাহর বিধান অনুসারে উৎকৃষ্টতম জীবন যাপন করবে এবং কখনো কোনো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির শিকার হবে না। এটা হচ্ছে একমাত্র ঐশী জীবন বিধানের বৈশিষ্ট্য।

মানুষ যা কিছু তৈরী করে বা রচনা করে, তা হয়তো বা তারই মতো অন্য কারো সৃষ্টির সমান বা উৎকৃষ্টতর হয়, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে এবং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা পরিবেশের মধ্যে তার উপযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সৃষ্ট জিনিস দীর্ঘস্থায়ী, পূর্ণাংগ, সর্বাবস্থার উপযোগী ও সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশে উপকারী হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে কল্যাণময় রজনীতে নাযিল করেছেন, প্রথমত মানুষকে সতর্ক সচেতন ও সচকিত করার জন্যে। 'আমি সতর্ককারী।' কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষের উদসীনতা ভ্রমপ্রবণতা ও তাকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত।

কোরআন নাযিল হওয়ার কল্যাণে কল্যাণময় এই রজনী এই কেতাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী ছিলো,

'এই রাতে প্রত্যেকটা প্রজ্ঞাময় নির্দেশ দেয়া হয়।'

অর্থাৎ এই কোরআনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রত্যেক বিষয়ে নিষ্পত্তি করা হয় চিরন্তন সত্য ও মিথ্যার মাঝে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এই রাতের পর কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে মানব জাতির জীবনে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে মানবজাতির জীবনে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা নীতি নেই, যা অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ থেকে যেতে পারে। শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধানে যেমন সব কিছু স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, মানব জীবনের নীতিমালারও তদ্রূপ সব কিছু স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

এসব ব্যবস্থাই করা হয়েছিলো আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই নবী ও রসূলদের পাঠিয়ে এই বিধানকে সুস্পষ্ট রূপ দেয়া হয়েছিলো।

'আমার পক্ষ থেকে নির্দেশের মাধ্যমে, আমিই, পাঠিয়েছি।'

আর এসবই ছিলো কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। (আয়াত ৬)

এই কোরআন নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ যেমন সুস্পষ্টভাবে ও সহজভাবে প্রতিভাত হয়, তেমন আর কোনোভাবে হয় না। আল্লাহর এই রহমত কোরআনকে অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করে এবং হৃদয়ে এমন স্বাভাবিকভাবে তা গৃহীত হয়, যেমন স্বাভাবিকভাবে রক্ত শীরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটা মানুষকে পরম দয়ালু মানুষে এবং মানব সমাজকে অত্যন্ত সহনশীল সমাজে রূপান্তরিত ক,রে যদিও চর্মচক্ষু দিয়ে তা বাস্তবে দেখা যায় না।

কোরআন যে আকীদা বিশ্বাসের বর্ণনা দেয়, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুসমন্বিত হওয়ার কারণে এতো সুন্দর যে, তার প্রতি মানুষের মনে গভীর ভালোবাসা ও আসক্তি জন্মে যায় এবং তার প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হয়। এখানে পূর্ণতা, নিপুণতা, উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতার প্রশ্ন বিবেচ্য নয়। কেননা কোরআনে এসব বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভ করে চলেছে এবং পূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ণতা লাভ করার কারণে তা এমন সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে যে, তা স্বতস্ফূর্ত ভালোবাসা ও আসক্তির উদ্রেক করে। এই সৌন্দর্য যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়কে বিশদভাবে ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরে, অতপর সেগুলোকে একত্রিত ও সমন্বিত করে এবং সবগুলোকে প্রধান মূলনীতির সাথে সংযুক্ত করে।

'তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।'

অর্থাৎ এই কোরআন কল্যাণময় রজনীতে রহমত বহন করে এনেছে। 'নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।' অর্থাৎ লোকে কি বলে ও কি করে, সে সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জেনেই তিনি মানুষের জন্যে যা নাযিল করা দরকার এবং যে ধরনের আইন কানুন, রীতি নীতি ও নির্দেশ তাদের জন্যে উপযোগী ও কল্যাণকর, তা নাযিল করেন।

'তিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সে সবের প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

অর্থাৎ তিনি তাদের জন্যে যা কিছুই নাযিল করেন, তা দ্বারা তাদেরকে প্রতিপালন করেন। এটা তাঁর বিশ্বপ্রতিপালনেরই একটা দিক মাত্র এবং তাঁর সেই প্রাকৃতিক বিধানেরই একটা অংশ, যা গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করছে। এখানে 'বিশ্বাসী হও' কথাটা দ্বারা তাদের বিশ্বাসের দোদুল্যমানতা ও অস্থিরতার দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। কেননা তারা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা যে আল্লাহ তায়ালা, তা স্বীকার করে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করে। এ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বস্রষ্টা এই সত্যটাও তাদের মনে অস্পষ্ট, অগভীর এবং এর ওপর তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই।

তিনিই সেই একক মাবুদ, যিনি জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা এবং অতীত ও বর্তমানের সকলের প্রতিপালক। (আয়াত ৮)

মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান এমন দুটো বাস্তব ব্যাপার যা সবাই সচোক্ষে দেখতে পায় এবং তা কোনো সৃষ্টিরই ক্ষমতার আওতাধীন নয়। এ সত্যটা যে কেউ অতি সহজে হৃদয়ংগম করতে পারে। মৃত্যুর দৃশ্য সর্বাবস্থায় জীবনের দৃশ্যের মতোই। মানুষের হৃদয়কে তা স্পর্শ করে, নাড়া দেয়, উদ্দীপিত করে, উদ্বুদ্ধ করে ও প্রভাবিত করে। এ জন্যে কোরআনে এ জিনিসটার ঘন ঘন উল্লেখ ও এ দ্বারা মানুষের ভাবাবেগকে আলোড়িত করার ব্যাপক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

'দোখান' বা ধুঁয়াসহ কেয়ামতের কিছু আলামত

উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টির এই পর্যায়ে উপনীত হবার পর এ আলোচনা এখানেই শেষ করে আরবদের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা অত্যন্ত পরিতাপজনক এবং যে রকম হওয়া উচিত তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (আয়াত ৯-১৬)

কোরআন বলছে যে,তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এবং সেই সব অকাট্য নিদর্শনাবলীতে সন্দেহ করছে। বেশ, ওদেরকে সেই ভয়ংকর দিন পর্যন্ত যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দাও।

'অতএব সেই দিনের অপেক্ষায় থাকো, যেদিন আকাশে সুস্পস্ট ধোঁয়া দেখা দেবে, তা মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে.......।'

প্রাচীন তাফসীরকার 'দোখান' বা ধোঁয়া সংক্রান্ত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতভেদে লিপ্ত হয়েছেন। কেউ বলেন, এটা কেয়ামতের দিনের ধোঁয়া। এর জন্যে অপেক্ষা করতে বলার হুমকি কোরআনের অন্যান্য হুমকি ও হুশিয়ারির মতোই। এই নিদর্শনটা আসবেই এবং রসূল (স.) ও অন্যরা তার প্রতীক্ষা করেছেন। কেউ বলেন, এ ধোঁয়া ইতিপূর্বেই দেখা গেছে। রসূল (স.)-এর হুমকি দেয়ার পর এটা যথারীতি দেখা গিয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর দোয়ায় তা আবার সরেও গিয়েছিলো। এখানে এই দুটো মত সাবিস্তারে তুলে ধরছি।

'হযরত সোলায়মান বিন মাহরান আল আ'মান, আবুয যোহা মুসলিম ইবনে সাবীহ থেকে এবং আবুয যোহা হযরত মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন, মাসরূক বলেন, 'আমরা একবার কূফার মসজিদে গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি তার সাথীদের বলছে, যেদিন আকাশে সুস্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে, তোমরা জানো এই ধোঁয়া কী? এই ধোঁয়া কেয়ামতের দিন আসবে, এই ধোঁয়া মোনাফেকদের চোখ কান ছিনিয়ে নেবে। আর মোমেনরা সর্দির মতো সামান্য একটু রোগে আক্রান্ত হবে। মাসরূক বলেন, এরপর আমরা ইবনে মাসউদের কাছে এলাম। তাকে ঘটনাটা জানালাম। তিনি শুয়েছিলেন। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন। তিনি বললেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীকে বলেছেন,

'তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিম লৌকিকতাকারী নই।' (ছোয়াদ ৮৬)

মানুষ যখন কোনো জিনিস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে, তখন সে সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তার বলা উচিত, 'আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।' এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা জানাচ্ছি, যখন কোরায়শরা ইসলাম গ্রহণে অত্যধিক বিলম্ব করে ফেললো এবং রসূল (স.)-এর প্রতি অবাধ্যতা দেখাতে লাগলো, তখন তিনি হযরত ইউসুফের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত করার আবেদন জানিয়ে বদদোয়া করলেন। এর ফলে তারা এতো কষ্ট ও ক্ষুধা ভোগ করতে লাগলো যে, তারা হাড়গোড় ও মৃত জন্তু খেতে লাগলো। তখন তারা আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাতো। কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতো না। অন্য রেওয়াতে আছে যে, কোনো ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার কষ্টের জ্বালায় ধোঁয়ার আকৃতির মতো দৃশ্য দেখতে পেতো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, অতএব সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করো যখন আকাশে সুস্পষ্ট ধোঁয়া দেখা দেবে। এই ধোঁয়া জনগণকে কাঠিন আযাবে ঢেকে ফেললো।' তখন লোকেরা রসূল (স.)-এর কাছে এলো। সবাই তাঁকে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, মুযারের (কোরায়শ) জন্যে পানি প্রার্থনা করুণ। তারা ধ্বংসের সম্মুখীন। রসূল (স.) পানি প্রার্থনা করলেন এবং বৃষ্টি নামলো। তখন নাযিল হলো,

'আমি অল্প সময়ের জন্যে এ আযাব হটিয়ে দেবো। তোমরা আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।' (দোখান ১৫)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, কেয়ামতের দিন কি তাদের আযাব হটানো হবে? পরে যখন তারা সুখ সমৃদ্ধি ফিরে পেলো, অমনি সাবেক অবস্থায় ফিরে গেলো। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'যেদিন আমি বৃহত্তম পাকড়াও করবো, সেদিন প্রতিশোধ নেবো।'

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই 'বৃহত্তম পাকড়াওয়ের দিন' দ্বারা বদর যুদ্ধের দিনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, ধোঁয়া, রোম, চাঁদ, পাকড়াও, ও লিযাম এই পাঁচটা ভবিষ্যদ্বাণী অতিক্রান্ত হয়েছে।' এ হাদীসটা বোখারী ও মুসলিম থেকে গৃহীত হয়েছে। ইমাম আহমাদ স্বীয় মোসনাদেও এটা উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী ও নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়েও এ হাদীস এসেছে। ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেমও এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এই তাফসীরের সাথে 'এবং ধোঁয়া অতিবাহিত হয়ে গেছে' এই মতের সাথে প্রাচীন মনীষীদের অনেকে একমত হয়েছেন, যেমন মোজাহেদ, আবুল আলিয়া ইবরাহীম নাখয়ী, যাহহাক ও আতিয়া আল- মূসা।

অন্য এক দল বলেছেন, এই ধোঁয়া এখনো অতিবাহিত হয়নি; বরং এটা কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। হযরত আবু হোরায়রার হাদীসে আছে যে একবার রসূল (স.) আরাফা থেকে আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসূল (স.) বললেন, তোমরা দশটা লক্ষণ না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা, ধোঁয়া, একটা অদ্ভুদত প্রাণী ইয়াজুয ও মাজুযের আবির্ভাব, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের আবির্ভাব, দাজ্জাল, তিনটে ধ্বংসের ঘটনা, একটা প্রাচ্যে, একটা পাশ্চাত্যে ও একটা আরব উপদ্বীপে এবং এডেন সাগরের তলা থেকে একটা আগুন বেরিয়ে এসে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তারা যেখানে রাত যাপন করবে, আগুনটাও সেখানে তাদের সাথে রাত কাটাবে এবং যেখানে তারা ঘুমাবে সেখানে সেও ঘুমাবে।' (সহীহ মুসলিম)

ইবনে জরীর আবু মালেক আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটে জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, প্রথমত ধোঁয়া, যা মোমেনকে আক্রান্ত করলে তার সর্দি হবে, আর কাফেরকে আক্রান্ত করলে তার শরীর ফুলে যাবে, দ্বিতীয়ত, অদ্ভুত প্রাণী, তৃত্বীয়ত দাজ্জাল। (তাবরানী, ইবনে কাসীর)

ইবনে জারীরের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলকিয়া বলেন, একদিন সকালে ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আজ ভোর পর্যন্ত আমার ঘুম হয়নি। আমি বললাম, কেন? তিন বললেন, লোকেরা বলেছিলো যে, লেজ বিশিষ্ট তারকা উঠেছে। আমি এই ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম যে, ধোঁয়া বোধ হয় এসে গেছে। তাই সকাল পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারিনি।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তার সাথে একমত সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস থেকে যেমন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কোরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধোঁয়া দেখা যাবে। অর্থাৎ এতো স্পষ্ট যে সবাই দেখতে পাবে। কিন্তু ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুসারে এটা শুধু মক্কাবাসী ক্ষুধা ও কষ্টের আতিশয্যে কল্পনার চোখে দেখেছিলো। আয়াতে আল্লাহ তয়ালা বলেন, 'সকল মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' অর্থাৎ তাদেরকে ঢেকে ফেলবে ও অন্ধ করে ফেলবে। ব্যাপারটা যদি কাল্পনিক হতো, যা শুধু মক্কাবাসী মোশরেকদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো, তাহলে 'সকল মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে' একথা বলা হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'এই যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' অর্থাৎ তাদেরকে ধমক ও শাসানি স্বরূপ একথা বলা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, যেদিন তাদেরকে দোযখের দিকে ঠেলে দেয়া হবে, আর বলা হবে, এই যে সেই দোযখ, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। এমনও হতে পারে যে, এ কথা দোযখবাসীরাই দোযখে প্রবেশের প্রাক্কালে পরস্পরকে বলবে। 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে আযাব সরিয়ে নাও। আমরা ঈমানদার।' অর্থাৎ কাফেররা সচোক্ষে আযাব দেখে আযাব সরিয়ে নেয়ার আবেদন জানাবে আর এ কথা বলবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তুমি যদি দেখতে যখন তাদেরকে দোযখের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে 'হায়, আমাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনগুলোকে অবিশ্বাস করতাম না, বরং ঈমানদার হয়ে যেতাম।' অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'মানব জাতিকে আযাব আসার দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, সেদিন অপরাধীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে স্বল্প মেয়াদের জন্যে অবকাশ দাও......... আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেছেন, 'তারা কেমন করে উপদেশ গ্রহণ করবে?' অর্থাৎ কিভাবে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে, অথচ আমি তাদেরকে রসুল পাঠিয়ে সতর্ক করেছিলাম। তবুও তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মেনে নেয়নি, বরং তাকে অস্বীকার করেছে আর তারা তাকে বলেছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সেদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে..... এবং আল্লাহ বলেছেন, যদি তুমি দেখতে, যখন তারা ঘাবড়ে যাবে......., (সূরা সাবার শেষ কটা আয়াত) আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি কিছুকালের জন্যে আযাব দূর করে দেবো, তোমরা আবার ফিরে যাবে।' এর দুটো অর্থ হতে পারে, এক, আমি যদি সাময়িকভাবে তোমাদের আযাব দূর করে দিয়ে তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিতাম, তাহলে তোমরা আবার তোমাদের সাবেক কুফরীতে ফিরে যেতে।' যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যদি আমি তাদের ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করতাম এবং তাদের আযাব দূর করে দিতাম, তাহলে তারা তাদের অবাধ্যতায় অন্ধভাবে ডুবে যেতো .... এবং যেমন তিনি বলেছেন , 'তাদেরকে যদি পুনরায় ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে তারা সেই কাজই আবার শুরু করতো, যা তাদেরকে

নিষেধ করা হয়েছে........।' দুই, এর অর্থ এও হতে পারে যে, পার্থিব জীবনেই তোমাদের অপকর্মের দরুন তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়া অবধারিত হওয়া সত্তেও আমি সাময়িকভাবে তোমাদের ওপর থেকে আযাব বিলম্বিত করেছি। তথাপি তোমরা তোমাদের বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতা অব্যাহত রেখেছো। আযাব দূরে সরানোর জন্যে আযাব শুরু হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ইউনুসের জাতি যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের কাছ থেকে আযাব হটিয়ে দিলাম......।' তাদের ওপর আযাব শুরু হয়ে যায়নি, বরং তাদের অপকর্মের দরুন তা অবধারিত ও তাদের প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিলো। কাতাদা এভাবে তাফসীর করেছেন তোমরা আল্লাহর আযাবের দিকে ফিরে যাবে। আর 'যেদিন আমি বড়ো পাকড়াও করবো, সেদিন আমি প্রতিশোধ নেবো' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, এর অর্থ বদরযুদ্ধের দিন। হযরত ইবনে মাসউদের সমমনা কিছু সংখ্যক মনীষীও এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আওফী ও উবাই ইবনে কাব-এর বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবনে আব্বাস এভাবেও তাফসীর করেছেন। এটা সম্ভব। আসলে এর প্রকাশ্য অর্থ হলো কেয়ামতের দিন যদিও বদর যুদ্ধের দিনও একটা পাকড়াও এর দিন ছিলো বটে। ইবনে জারীর ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইবনে মাসউদ বলেছেন, এর অর্থ বদর যুদ্ধের দিন। কিন্তু আমার মতে, এটা কেয়ামতের দিন। এটাই তার থেকে উদ্বৃত বিশুদ্ধ বর্ণনা। হাসান বসরী ও ইকরামার মতে এটাই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। বাকী আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।' ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতি শেষ।

দোখান বা ধোঁয়ার ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যই আমি গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এটা কেয়ামতের দিন। ইবনে কাসীরও তার তাফসীরে এই মতটা অবলম্বন করেছেন। এটা একটা হুমকি এবং কোরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো তারা সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হচ্ছে এবং ছিনিমিনি খেলছে। তাদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও এবং সেই ভয়াবহ দিনের অপেক্ষায় থাক, যেদিন আকাশে সুস্পষ্ট ধোঁয়া দেখা দেবে এবং তা মানবজাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের মিনতি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে,

'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দাও, আমরা ঈমান আনবো।'

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এ মিনতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা এর সময় পার হয়ে গেছে, কিভাবে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। তাদের কাছে একজন প্রকাশ্য রসূল এসেছিলো। এরপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, তো একজন অনারব যুবক তাকে শিখিয়ে দেয়। তাদের ধারণামতে তিনি পাগল।

যে প্রেক্ষাপটে তারা আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করে, কিন্তু তা মেনে নেয়া হয় না, সেই প্রেক্ষাপটে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের এখনো সুযোগ রয়েছে, এ সুযোগ এখনো নষ্ট হয়নি। এ আযাব এখন তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তোমরা এখন দুনিয়ায় আছ। এখন তোমরা এই আযাব থেকে মুক্ত। অতএব তোমরা ঈমান আনো। আখেরাতের অপেক্ষায় থেকো না। কেননা সেখানে ঈমান আনলে তা গৃহীত হবে না। এখন তোমরা শান্তিতে আছ। এ শান্তি চিরস্থায়ী নয়। কেননা তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেই বৃহত্তম পাকড়াও'-এর দিন যখন তোমরা ধোঁয়া দেখবে, সেদিন আমি তোমাদের আজকের ছিনিমিনি খেলা ও রসূল (স.)-কে শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল বলে মিথ্যে আখ্যাদানের প্রতিশোধ নেব। কেননা তিনি তো সত্যবাদী ও বিশ্বাসী।

এভাবেই এ আয়াতগুলোর তাফসীর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ফেরাউনের করুণ পরিণতি

এরপর হযরত মূসার কাহিনীর আর একটা বক্তব্য শুরু করা হচ্ছে। এ কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। এর শেষ পরিণতি হিসেবে এই পৃথিবীতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো। ইতিপূর্বে তাদেরকে তার বৃহত্তম পাকড়াও দেখানো হয়েছে আকাশে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার দিন। হযরত মূসার এই ঘটনা। (আয়াত ১৭-৩৩)

এই পর্বটির সূচনা হচ্ছে একটা প্রবল ঝাঁকুনির মাধ্যমে। এই ঝাঁকুনি দ্বারা ওদের অচেতন মনকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে এবং এই সত্যটির প্রতি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে রসূল প্রেরণ করা হয় অনেক সময় তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। এই পরীক্ষা তাদের জন্যে যারা আল্লাহর ওপর বড়াই করে এবং রসূল ও তাঁর অনুসারী মোমেনদেরকে নির্যাতন করে। ওদের দৃষ্টি আর একটি সত্যের প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে। তাহলো, রসূলকে রাগান্বিত করা, নির্যাতনের ফলে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটা এবং হেদায়াতের ব্যাপারে তার আশাহত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বলা হয়েছে,

'তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি।'

অর্থাৎ আমি তাদেরকে নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেছি, ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেছি, পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে পরীক্ষা করেছি, সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করেছি এবং মান মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষা করেছি।

এরপর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং তাদের প্রতি একজন সম্মানিত রসূল আগমন করেন' বস্তুত, রসূলের এই আগমনও ছিলো তাদের জন্যে এক বিরাট পরীক্ষা। কারণ, এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে যাবে তারা সেই সম্মানিত রসূলের ডাকে কতোটুকু সাড়া দেয় যিনি তাদের কাছে কোনো কিছুই দাবী করেন না। বরং তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সব কিছু নিবেদন করতে বলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন যেন আল্লাহর সাথে কার্পণ্য করে নিজেদের কোনো কিছু লুকিয়ে না রাখে। এই প্রসংগে বলা হচ্ছে,

'এই মর্মে যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে দিয়ে দাও, আমি তোমাদের জন্যে প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল...........।'

এই সংক্ষিপ্ত কয়টি কথাই তাদের সম্মানিত রসূল মূসা (আ.) তাদের সামনে পেশ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের কাছ থেকে সার্বিক সাড়া কামনা করেছেন, পূর্ণ অর্পণ কামনা করেছেন এবং নিশর্ত আত্মসমর্পণ কামনা করেছেন। এই নিশর্ত আত্মসমর্পণ হবে একমাত্র সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে যিনি তাদের প্রভু এবং তারা তাঁর বান্দা। কাজেই মনিবের ওপর বড়াই করা বান্দাদের জন্যে শোভা পায় না। এই উপদেশ হচ্ছে মূলত আল্লাহর যা রসূল তাদের কাছে বয়ে নিয়ে এসেছেন। আর তিনি যে আসলেই আল্লাহর প্রেরিত রসূল, সে মর্মে তার কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এমন মযবুত দলীল আর অকাট্য প্রমাণ যার সত্যতার ব্যাপারে মন সায় দেয়। তাছাড়া তিনি নিজ পালনকর্তার কাছে আশ্রয় কামনা করেন এবং মানুষের আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি কামনা করেন। তারা ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করে নিচ্ছেন এবং তাদেরকেও তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলছেন। এটা নিসন্দেহে চূড়ান্ত ইনসাফ, ন্যায়-বিচার এবং শান্তিপ্রিয়তা।

কিন্তু স্বৈরাচার কখনও ইনসাফের ধার ধারে না। বরং সত্যকে ভয় পায়, সত্যের অবাধ বিচরণকে ভয় পায়। তাই প্রথমে শান্তিতে ও নীরবে মানুষের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করে। এরপর সত্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানে এবং অত্যন্ত কঠোর হস্তে সত্যকে দমন করে। সত্যের সাথে

স্বৈরাচারের কোনো আপস নেই। এখানে আপসের অর্থ হচ্ছে, অবাধে সত্যের বিচরণ ঘটুক এবং প্রতিদিন মানুষের হৃদয়ে তার স্থান হোক। এরপর বাতিল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ওঠুক, নির্যাতনে মেতে উঠুক এবং সত্যকে আরামে ও নিরাপদে থাকতে না দিক তাতে কিছুই এসে যায় না।

এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনার অনেকগুলো পর্ব উল্লেখ করে একে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে পর্যায়ে পৌঁছে মূসা (আ.) অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তার জাতি কখনও ঈমান গ্রহণ করবে না, তার ডাকে কখনও সাড়া দেবে না, এমনকি তাঁর সাথে কখনও আপসও করবে না অথবা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নও হবে না। এই পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারেন যে, অপরাধ প্রবণতা তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে এবং এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা-ভরসা নেই। তখন তিনি নিজ প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে বলে ওঠেন, 'এরা হচ্ছে অপরাধী সম্প্রদায়।'

এমন ফরিয়াদ জানানো ছাড়া একজন নবী আর কিইবা করতে পারেন। একজন নবী তার সকল বিষয় আল্লাহর হাতেই অর্পণ করে থাকেন এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর স্বাধীন ফয়সালা কামনা করেন।

আল্লাহর কাছ থেকে মূসা (আ.) তার ফরিয়াদের জবাব পেলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তিও পেলেন যে, তার সম্প্রদায় সত্যি সত্যিই অপরাধী। বলা হলো, 'তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হয়ে পড়, (তবে মনে রেখো) নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে................।' (আয়াত ২৩-২৪)

ভ্রমণ রাতের বেলায়ই হতো। তারপরও আলোচ্য আয়াতে সে কথা স্পষ্টভাবে বলার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা হলো, ভ্রমণের সময় গোপনীয়তার দৃশ্যটি চিত্রায়িত করা। কারণ, মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় অর্থাৎ বনী ইসরাইলের লোকজনদেরকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যেন বিষয়টি ফেরাউন বা তার লোকজনদের কেউ টের না পায়। সাথে সাথে তাঁকে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি যেন নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হওয়ার সময় তাদের পেছনে সমুদ্রকে শান্ত রেখে যান, ফলে ফেরাউন ও তার লোক লস্কর প্রতারিত হয়ে তাদেরকে অনুসরণ করতে যাবে। আর এভাবেই তারা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির সম্মুখীন হবে। কারণ তিনি তাদেরকে 'নিমজ্জিত বাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর এই মন্তব্য জাগতিক নিয়মেই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিলো, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, জাগতিক উপায় উপকরণও অবধারিত ভাগ্যের সহযোগী রূপে কাজ করে থাকে।

সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাটি এখানে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি। বরং তারা যে নিমজ্জিত হবে, আল্লাহর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাই বলা হয়েছে। এরপর যে মন্তব্য করা হয়েছে তা স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী ফেরাউন ও তার লোক লস্করদের করুণ চিত্র প্রকাশ করে, অসহায়ত্বের দৃশ্য প্রকাশ করে। আল্লাহর সামনে তারা অত্যন্ত অসহায়। এই জগতের সামনেও অসহায়। অথচ এই জগতের বুকে কি দোর্দন্ড প্রতাপ নিয়ে, নাক উঁচু করে শাসন শোষণ করেছে, তার ভক্ত অনুরক্তরা সর্বক্ষণ তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকতো। অথচ আজ সে এতোই তুচ্ছ ও নগণ্য এবং অক্ষম ও দুর্বল যে, তার অস্তিত্বকে কেউ অনুভব করছে না। আজ তার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে অথচ বাধা দেয়ার কেউ নেই, আজ তার এই করুণ পরিণতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার মতো কেউ নেই। তাই বলা হচ্ছে,

'তারা ছেড়ে গিয়েছিলো উদ্যান ও প্রস্রবণ ....।' (আয়াত ২৫-২৯)

আলোচ্য আয়াতের প্রথমেই ওদের বিলাস ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, উদ্যান, ঝর্ণা, শস্য শ্যামল ক্ষেত, মর্যাদাপূর্ণ স্থান, মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা, পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ

যা তারা নিজেরা ভোগ করতো এবং অপরকে দান করতো। মোটকথা, তাদেরা জীবন ছিলো অত্যন্ত সুখ ও সাচ্ছন্দের, এরপর তাদের কাছ থেকে এসব ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তা অন্য সম্প্রদায়কে দান করা হয়। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর এভাবেই আমি তা বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকার রূপে দান করেছি......।' বলা বাহুল্য, বনী ইসরাঈল ফেরাউনের রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেনি। তবে তারা অনুরূপ রাজত্ব ভিন্ন এক দেশে লাভ করেছিলো। তাই আয়াতের অর্থ হলো, যে নেয়ামত ও রাজত্ব ফেরাউন ও তার লোকজনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, সেরূপ নেয়ামত ও রাজত্ব বনী ইসরাঈলকে দান করা হয়েছে।

এরপর কী হলো? এরপর যা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী এই শাসকগোষ্ঠী যারা এক সময় দন্ডমুন্ডের মালিক ছিলো, আজ তারা নীরবে চলে গেলো। অথচ একটা প্রাণীও তাদের জন্যে আক্ষেপ করলো না, দুঃখ প্রকাশ করলো না, তাদের এই চলে যাওয়াকে আসমান ও যমীনের কেউই অনুভব করলো না। এমনকি বিপদের মুহূর্তটি একটুও বিলম্বিত করা হলো না, অথবা তাদেরকে একটু সুযোগও দেয়া হলো না। তাই বলা হয়েছে,

'তাদের জন্যে আসমান কান্নাকাটি করেনি ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি' (আয়াত ২৯)

এটা এমন একটি বর্ণনাভঙ্গি যার মাঝে একদিকে অসহায়ত্বের চিত্রও ফুটে উঠেছে, আবার অপর দিকে নির্মমতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই অহংকারী, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেলো, অথচ আসমান ও যমীনের কেউ সেটা টের পেলো না, তাদের জন্যে কেউ একটু দুঃখও প্রকাশ করলো না। একেবারে পিঁপড়ার মতো চলে গেলো। অথচ তারাই তো পৃথিবীর বুকে ছিলো দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী, যারা জুতা পায়ে মানুষকে পিষ্ট করতো। তারা আজ নীরবেই চলে গেলো। কেউ তাদের জন্যে কাঁদলো না, আহাজারি করলো না। গোটা বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আজ সৃষ্টিজগত তাদের ওপর নাখোশ। কারণ, সৃষ্টি জগত হচ্ছে আস্তিক ও বিশ্বাসী। আর ওরা হচ্ছে নাস্তিক ও অবিশ্বাসী। তাই ওরা নষ্ট আত্মা, ওরা এই বিশ্বে বাস করেও অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য।

এই বাক্যগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম যদি জুলুমবাজ ও অত্যাচারীরা অনুধাবন করতে পারতো তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারতো তারা আল্লাহর সামনে কতো অসহায়, এই গোটা সৃষ্টিজগতের সামনে কতো অসহায়, তারা আরও বুঝতে পারতো যে, তারা এই বিশ্বে বাস করেও উদ্বাস্তু, অস্পৃশ্য ও বিচ্ছিন্ন। বিশ্বের কোনো কিছুর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ তারা ঈমানের বন্ধন ছিন্ন করেছে।

এই করুণ দৃশ্যের বিপরীতে আমরা ভিন্ন আর একটি দৃশ্য দেখতে পাই। সে দৃশ্য হচ্ছে মুক্তির, সমাদর ও মনোনয়নের। বলা হয়েছে, 'আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছি। ফেরাউন। সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়....।' (আয়াত ৩০-৩৩)

এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল অপমানজনক শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে, অপরদিকে সীমালংঘনকারী ও অত্যাচারীরা মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তৎকালীন বিশ্বের জন্যে মনোনীত করে ছিলেন। কারণ তারা সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দক্ষতার দিক থেকে সবার শ্রেষ্ঠ ছিলো। তাই তারা নেতৃত্বের জন্যে যোগ্যতর ছিলো। অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের মাঝে আদর্শচ্যুতি ঘটে, নৈতিক অধপতন ঘটে, দুর্নীতির প্রসার ঘটে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লাহর মনোয়ন ও সমর্থন কখনও কখনও সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতর শ্রেণীর ভাগ্যে জুটে থাকে যদিও সেই শ্রেণী ঈমান ও আকিদার ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের নয়। অবশ্য সেই শ্রেণীর মাঝে এমন নেতৃত্বের

যোগ্যতা থাকতে হবে যা তাদেরকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেবে এবং তাদেরকে নৈতিকতা, সততা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিচালিত করবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিলো স্পষ্ট পরীক্ষা' (আয়াত ৩৩)

এসব নিদর্শনাবলী তাদেরকে পরীক্ষাস্বরূপ দেয়া হয়েছিলো। তাই তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। পরীক্ষার পালা শেষ হয় এবং পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্বের মেয়াদও শেষ হয়। এখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের নৈতিক অধপতন ও আদর্শচ্যুতির অপরাধে পাকড়াও করেন, তাদের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্যে পাকড়াও করেন। ফলে তাদের ওপর এমন শাসককে চাপিয়ে দেন যে তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে, বিতাড়িত করে। এরপর লাঞ্ছনা ও দৈন্যদশা তাদের কপালের লিখন হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, যখনই তারা পৃথিবীর বুক বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, তখনই তারা বিতাড়ন ও শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং এই অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

পুনরুত্থান সৃষ্টিরই অনিবার্য দাবী

ফেরাউন ও তার লোক লস্করদের করুণ পরিণতি, মুসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মুক্তি, পরবর্তীকালে তাদের পরীক্ষা ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ঘটনার পর এখন আলোচনা করা হচ্ছে। পরকাল ও পুনর্জন্ম সম্পর্কে মোশরেকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রসংগ। এরপর গোটা বিষয়কে জীবন ও জগতের সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে দেখানো হয়েছে যে, পরকালের পুনরুত্থান ও পুনর্জন্ম এই জীবন ও জগত সৃষ্টিরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। আয়াতে এ প্রসংগে বলা হয়েছে,

'কাফেররা বলেই থাকে, প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সব কিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না........' (আয়াত ৩৪-৪২)

আরবের মোশরেক সম্প্রদায় বলে বেড়াতো, মৃত্যু একবারই হবে এবং এই মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। পরকালের হিসাব নিকাশ বলতেও কিছু নেই। এই মৃত্যুকে তারা বলতো প্রথম মৃত্যু। অর্থাৎ পুনরুত্থানের অগ্রবর্তী মৃত্যু। তাদের মতে এটাই প্রথম এটাই শেষ। প্রমাণস্বরূপ তারা বলে, তাদের পূর্ব পুরুষরা একবারই মৃত্যুবরণ করেছে। এরপর তারা আর পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। পুনরুত্থান বলতে কিছু থাকলে নিশ্চয়ই তারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতো। যদি এই পুনরুত্থান সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে উঠানো হোক।

তারা এই দাবী করতে গিয়ে পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের মূল রহস্যটাই বেমালুম ভুলে যায়। তারা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, মানবসৃষ্টির পেছনে কিছু রহস্য আছে, নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য আছে। মানবজীবনের কয়টি স্তর আছে। জীবনের প্রথম স্তরের সৎ বা অসৎ কর্মের ফলাফল মানুষকে জীবনের শেষ স্তরে প্রদান করা হবে। সৎকর্মশীলদের পরিণতি হবে শুভ, মঙ্গলজনক ও সম্মানজনক। অপরদিকে জীবনের প্রথম স্তরে যারা ভুল পথে চলেছে, অন্যায় ও অবিচার করেছে, অবাধ্যাচরণ করেছে, তাদের পরিণতি হবে অশুভ, অমঙ্গলজনক ও অসম্মানজনক। আর এটা সম্ভব হবে না যদি জাগতিক জীবনের অবসানের পর দ্বিতীয় স্তরের জন্যে পুনরুত্থান না ঘটে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, পুনরুত্থান ও কোনো হেলা-খেলার বিষয় নয় যে, তা ব্যক্তির খেয়াল খুশী মতো ঘটবে বা তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী তা প্রকাশ পাবে, যাতে করে পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের পক্ষে সহজতর হয়। অথচ তাদের জানা উচিৎ যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত চোখে না দেখেই এই অদৃশ্য বিষয়টি স্বীকার করা না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানই পূর্ণতা

লাভ করবে না। এই বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যেক নবী ও রসূল সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং নিজ নিজ জাতিকে অবহিত করেছেন। বিষয়টি বুঝতে হলে এই জীবনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝতে হবে এবং কি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা জীবন সৃষ্টি করেছেন, তা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। এই গভীর চিন্তাই পরকালের বিশ্বাসের জন্যে যথেষ্ট এবং পুনরুত্থানের সত্যতার জন্যে যথেষ্ট।

জীবন ও জগতের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে বিগত জাতিসমূহের পতনের ঘটনা উল্লেখ করে তাদের মনে একটা তীব্র ঝাঁকুনির সৃষ্টি করা হচ্ছে। আরব উপদ্বীপের হিময়ার সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা বাদশাদের এসব করুণ ঘটনা যেহেতু তাদের জানা ছিলো। তাই তাদেরকে অনুরূপ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বিবেককে নাড়া দেয়ার লক্ষ্যে এখানে কেবল মূল ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'ওরা শ্রেষ্ঠ, না 'তুব্বার' সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিলো অপরাধী' (আয়াত ৩৭)

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে যখন তাদের হৃদয়ে কম্পনের সৃষ্টি হবে, তখনই তারা এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবেদনশীল মন নিয়ে চিন্তা করতে প্রস্তুত হবে। তখন তারা বিশ্বজগতের মাঝে এক অদ্ভূত শৃংখলা লক্ষ্য করবে, এর পেছনে এক বিস্ময়কর নিয়মকে ক্রিয়াশীল পাবে। তাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে,

'আমি আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যকার সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছি.........।' (আয়াত ৩৮-৪২)

খুব কোমলভাবে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আসমান যমীন ও এর মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টির মাঝে এবং পুনরুত্থানের মাঝে একটা সুক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। আর মানুষ সেটাকে খুব সহজে তখনই অনুভব করতে পারে যখন তার সামনে বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করা হয়।

আসলে মানুষ যখন গভীরভাবে বিশ্বজগতের সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল রহস্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দৃশ্যমান শৃংখলা তলিয়ে দেখবে, যখন লক্ষ্য করবে যে, প্রতিটি বস্তুকে একটা নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে; যখন লক্ষ্য করবে স আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তু অন্যান্য সকল বস্তু ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সমন্বয় সাধন করে চলছে এবং যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে তা পূরণ করে চলছে; যখন লক্ষ্য করবে যে, এই বিশাল জগতের ছোটো বড়ো কোনো কিছুই দৈবক্রমে বা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, বরং এর প্রতিটির সৃষ্টির পেছনে এক গভীর রহস্য, সুক্ষ্ম তাৎপর্য এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে তখনই মানুষ বুঝতে পারবে এই সৃষ্টিজগত তাৎপর্যহীন নয়, উদ্দেশ্যহীন নয়; বরং এই গোটা সৃষ্টিজগত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। এর সমাপ্তি আছে। তবে এর সময় এখনও আসেনি এবং এই গ্রহের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলেই এই জগতের সমাপ্তি ঘটবে না। সে আরও বুঝতে পারবে যে, পরকালের বিষয় এবং পরকালে হিসাব নিকাশের বিষয়টি সত্য ও অনিবার্য; নিছক যৌক্তিক দিক থেকেও সত্য। কারণ পরকাল না হলে জীবন ও জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। পার্থিব জীবনের ভালো মন্দের হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের কাজ এই পরকালেই সম্পন্ন করা হবে, অন্য কোথাও নয়। পরকালের শাস্তি বা পুরস্কার মূলত ভাল ও মন্দকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা বর্জনের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হবে। অর্থাৎ ভাল বা মন্দের গ্রহণ বা বর্জনের সময় মানুষের চেষ্টা ও ইচ্ছার প্রকাশ এবং স্বেচ্ছায় দুটোর যে কোনো একটির গ্রহণ বা বর্জনই হচ্ছে তার পরকালীন জীবনের পুরস্কার বা শাস্তির মাপকাঠি

এই দ্বৈত যোগ্যতার মাধ্যমে মানব সৃষ্টি এবং আল্লাহর কর্মের উদ্দেশ্যহীনতার অস্বীকৃতিই প্রমাণ করে যে, মানুষের একটি নির্ধারিত পরিণতি আছে এবং এই পরিণতির দিকে সে তখনই অগ্রসর হবে যখন তার এই পার্থিব জীবনের যাত্রা সাংগ হবে। আর এটাই হচ্ছে পরকালের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময় ....।' (আয়াত ৪০-৪২)

এই বক্তব্য খুবই সংগত এবং পূর্বে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণ যুক্তির দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি দিন নির্ধারিত হওয়া উচিৎ যেদিন সকল প্রাণীর বিচার হবে, হেদায়াত ও গোমরাহীর ফয়সালা হবে, সৎলোকদেরকে সম্মানিত করা হবে, অসৎ লোকদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে, যেদিন মানুষ তার পার্থিব জীবনের সকল সহায় সম্বল হতে মুক্ত হবে, আত্মীয়তার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে এবং সম্পূর্ণ একা একা নিজ প্রভুর দরবারে উপস্থিত হবে। তাঁর কাছ থেকে নিজেদের কৃতকর্মের ফল লাভ করবে। তাকে কেউ সাহায্য করতে আসবে না, কেউ দয়া করতে আসবে না। তবে সে সৎকর্মশীল হলে আপন প্রভুর কাছ থেকেই দয়া লাভ করবে, যে প্রভু মহা পরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর, দয়ালু ও করুণাময়, যে প্রভুর হাতে তার জন্ম এবং সে প্রভুর হাতেই সে ফিরে এসেছে নিজের প্রাপ্য প্রতিদান গ্রহণ করতে। তাদের সৃষ্টি ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকু ছিলো কর্মের ও পরীক্ষার।

অবিশ্বাসীদের পরিণতি ও মোমেনদের সাফল্য

পরকালীন জীবন সম্পর্কিত এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত করার পর এখন পরকালীন জীবনে সৎকর্মশীল ও পাপীরা কী পাবে বা ভোগ করবে সে দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। এই দৃশ্য আলোচ্য সূরার মূল ভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, দৃশ্যটি আয়াতে এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে,

'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপিষ্ঠদের খাদ্য হবে। গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন পানি ফুটে........।' (আয়াত ৪৩-৫৭)

এখানে প্রথমেই যাক্কুম বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, এটা পাপীষ্ঠদের খাদ্য হবে। এই খাদ্যের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা লোমহর্ষক ও ভীতিকর। বর্ণনা অনুযায়ী এই খাদ্য হবে গলিত ও ফুটন্ত তামার ন্যায় যা পেটের ভেতর গিয়ে জ্বলন্ত ডেগের ভেতর তেল যেমন টগবগ করে ফুটে সেভাবেই ফুটতে থাকবে। এই খাদ্য গ্রহণ করবে সেই পাপিষ্ঠরা যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার ওপরে বড়াই করতো, তার সত্যনিষ্ঠ রসূলের ওপর বড়াই করতো। তাই আজ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলা হচ্ছে,

'একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।' (আয়াত ৪৭-৪৮)

অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠকে ভালো করে পাকড়াও করো, শক্ত করে বেঁধে ফেলো, নির্মমভাবে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে, আজ কোনো দয়া নেই, মায়া নেই, কোনো সম্মান নেই, এরপর ওর মাথায় ঢেলে দাও ফুটন্ত গরম পানি যা তার নাড়িভূঁড়ি জ্বালিয়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে। এই অসম্মান, এই শাস্তি এবং এই টানাহেঁচড়ার মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো করে বলা হচ্ছে,

'স্বাদ গ্রহণ করো, তুমিতো (দুনিয়াতে ছিলে) সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।' (আয়াত ৪৯)

এই হচ্ছে সম্মানহীন ও মর্যাদাহীন 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার। সম্মান ও মর্যাদার হকদার কেবলই আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল ও তার অনুসারীরা।

এরপর বলা হচ্ছে, 'এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে লিপ্ত ছিলে.......।' অর্থাৎ এই পরকাল সম্পর্কে তোমরা সংশয় সন্দেহে ভুগতে এবং এ নিয়ে হাসি তামাশা করতে।

একদিকে এই ধর পাকড়, টানা হেঁচড়া, দাহন পোড়ান এবং ভর্ৎসনা গঞ্জনা, অপরদিকে ভিন্নতর এক দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। এই দৃশ্যের চরিত্রে রয়েছে সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু লোকজন। এরা তারা, যারা পরকালকে বিশ্বাস করতো এবং ভয় করতো। আজ তারা 'নিরাপদ স্থানে' রয়েছে। এখানে ভয় নেই, ভীতি নেই, টানা হেঁচড়া নেই, ধর পাকড় নেই এবং নেই দাহন ও পোড়ন। এখানে তারা অত্যন্ত আরামে আয়েশে আছে। উদ্যানের মাঝে হুর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। তারা চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র পরিধান করেছে। মুখোমুখি বসে আলাপচারিতায় মগ্ন। সুনয়না হুররা তাদের সংগী হিসেবে তাদের পাশেই রয়েছে। তারা জান্নাতে বড় বড় অট্টালিকার মালিক। হুকুম করলেই যা চায় তা পাচ্ছে। সেখানে নিরাপদে বিভিন্ন ফলমূল ভক্ষণ করবে। তাদের এসব নেয়ামত কখনও শেষ হবে না। তাদের কোনো মৃত্যুও হবে না। তাদের প্রথম মৃত্যুই শেষ মৃত্যু। এরপর আর কোনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। (এই বক্তব্য মোশরেকদের সেই বক্তব্যের বিপরীতে এসেছে যে বক্তব্যের ভাষা ছিলো এই 'আমাদের মৃত্যু একবারই হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না..........।' নিশ্চয়ই মৃত্যু মানুষের জীবনে একবারই আসে। কিন্তু এই মৃত্যুর পর জান্নাত-জাহান্নামও আছে) আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে জাহান্নামের আযাব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তাই এটাকে মহা সাফল্য বলা হয়েছে।

এই পরস্পর ভিন্নমূখী দুটো ভয়াল ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যের পর আলোচ্য সূরার সমাপ্তি ঘটছে রেসালাত ভিত্তিক নেয়ামতের স্মরণ এবং এর অস্বীকৃতির পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে। বলা হচ্ছে,

'আমি তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। অতএব তুমি অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষা করছে।' (আয়াত ৫৮-৫৯)

এই উপসংহারে আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্যটির সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। সূরার সূচনা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। সূরার সূচনা হয়েছিলো কেতাবের অবতরণ, সতর্কীকরণ ও স্মরণের মধ্য দিয়ে, পরবর্তী গভীর পর্যায়ে অবিশ্বাসীদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই' আর উপসংহারে আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে রসূলের মাতৃভাষায় সহজ ও বোধগম্য করে এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে বলে জানানো হচ্ছে। এটাকে নেয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এর ফলে মানুষ কোরআনকে বুঝতে পারে, এর মর্ম অনুধাবন করতে পারে। এরই সাথে সাথে তাদেরকে পরোক্ষভাবে শেষ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'তুমি অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষা করছে।'

সূরা আল জাসিয়া

আয়াত ৩৭ রুকু ৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ
لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ ۝٥ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ
اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى
عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. হা-মীম, ২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ। ৩. নিসন্দেহে আকাশমালা ও যমীনে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানার অগণিত) নিদর্শন রয়েছে; ৪. (নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং) তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং জীবজন্তুর (বংশ বিস্তারের) মাঝেও, যাদের তিনি যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন, এর সর্বত্রই (তাঁর কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাস করে। ৫. (একইভাবে নিদর্শন রয়েছে) রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে, যে রেযেক (বিভিন্নভাবে) আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পাঠান, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলেন (তার মাঝেও! এ) বায়ুর পরিবর্তনেও (তাঁর কুদরতের বহু) নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা (গবেষণা) করে। ৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি, অতপর (তুমি কি বলতে পারো) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর এ নিদর্শনের পর আর কিসের ওপর তারা ঈমান আনবে? ৭. দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্যে, ৮. আল্লাহ তায়ালার আয়াত যখন তার ওপর তেলাওয়াত করা হয় তখন সে (তা) শোনে, (কিন্তু) একটু পরেই সে অহংকারী হয়ে এমনভাবে জেদ ধরে যেন সে তা শুনতেই পায়নি, সুতরাং (যে এমন ধরণের আচরণ করে) তুমি তাকে এক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও!

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾
مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ
لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا
لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۢبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে একে পরিহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে; এমন ধরনের লোকদের জন্যে অপমানজনক আযাব রয়েছে; ১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেসব জিনিস যা তারা (দুনিয়া থেকে) কামাই করে এনেছে (আজ তা) তাদের কোনো কাজেই এলো না, না সেসব (মাবুদ তাদের কোনো কাজে এলো)– যাদের তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (নিজেদের) অভিভাবক বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সবার জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠোর শাস্তি; ১১. এ (কোরআন) হচ্ছে (সম্পূর্ণত) হেদায়াত, (তা সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে অতিশয় নিকৃষ্ট ও কঠোরতর আযাব রয়েছে।

রুকু ২

১২. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমূহে তাতে চলতে পারো, এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রেযেক) সন্ধান করতে পারো এবং শোকর আদায় করতে পারো, ১৩. (একইভাবে) তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে। ১৪. (হে নবী,) ঈমানদারদের তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার (অমোঘ বিচারের) দিনগুলো থেকে কিছু আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা এ (বিশেষ) দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে (পরকালে) পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ

الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا

اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ

مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾ اِنَّهُمْ لَنْ

يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾ هٰذَا بَصَاۤئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ

يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ

১৫. (তোমাদের মাঝে) যদি কেউ কোনো নেক কাজ করে, তা (কিন্তু) সে তার নিজের ভালোর জন্যেই (করে, আবার) যে কেউই কোনো মন্দ কাজ করে, (তার প্রতিফল) (কিন্তু) অতপর তার ওপরই (পড়বে, পরিশেষে) তোমাদের সবাইকে স্বীয় মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। ১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও নবুওত দান করেছিলাম, আমি তাদের উৎকৃষ্ট রেযেক দিয়েছিলাম, (উপরন্তু) আমি (এসব কিছুর মাধ্যমে) তাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছিলাম, ১৭. দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা (কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং তা) ছিলো তাদের পারস্পরিক জেদের কারণে; (হে নবী,) কেয়ামতের দিন তোমার মালিক তাদের মধ্যে সে সমস্ত (বিষয়ের) ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করেছে। ১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না। ১৯. আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না; যালেমরা অবশ্যই একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেযগার লোকদের (আসল) বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)। ২০. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্যে তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ। ২১. যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে, আমি তাদের সে লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢبِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ

عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۚ فَمَنْ

يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করেছে, তাদের জীবন ও তাদের মরণ কি (ঈমান গ্রহণকারীদের মতো) একই ধরনের হবে? কতো নিম্নমানের ধারণা পোষণ করছে এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)!

রুকু ৩

২২. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে (এ দু'য়ের মাঝে বসবাসরত) প্রতিটি বাসিন্দাদের তার কর্মের ঠিক ঠিক বিনিময় দেয়া যেতে পারে, (কেয়ামতের দিন) তাদের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। ২৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিটির প্রতি লক্ষ্য করেছো– যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন, তার চোখে তিনি পর্দা এঁটে দিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার পর কে পথনির্দেশ দেবে? তারপরও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই মক্কী সূরাটা ইসলামী আন্দোলনের সাথে মোশরেকদের আচরণ, ইসলামী দাওয়াতের যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর মোকাবেলায় তাদের কর্মপন্থা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা এবং প্রবৃত্তির সর্বাত্মক অনুকরণে তাদের সংকোচহীনতা ও লজ্জাহীনতার একটা দিক তুলে ধরেছে। সেই সাথে এটাও তুলে ধরেছে যে, কোরআন কিভাবে তাদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমিতে পরিপূর্ণ মনের চিকিৎসা করে। কোরআন তাদের এসব জটিল ব্যাধিকে তার গভীর প্রভাবশালী, সুতীক্ষ্ম আয়াতগুলোর সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলে, তাদেরকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদানের বিবরণ দেয় এবং তাঁর নিয়ম নীতি ও বিশ্বজগতে কার্যকর তার প্রাকৃতিক বিধান তাকে অবহিত করে।

যারা মক্কায় বসে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো এই সূরার আয়াতগুলোতে তাদের বিবরণ পড়তে গিয়ে আমরা তাদের মধ্য থেকে এমন একটা গোষ্ঠীকে দেখতে পাই, যারা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকতে বদ্ধপরিকর, যারা সত্যের বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসী ও হঠকারী মানসিকতায় আক্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীর প্রতি চরম বেয়াদব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত এবং তার মোকাবেলায় তারা এমন কর্মকান্ডের আশ্রয় নেয়, যা তাদেরকে কঠিন আযাবের

হুমকির যোগ্য বানায়। ৭ থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

আরো একটা মানবগোষ্ঠীর পরিচয় পাই, যারা খুব সম্ভবত আহলে কেতাবের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধ্যান ধারণা ও কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। নির্ভেজাল ঈমানদার ও সৎ মানুষের কোনো মূল্যই তাদের কাছে নেই। তারা নিজেরা অত্যন্ত অসৎ কর্মশীল হওয়ায় তাদের সাথে সৎ কর্মশীল মোমেনদের মৌলিক পার্থক্য কী, তা তারা অনুধাবন করে না। কোরআন তাদের জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর মানদন্ডে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এ কারণে তাদের কূচিন্তা ও কূসিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে এবং সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহর মানদন্ডে ন্যায়বিচারই যে সৃষ্টির মূল ভিত্তি সে কথা জানিয়ে দিয়েছে। (আয়াত ২১-২২)

আরো একটা মানবগোষ্ঠী আমরা দেখতে পাই, যাদের একমাত্র মনিব হলো তাদের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে তারা উপাস্য মেনে বসে আছে এবং এর নির্দেশ শীরোধার্য করে চোখ বুঁজে তারা তার আনুগত্য করে। এ গোষ্ঠীটার পরিচয় দেয়া হয়েছে ২৩ নং আয়াতে। এই গোষ্ঠী আখেরাতকে অস্বীকার করে, পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশকে অবিশ্বাস করে এবং তার জন্যে এমন প্রমাণ চায় যা এই পৃথিবীতে দেয়ার কোনো উপায় নেই। কোরআন এই গোষ্ঠীকে আখেরাতের সত্যতার যেসব অখন্ডনীয় যুক্তি প্রমাণ রয়েছে, তার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানায়। অথচ তারা এ আহ্বানকে উপেক্ষা করে। (আয়াত ২৪-২৬)

এই সব কটা গোষ্ঠীকে একই গোষ্ঠীরূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার মক্কায় যারা ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা করতো, তারা একাধিক গোষ্ঠীও হতে পারে। এদের মধ্যে একশ্রেণীর আহলে কেতাবও ছিলো, যাদের সংখ্যা মক্কায় খুবই কম ছিলো। এমনও হতে পারে যে, মক্কাবাসীর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এই গোষ্ঠীটার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তারা মক্কায় বাস করতো না এবং বাস করা জরুরীও নয়।

যাই হোক, কোরআন এই শ্রেণীর মানুষগুলোর এসব অসদগুণ ও অসৎ কর্মের কঠোর সমালোচনা করেছে, এই সূরায় তাদের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছে, প্রকৃতিতে ও তাদের সত্ত্বায় বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তাদের মোকাবেলা করেছে, কেয়ামতের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে অতীতে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাহায্যে অতি সহজেই এসব সামগ্রী খুঁজে পাওয়া যায়। (আয়াত ৩ -৬)

আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (১২ ও ১৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা ও পরিণতির উল্লেখ করেও তাদের মোকাবেলা করা হয়েছে। (আয়াত ২৭-৩৬)

অনুরূপভাবে ১৫ নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ইসলামের কঠোর কর্মফল নীতি ও জবাবদিহিতার নীতি। যারা অন্যায় ও অসৎ কর্মে নিমজ্জিত থেকেও মনে করে যে, তারা আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীলদের মতোই বিবেচিত হবে, তাদের জবাব দেয়া হয়েছে ২১ ও ২২ নং আয়াতে।

যদিও সমগ্র সূরা তার বিষয়বস্তুর বিচারে একটা একক ও অখন্ড সূরা, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে একে আমরা দুটো পর্বে ভাগ করেছি,

হা-মীম এই দুটো বর্ণ দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 'মহা পরাক্রমশালী মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কেতাব।' আর সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা। তার সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উল্লেখ, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে। আর এসব ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতগুলো

সম্পর্কে উদাসীন, অহংকারী ও বিদ্রূপকারী তাদের মোকাবেলায়। 'অতএব আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা .... ' (আয়াত ৩৬ ও ৩৭)

সূরাটা তার বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় পেশ করে। এদিক দিয়ে এ সূরা সূরা দোখানের বিপরীত। কেননা সূরা দোখানে মানুষের হৃদয়ের ওপর হাতুড়ি পেটানো হয়েছে। হৃদয়ের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। কোরআন নাযিলকারীও আল্লাহ তায়ালা। পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে তিনি কখনো হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আঘাত করেন, কখনো মৃদু মৃদু ও কোমল পরশ বুলান। কখনো শান্ত ও বিনম্র ভাষায় কথা বলেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, গভীর তত্ত্বজ্ঞানী, মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। এবার বিশদ তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

তাফসীর

আয়াত ১-২৩

প্রথমে দুটো অক্ষর হা-মীম এর উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন নাযিল হবার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কেতাবের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং কেউ নয়। যেমন বিচ্ছিন্ন যে সব বর্ণমালা কতিপয় সূরার শুরুতে রয়েছে, তার সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, এই কোরআন এই সব অক্ষর দিয়ে লেখা। অথচ এই মোশরেকেরা এ সব অক্ষর ব্যবহার করে কিছুই লিখতে পারলো না। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ কেতাব সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি এতো শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী যে তাকে কেউ পরাভূত করতে পারে না। তিনি এমন বিজ্ঞ ও কুশলী (হাকীম) যে, প্রতিটা জিনিস পরিমাণ মতো সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটা কাজ সুকৌশলে সম্পন্ন করেন। এ মন্তব্যটা সূরার সার্বিক পরিবেশ ও মানবীয় মন মানসিকতার বিভিন্নতার সাথে সংগতিপূর্ণ ও মানানসই।

মানুষ ও পশুপাখী সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর নিদর্শন

এই কেতাবের প্রতি মোশরেকদের আচরণ ও ভূমিকা আলোচনা করার আগে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু এই সব নিদর্শনই তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। তাই এগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তা তাদের মনকে জাগ্রত ও সচেতন করে এবং তাতে এই কেতাব নাযিলকারী ও বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অনুভূতিকে তীব্রতর করা হয়েছে।

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'

আকাশ ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী অগণিত। মানুষ শুধু চোখ মেলে তাকালেই এই বিস্ময়কর জগতে তার নিদর্শনাবলীকে দেখতে পায়।

এমন কোন জিনিসটা দেখানো যাবে, যা নিদর্শন নয়? এই বিশাল মহাকাশে কতো বড় বড় জ্যোতিষ্কমন্ডলী, কতো গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়াপথ ইত্যাদি রয়েছে। এগুলো বিশালাকায় হওয়া সত্তেও মহাশূন্যে এক একটা ক্ষুদ্র ইঁদুরের মতো দেখা যায়। আর ভয়ংকর বিশাল ও সুন্দর মহাশূন্য যে কত বড়, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।

এই সব বিশাল বিশাল জ্যোতিষ্কের নিজ নিজ কক্ষপথে সুশৃংখলভাবে ও অব্যাহতভাবে কোটি কোটি বছর ধরে ভ্রমণ করতে থাকা এতো বিস্ময়কর যে, ভেবেই কূল কিনারা করা যায় না। এগুলোর মধ্যে এমন নিখুঁত সমন্বয় ও শৃংখলা বিরাজ করে, যা দেখে চোখের স্বাদ মিটতে চায় না এবং মনের চাহিদাও পূরণ হতে চায় না।

এই পৃথিবী এরই মধ্যে বসবাসকারী একটা মহিষের তুলনায় অত্যন্ত বড় ও বিশাল। অথচ এই বিশাল মহাশূন্য ও গ্রহ নক্ষত্রের তুলনায় তা একটা ধূলিকণা বা একটা অণুর মতো।

আর এই পৃথিবীর বিশেষ মহাজাগতিক অবস্থানে এর প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা জীবন ধারণের ও জীবনের অস্তিত্বের বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রেখেছেন এবং অসংখ্য সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এখানে লুকিয়ে রেখেছেন। এ সব বৈশিষ্ট্যের একটাও যদি অনুপস্থিত থাকতো বা ত্রুটিপূর্ণ হতো, তাহলে এতে জীবনের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব সম্ভব হতো না।(১)

এই পৃথিবীতে বিদ্যমান বা বিচরণশীল প্রতিটা বস্তু ও প্রাণী, তাদের প্রতিটা অংশ ছোট, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবস্তু থেকে নিয়ে বিশাল ও প্রকান্ড বস্তু বা প্রাণী, বিশাল বা ক্ষুদ্র গাছের ছোটো একটা পাতা, মানুষ বা প্রাণীর দেহের এক একটা চুল বা লোম এবং পাখির ডানার প্রতিটা পালক এক একটা নিদর্শন। প্রত্যেকটা বস্তু তার আকৃতিতে, বর্ণে, দেহের ত্বকের কোমলতায়, প্রত্যেকটা বস্তুর গঠনে, কাজে, উপযোগিতায় ও উপকারিতা অপকারিতায়, তার সমন্বয়ে ও গঠনে একটা স্বতন্ত্র নিদর্শন। আকাশ বা পৃথিবীর যেদিকেই মানুষ চোখ মেলে তাকাবে সেদিকেই সে অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। নিদর্শনগুলো নিজের অস্তিত্বকে মানুষের মন, চোখ ও কানের সামনে প্রকাশ করবেই। তবে কার জন্যে করবে, কে এগুলোকে দেখবে ও অনুধাবন করবে?

'ঈমানদার লোকদের জন্যে।'

ঈমানদার লোকেরা দেখবে ও অনুধাবন করবে। কেননা ঈমানই মানুষের মনকে উন্মুক্ত করে। শব্দ, আলো ও জীবনী শক্তি গ্রহণ করে। আকাশ ও পৃথিবীতে যে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, সেই অনুভূতি ও ঈমান থেকেই জন্মে। ঈমানই হৃদয়কে উজ্জীবিত, বিনয়ী, বিনম্র ও কোমল করে এবং মহাবিশ্বের যেখানে যতো গোপন ও প্রকাশ্য শিক্ষা রয়েছে, তা গ্রহণের উপলব্ধি করার যোগ্যতা দান করে। এসব গোপন ও প্রকাশ্য শিক্ষা আল্লাহর সৃজনী হাতের কুশলী তৎপরতা ও তার সৃষ্টি করা প্রতিটা বস্তু প্রাণীর ওপর তাঁর নৈপুণ্যের ছাপ দেখিয়ে দেয়। এই কুশলী হাত থেকে যা কিছুই নির্মিত হয়, তা অপূর্ব ও অলৌকিক এবং এবং আল্লাহর কোনো সৃষ্টির পক্ষে তা নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

পরবর্তী আয়াত মানুষের মনোযোগকে প্রকৃতির বহিরাঙ্গন থেকে তার অভ্যন্তর ভাগের নিদর্শনাবলীর দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই অংগনটা তার সবচেয়ে কাছে অবস্থিত এবং এর প্রতি সে অধিকতর সংবেদনশীল।

'আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জীব জন্তুতে বিশ্বাসীদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এমন বিস্ময়কর শারীরিক ও মানসিক কাঠামো, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও রকমারি আংগিক কর্মক্ষমতার সমন্বয়ে তৈরী করেছেন যে, তা রীতিমত একটা অলৌকিক ব্যাপার। দীর্ঘদিন যাবত অব্যাহতভাবে নিকট থেকে বারবার দেখার কারণে এর অলৌকিকত্বকে আমরা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এই মানুষের অংগ-প্রত্যংগগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটা অংগের গঠন ও বিন্যাসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিস্ময়ে মাথা ঘুরে যাবে।

জীবন যতো ক্ষুদ্র ও সহজ সরল রকমেরই হোক না কেন তা অলৌকিক। এমনকি যে প্রাণী মাত্র একটা কোষের দ্বারা তৈরী সেও অলৌকিক। মানুষের তো কথাই আলাদা। কেননা তার দেহ ও মনের গঠন প্রণালী অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য। তার আংগিক গঠন প্রণালীর চেয়ে মানসিক গঠন প্রণালী অধিকতর জটিল ও দুর্বোধ্য।

---

(১) সূরা ফোরকান, আয়াত ২।

আর তার চারপাশে রয়েছে অজস্র জাতির, আকৃতি ও প্রকৃতির জীবজন্তু, যার সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। ছোটো বড়ো নির্বিশেষে প্রত্যেকটা প্রাণী তার গঠন প্রণালী, শারীরিক কাঠামো, চাল-চলন, পৃথিবীতে তার অনুপাত-সব কিছুর দিক দিয়েই অলৌকিক ও বিস্ময়কর। এই অনুপাত এমন সূক্ষ্মভাবে সরংক্ষণ করা হচ্ছে যে, এগুলোর কোনো কোনো বিশেষ প্রাণীর প্রজনন যে পরিমাণে ও সংখ্যায় হলে তার অস্তিত্ব ও প্রজাতি রক্ষা পাবে এবং সে অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীগুলোর ওপর আগ্রাসন চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে না, ঠিক সেই পরিমাণেই তার প্রজনন ও উৎপাদন হতে পারবে। তার কমও নয়, বেশীও নয়। এই সকল প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সুপরিকল্পিত উপায়ে সম্পাদন করেছেন এবং তাদের মধ্যে প্রয়োজন অনুপাতে যোগ্যতা ও গুণাবলী বন্টন করেছেন, যা তাদের সকলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

শকুন হিংস্র, আগ্রাসী ও ক্ষতিকর প্রাণী এবং তার আয়ুস্কালও দীর্ঘ। কিন্তু অপরপক্ষে তা চড়ুই, শালিক ইত্যাদির তুলনায় খুবই কম। শকুনের বংশ যদি চড়ুই ইত্যাদির হারে বাড়তো, তাহলে কী অবস্থা হতো এবং কিভাবে তা অন্যান্য পাখীগুলোকে ধ্বংস করতো, তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি।

পশুর জগতে সিংহ ও বাঘ আগ্রাসী, হিংস্র ও মাংসাসী। এই প্রাণীটা যদি হরিন বা ছাগলের হারে বৃদ্ধি পেতো তাহলে কেমন অবস্থা দাঁড়াতো? জংগলে কোনো প্রাণীকে আর সে বাঁচতে দিতো না। কিন্তু মহান আল্লাহ এর বংশবৃদ্ধি প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সীমিত রেখেছেন। পক্ষান্তরে ছাগল, হরিণ প্রভৃতি গোশতসমৃদ্ধ প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি ব্যাপক এবং এর কারণ আমাদের অজানা নয়।

একটা মাছি প্রতিবার লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে। অন্য দিকে তা দু সপ্তাহের বেশী বাঁচে না। এর ওপর থেকে যদি নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয়া হতো এবং মাছি যদি মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর বাঁচতো। তাহলে মাছি আমাদের শরীর আচ্ছন্ন করে ফেলতো। কিন্তু মহান আল্লাহর কুশলী হাত সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও পরিবেশের নিরীখে সূক্ষ্ম পরিকল্পনার আলোকে সব কিছুকে সীমার মধ্যে রাখছে ও ভারসাম্য বজায় রাখছে।

এভাবেই নিয়ম চলছে প্রতিটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে। মানুষ, পশু এবং সব কিছুর পরিকল্পিতভাবে বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। এ সব কিছুর মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু কার জন্যে এ নিদর্শন? সেই 'বিশ্বাসীদের জন্যে', যারা এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে, এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও উপলব্ধি করে।

'ইয়াকীন' বা বিশ্বাস হচ্ছে মনের এমন একটা অবস্থার নাম। যার উপস্থিতি মনকে অনুভূতিশীল করে, সচেতন করে, তাকে অনুগত ও প্রভাবিত করে। বিশ্বাস মনকে প্রশান্ত, ধীরস্থির ও পরিতৃপ্ত করে। প্রকৃতির যাবতীয় তথ্যকে সে ঠান্ডা মাথায়, সহজ-সরলভাবে, আস্থার সাথে, নিরুদ্বেগ ও নিরুত্তাভাবে গ্রহণ ও বিবেচনা করে। ফলে ন্যূনতম তথ্য থেকে সে বড় বড় ফল লাভ করে ও জগতে বড় বড় কীর্তি সম্পাদন করে।

আল্লাহর নিদর্শন উপেক্ষা করার পরিণতি

দেহ মনের আভ্যন্তরীণ জগত ও পারিপার্শিক প্রাণীজগত পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী আয়াতে প্রাকৃতিক জগতের বৈশিষ্টসমূহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সকল প্রাণীর জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ৫)

দিন রাতের পালাক্রমিক আবর্তন বারবার হওয়ার কারণে এর নতুনত্ব প্রাচীন ও বাসি হয়ে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু প্রথমবার দিন বা রাতকে অবলোকন করলে কোন্ বিস্ময়কর জিনিসটা

মানুষের চেতনাকে আলোড়িত করে? প্রকৃত সচেতন মন দিনরাতের আবর্তনের এই বিস্ময়কে যতোবারই অবলোকন করুক, সব সময়ই তা তার অনুভূতিকে চাংগা করে এবং প্রতিবারই সে মহান আল্লাহর হাতকে বিশ্বজগত পরিচালনারত দেখতে পায়।

মানুষের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত কোনো কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটছে। মানুষ এখন জেনেছে যে, দিন ও রাত সূর্যের সামনে প্রতি ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর নিজের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করায় অর্থাৎ তার আহ্নিক গতির ফল। কিন্তু এই তথ্য জানার কারণে প্রকৃতির এই বিস্ময় কিছুমাত্র ম্লান হয় না। কারণ পৃথিবীর এই আবর্তনটাও তো আর এক বিস্ময়। এই গ্রহটা যে এমন নিয়মিতভাবে একই গতিতে নিজেরই চারপাশে ঘুরছে এবং মহাশূন্যে বাতাসের ওপর ভর করে সাতার কাটা অবস্থায় এভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনো বস্তুর ওপর তাকে ভর করতে হচ্ছে না, আর ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় তার পিঠের ওপর যাবতীয় বস্তু ও প্রাণী বহাল তবিয়তে টিকে থাকতে পারছে- এটাও তো এক মহাবিস্ময়! মহাশূন্যে কেবল সেই মহাশক্তির ওপর নির্ভর করে সে এই তৎপরতা চালাতে পারছে, যিনি তাকে সামাল দিয়ে রেখেছেন এবং এই মহাজাগতিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট ছকে যেভাবে চাইছেন সেভাবেই তাকে ঘোরাচ্ছেন।

মানুষের জ্ঞান যতোই বাড়ছে, ততোই তারা পৃথিবীর জীবন ও জীবজগতের ওপর দিন রাতের আবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে। তারা জানতে পারছে যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের ওপর সময়কে রাত ও দিনের বর্তমান অনুপাতে বিভক্ত করা জীবনের অস্তিত্ব ও জীব জগতের স্থায়িত্বের প্রধান সহায়ক উপাদান। এই দুটো জিনিস অর্থাৎ দিন ও রাতকে যদি ঠিক এইভাবেই তৈরী না করা হতো এবং এই বিধি ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালনা করা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে সব কিছুই ওলট-পালট ও বিশৃংখল হয়ে যেতো। বিশেষত সেই বিশেষ স্টাইলের মানব জীবন, যা আরবদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যে মানুষের চেতনা ও অনুভূতিতে দিন ও রাতের গুরুত্ব কখনো কমে না, বরং বাড়ে।

'আর যে জীবিকা আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে নাযিল করেছেন, অতপর তা দিয়ে-মৃত মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।'

'রেযক' বা জীবিকা শব্দটা দ্বারা কখনো কখনো বৃষ্টিও বুঝানো হয়। প্রাচীন তাফসীরকাররা এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে 'আকাশের জীবিকা' জিনিসটা আরো ব্যাপক অর্থবোধক। আকাশ থেকে যে সূর্য রশ্মী বা রৌদ্র নামে, মৃত মাটিকে সজীব তথা উর্বর বানানোতে এর অবদান পানির চেয়ে কম নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছায় এই সূর্যরশ্মী থেকেই পানি উৎপন্ন হয়। সূর্য রশ্মীই সমুদ্র থেকে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে। তারপর সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়। বৃষ্টি নামায়, নদ নদী, খাল বিল পানিতে ভরে দেয় এবং তা দিয়ে মাটিকে চাষযোগ্য ও উর্বর বানায়। সুতরাং পানি, তাপ ও কিরণ এই তিনটের সাহায্যে ভূমি উর্বরা শক্তি পায়। 'এবং বাতাস চালনা করে ....।'

উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব পশ্চিমে, এঁকে বেঁকে, সোজা হয়ে, কখনো ঠান্ডা হয়ে, কখনো গরম হয়ে বায়ু চালিত হয়। বিশ্ব প্রকৃতির পরিকল্পিত পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে কিছুই আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে ঘটে না। পৃথিবীর আবর্তনের সাথে বায়ু পরিচালনার সম্পর্ক রয়েছে, সেটা সুবিদিত। দিন রাতের আবর্তন ও আকাশ থেকে আগত জীবিকার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। এসব কিছুই মহাবিশ্বে আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতোই করেন। এতে বহু নিদর্শন তথা শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা কাদের জন্যে?

'যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্যে।'

বস্তুত এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও বিবেকের অনেক করণীয় রয়েছে এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এ হচ্ছে কতিপয় প্রাকৃতিক নিদর্শন। সেই ঈমানদার লোকদের জন্যে এ সব তাৎপর্যময় নিদর্শন, যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বুদ্ধিমান বিবেকবান। কোরআনের আয়াত দ্বারা এই সব প্রাকৃতিক নিদর্শনের সন্ধান দেয়া হচ্ছে। এতে করে মোমেনের হৃদয় উদ্দীপিত হবে। তার বিবেক জাগ্রত হবে এবং তার স্বভাব প্রকৃতিকে তার নিজ ভাষাতেই সম্বোধন করা হবে। কেননা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে প্রাকৃতিক জগতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলতে কোরআনের আয়াত সবচেয়ে কার্যকর উপকরণ। যে ব্যক্তি কোরআনের আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, সে অন্য কোনো উপায়ে ঈমান আনবে, তা আশা করা যায় না। কোরআনের এই সব আয়াত যাকে জাগাতে পারে না, তাকে অন্য কোনো জিনিস দ্বারা জাগানো সম্ভব নয়। (আয়াত ৬)

কেননা দুনিয়ার কোনো কথাই যেমন কোরআনের কথার মতো হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না, তেমনি প্রকৃতিতে আল্লাহর যে সৃষ্টি কুশলতার সাক্ষর রয়েছে, তাও আর কেউ দেখাতে পারেনি। আর আল্লাহর দেয়া তথ্যের মতো সুস্পষ্ট, অকাট্য, অখন্ডনীয় প্রামাণ্য ও নির্ভুল আর কোন তথ্য হতে পারে না। 'সুতরাং তারা আল্লাহর পর ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

এ পর্যায়ে যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, সে শাস্তির হুমকি ও শাসানি ছাড়া আর কিছুর যোগ্য নয়। (আয়াত ৭-১০)

সূরার ভূমিকায় বলে এসেছি যে, এই আয়াতগুলোতে মক্কার ইসলামী দাওয়াতের প্রতি মোশরেকদের আচরণ, বাতিলের ওপর তাদের জিদ ও গোয়ার্তুমি, অখন্ডনীয়ভাবে সত্য প্রমাণিত তাওহীদের বাণীকে অযৌক্তিকভাবে ও হঠকারিতার সাথে প্রত্যাখ্যান, এই সত্যের বিরুদ্ধে তাদের অনড় অবস্থান, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীর সাথে বেয়াদবী ও অসম্মান প্রদর্শন এবং এই সব আচরণের মোকাবেলায় তাদের প্রতি কোরআনের পক্ষ থেকে হুমকি প্রদর্শন ও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

'প্রত্যেক মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী পাপিষ্টের জন্যে সর্বনাশ।'

'ওয়ল' অর্থ ধ্বংস ও সর্বনাশ। 'আফফাক' অর্থ সীমাহীন মিথ্যাবাদী। আর 'আসীম' অর্থাৎ অতিশয় পাপাচারী। সর্বনাশের হুমকি স্বয়ং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি ধ্বংস ও সর্বনাশ ঘটাতে সক্ষম, যিনি সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদ উভয়টাতেই সত্যবাদী। সুতরাং তার এ হুমকি যথার্থই আতংক সৃষ্টিকারী।

এই মিথ্যাবাদী পাপিষ্টের চিহ্ন হলো, সে অন্যায় ও অসত্যের ওপর অনড় থাকে ও জিদ ধরে, সত্যের বিরুদ্ধে অহংকার প্রদর্শন করে, আল্লাহর কেতাবের প্রতি আনুগত্য দেখায় না এবং আল্লাহর সাথে যথোচিত আদব প্রদর্শন করে না।

এই ঘৃণ্য অবস্থাটা যদিও মক্কার এক শ্রেণীর মোশরেকদের মধ্যে দেখা যেতো। কিন্তু আসলে প্রত্যেক জাহেলিয়াতেই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। বর্তমানেও ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। আজকের দুনিয়ায় স্বয়ং মুসলমান নামধারীদের মধ্যেও এমন বহু লোক রয়েছে, যে আল্লাহর আয়াতগুলো শুনতে পায়, কিন্তু অহংকারের সাথে না শোনার ভান করে চলে যায়। কেননা সেটা তার মনের কামনা বাসনার বিপরীত, তার আদত-অভ্যাসের পরিপন্থী, তাকে তার বাতিল নীতিতে টিকে থাকতে সাহায্য করে না, তার অন্যায় অপকর্মকে সমর্থন করে না এবং তার অসৎ মনস্কামনা পূর্ণ করে না।

'অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'

সুসংবাদ ভালো জিনিসের জন্যে হয়ে থাকে। এখানে বিদ্রুপের ভংগীতে কথাটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে যখন সতর্কবাণী শুনছে না, তখন তার কাংখিত সর্বনাশ এসে যাওয়াই উচিত। ওটাই তার জন্যে শুভ সংবাদ। এভাবে আরো তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হলো।

'আর যখন সে আমার কিছু আয়াত জানতে পারে, তখন তা নিয়ে ব্যংগ বিদ্রূপ শুরু করে দেয়।'

অথচ সে জানে এই আয়াত কার এবং কোথা থেকে এসেছে। এটা অধিকতর মারাত্মক ও কলংকজনক। আর এ আচরণটাও প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধরনের জাহেলিয়াতে পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বরং মুসলমান নামধারীদেরও অনেকে জেনে-শুনে আল্লাহর বাণীকে উপহাস করে থাকে এবং তাকে ও তার ভক্তদেরকে উপহাসের পাত্র বানায়। বিশেষত যারা চায় যে, আল্লাহর বাণীই পুনরায় জনগণের জীবনে বাস্তবায়িত হোক।

'তাদের জন্যে অপমানজনক আযাব।'

বস্তুত অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরই প্রাপ্য, যারা জেনে শুনে আল্লাহর বাণীকে উপহাস করে তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও বেয়াদবী করে। এ আযাব খুবই নিকটে প্রস্তুত রয়েছে, যদিও তার কার্যকর হওয়ার সময় কিছু পরে আসবে। প্রকৃতপক্ষে এ আযাব প্রস্তুত রয়েছে।

'তাদের আড়ালেই রয়েছে জাহান্নাম।'

এখানে তাদের আড়ালেই কথাটা তাৎপর্যবহ। অর্থাৎ এই আযাব তাদের আড়ালে রয়েছে বলে তারা দেখতে পায় না। আর এর প্রতি উদাসীন রয়েছে বলে তারা তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে না এবং এ আযাব থেকে কিছুতেই উদ্ধার পাবে না।

'তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তা তাদের কাজে আসবে না, যে সব জিনিসকে তারা আল্লাহর বিকল্প অভিভাবক মনে করেছে, তাও কোনো উপকারে আসবে না।'

অর্থাৎ তাদের করা কোনো কাজ এবং উপার্জিত কোনো সম্পদ তাদের কাজে লাগবে না। এমনকি তারা কোনো ভালো কাজ করলেও তা ধূলোর মতো উড়ে যাবে, ধরে রাখতে পারবে না। কেননা তার ভিত্তি ঈমানের ওপর ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যাদেরকে তারা অভিভাবক দেবদেবী, উপাস্য, সাহায্যকারী, বন্ধু-হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা তাকে সাহায্য করতেও পারবে না, সুপারিশও করতে পারবে না।

'তাদের জন্যে মস্ত বড় আযাব রয়েছে।'

অর্থাৎ সে আযাব শুধু অপমানজনকই নয়, বরং বিরাটও। কেননা আল্লাহর কালামের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তারা যে অপরাধ করেছে, তা এতো জঘন্য যে, সে জন্যে অপমানজনক শাস্তিও তাদের প্রাপ্য, আবার এই অপরাধ এতো বড় যে, তার শাস্তিটাও বড় হওয়া উচিত।

এ আয়াতে যেহেতু আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপের উল্লেখ রয়েছে এবং তা থেকে মানুষকে ফেরানো ও তার বিরুদ্ধে অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শনের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাই পরবর্তী আয়াতে এই আয়াতের প্রকৃত পরিচয় ও তাকে প্রত্যাখ্যানের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

'এ হচ্ছে হেদায়াতের উৎস। আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতের সাথে কুফরী করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক নোংরা শাস্তি।'

কোরআনের পরিচয় এটাই যে, তা হেদায়াতের উৎস। নির্ভুল ও নির্ভেজাল হেদায়াতের পথ। এর সাথে গোমরাহীর কোনো মিশ্রণ নেই। যে কোরআনের পরিচয় এই, তার আয়াতগুলোকে

অস্বীকার করার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক না হয়ে পারে না। 'রেজ্স্' হচ্ছে কঠিন শাস্তি। এই কঠিন শাস্তির হুমকি তাদের দেয়া হচ্ছে। এভাবে একই হুমকি বিভিন্ন ভাষায় পুনরাবৃত্তি করে হুমকিকে কঠোরতর রূপ দেয়া হয়েছে, যা নির্ভেজাল হেদায়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীর জন্যে খুবই উপযুক্ত।

সৃষ্টিজগতের সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত

প্রচন্ড আযাবের হুমকি দেয়ার পর পুনরায় কোমল ভাষা প্রয়োগ করে আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১২ ও ১৩)

মানুষ একটা ক্ষুদ্র সৃষ্টি হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে অনুগ্রহ লাভ করেছে। তিনি তাঁর বহু বড় বড় সৃষ্টিকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। সেগুলো দ্বারা সে নানাভাবে উপকৃত হয়। এ দ্বারা সে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের কিছুটা রহস্যের সন্ধান পায়। এই সমস্ত সৃষ্টি সেই বিধি অনুসারে চলে এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করে না। এই রহস্যের সন্ধান না পেলে মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রকৃতির কোন জিনিস দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। এমনকি ক্ষুদ্র মানুষ এই বিশাল প্রকৃতির বড় বড় শক্তির সাথে সহ অবস্থানও করতে পারতো না।

সমুদ্র হচ্ছে প্রকৃতির এই প্রকান্ড শক্তিগুলোর অন্যতম, যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অনুগত করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে এই সমুদ্রের কিছু গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন। এই গোপন রহস্যের কিছুটা সন্ধান পেয়েছে নৌকা। তাই সে তার বুকের ওপর দিয়ে তরংগমালার তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে চলাচল করে।

'যেন তার ওপর তাঁর নির্দেশে নৌকা চলাচল করে।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রকে এরূপ বৈশিষ্ট্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। নৌকার উপাদানকেও এরূপ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বায়ুর চাপ, বাতাসের দ্রুততা ও মাটির মধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং অনুরূপ অন্যসব প্রাকৃতিক গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন, যা সমুদ্রকে নৌকা ও জাহাজ চলাচলের অনুকূল বানিয়েছে। তারপর মানুষকে এই সব কিছুর সন্ধান দিয়েছেন। ফলে তার পক্ষে এ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়েছে। আরো সম্ভব হয়েছে সমুদ্র দ্বারা অন্যান্য ব্যাপারেও উপকৃত হওয়া। যেমন আহার ও সৌন্দর্যোপকরণ সংগ্রহের জন্যে সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা, অনুরূপভাবে সামুদ্রিক ভ্রমণের মাধ্যমে বাণিজ্য, জ্ঞানার্জন, বিনোদন ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহর আরো বহু অনুগ্রহ লাভ করার পথ সুগম হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে সমুদ্র ও নৌকা দুটোই অনুগত করেছেন, যাতে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে, আল্লাহর এ সব নেয়ামতের জন্যে এবং অনুগত করা ও রহস্যের সন্ধান দেয়ার জন্যে তাঁর শোকর আদায় করে।

'যেন তোমরা শোকর আদায় করো।'

আল্লাহ তায়ালা এই কোরআন দ্বারা মানুষের মনকে এই কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং মানুষের মাঝে ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে উৎসের ঐক্য ও লক্ষ্যের ঐক্য রয়েছে-এ কথা বুঝিয়েছেন।

সমুদ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার পর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, শুধু সমুদ্র নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু-সকল সম্পদ ও শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। কেননা এ সব কিছুই তার খেলাফতের আওতাধীন।

'তোমাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন।'

বস্তুত সৃষ্টিজগতের সব কিছু তাঁর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক। তিনিই সব কিছুকে অনুগত করে দেন অথবা পরাক্রান্ত করে দেন। আর এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক রহস্যের কিছুটা জানবার যোগ্যতা

দিয়েছেন। এই সৃষ্টি জগতের কিছু শক্তিকে মানুষের অনুগত করে দেন। আবার কিছু শক্তিকে তার আয়ত্তের বাইরে রাখেন। উভয় অবস্থায়ই তার জন্যে কল্যাণকর এবং তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। এই প্রত্যেকটাতেই চিন্তাশীল মানুষের জন্যে শিক্ষা রয়েছে,

যারা চিন্তাশীল তাদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে।'

চিন্তা তখনই বিশুদ্ধ, নির্ভুল, ব্যাপক ও গভীর হতে পারে। যখন তা সেই সব শক্তিকে অতিক্রম করে যায়, যার গোপন রহস্য সে উদঘাটন করতে পারে। এই সব পার্থিব শক্তির উৎসের সন্ধান পাওয়া, এই শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক বিধানের সন্ধান পাওয়া, সব প্রাকৃতিক বিধান এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যকার যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়ার পরই মানুষের চিন্তা নির্ভুল হতে পারে। এই যোগসূত্রই মানুষের জন্যে তার সাথে সংযোগ স্থাপন সহজ করে দেয়। এই যোগসূত্রের সন্ধান না পেলে সে সংযোগ স্থাপনও করতে পারতো না এবং এই সব প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সে উপকৃতও হতে পারতো না।

বেঈমান হতভাগাদের প্রতি মোমেনদের করুণা

সূরার এই পর্যায়ে যখন মোমেনের অন্তর প্রকৃতির অন্তরের সাথে মিলিত হয় এবং সে প্রকৃত শক্তির উৎসের সন্ধান পায়, তখনই মোমেনদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা যেন সেসব দুর্বল ও অক্ষম মানুষের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে, যাদের অন্তর উক্ত উৎসের সাথে এখনো মিলিত হতে পারেনি। আলোকোজ্জ্বল মহাসত্যের সন্ধান থেকে বঞ্চিত এই সব দুস্থ হতভাগা মানুষের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হবার জন্যে মোমেনদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। *(আয়াত ১৪ ও ১৫)*

এ হচ্ছে আখেরাতে অবিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে মোমেনদের প্রতি উপদেশ। এই সদয় হওয়া ও ক্ষমা করার নির্দেশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া হয়েছে মোমেনরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার ও শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে যারা আখেরাতে ও আল্লাহর আযাবে বিশ্বাস করে না, তারা দুস্থ মানুষই বটে। তারা সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। কেননা তারা সেই অঢেল শক্তি, সমৃদ্ধি ও করুণার উৎস তথা আল্লাহর প্রতি ঈমানের উৎস, নিরাপত্তার উৎস, তার সাহায্যের উৎস, বিপদের সময়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে তারা প্রাকৃতিক বিধানের সাথে যুক্ত প্রকৃত নির্ভুল জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত। মোমেনরা, যারা ঈমানের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী, এসব বঞ্চিত মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও ঝোঁক প্রবণতার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করাই তাদের পক্ষে উত্তম।

অন্যদিকে, মোমেনদের উচিত, তাদের ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা, যিনি সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল উভয়কে যথোচিত প্রতিফল দিতে পারেন, যিনি তাদের অন্যায় অত্যাচারে ক্ষমা প্রদর্শনকে সৎকাজের তালিকাভুক্ত করেন। অবশ্য এই ক্ষমা ও মহানুভবতা কেবল সেই অপরাধের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে, যা সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির সাথে জড়িত নয় এবং ফৌজদারী অপরাধের আওতায় পড়ে না।

সবার শেষে এই বলে উপসংহার টানা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ তার অপকর্মের জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী, প্রত্যেক কাজের উপযুক্ত বদলা পাওয়া মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষকেই সর্বশেষে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।

'যে সৎ কাজ করবে, সেটা সে নিজের কল্যাণের জন্যেই করবে। আর যে খারাপ কাজ করবে। সে নিজের অকল্যাণের জন্যেই করবে। এপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে।'

এর দ্বারা মোমেনের বুকটা বড় হয়ে যায়। তার মনোবল বেড়ে যায়। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অনাচার ও অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে নেয়। কারও প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করে না, কোনো বিরক্তি প্রকাশ করে না। কারণ, সে আদর্শের দিক থেকে বড়, মনের দিক থেকে বড় এবং শক্তির দিক থেকে বড়। সে হেদায়াতের মশালবাহী, তার হাতে রয়েছে মৃতসঞ্জীবনী। তার কাজের জন্যে সে নিজে দায়ী। অন্য কারো অপরাধের ভাগী সে হবে না। সর্বশেষ বিচার আল্লাহর হাতে। তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

ইসলামে নেতৃত্ব ও তার অভিন্ন জীবন ব্যবস্থা

এরপর মানবতার জন্যে ঈমানী আদর্শে বলীয়ান নেতৃত্বের আলোচনা করা হচ্ছে এবং পরিশেষে এই নেতৃত্বের ভিত্তি ইসলামী আদর্শের ওপরই রাখা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কেতাব, শাসন ক্ষমতা ও নবুওত লাভের পর তারা এই মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। ফলে নেতৃত্ব ও শাসনের ঝান্ডাও সর্বশেষ নবীর হাতে অর্পণ করা হয়। অথচ তিনি তখনও মক্কায়ই রয়েছেন এবং এখনও তিনি বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মুখেই রয়েছেন। এর দ্বারা যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে, তা হলো ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতি সকল যুগেই এক ছিলো এবং নবী রসূলদের দায়িত্বও সকল যুগে একছিলো। তাই বলা হয়েছে,

'আমি বনী ইসরাঈলকে কেতাব, রাজত্ব ও নবুওত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রেযেক দিয়েছিলাম............। (আয়াত ১৬-২০)

রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের পূর্বে নেতৃত্ব ছিলো বনী ইসরাঈলদের হাতে। তখনকার যুগে ঐশী মতাদর্শের ধারক বাহক তারাই ছিলো। এই আদশ্য ছিলো সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কাজেই এই মতাদর্শের অনুসরণ ব্যতীত মানুষের অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ, পৃথিবীর বুকে যে নেতৃত্ব চলছিলো তা সম্পূর্ণ মনগড়া, ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ । যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই মানুষের সৃষ্টিকর্তা, কাজেই মানুষের উপযোগী জীবনবিধান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। একমাত্র তিনিই দিতে পারেন মানবীয় অজ্ঞতা, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার উর্ধের জীবনবিধান। তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি বনী ইসরাঈলকে কেতাব, রাজত্ব ও নবুওত দান করে ছিলাম..... ।'

অর্থাৎ জীবন বিধান হিসেবে তাদেরকে তাওরাত দান করেছিলাম। এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদেরকে রাজত্ব দান করেছিলাম, মূসা (আ.)-এর পর থেকে নুবওতের ঝান্ডা তাদের হাতেই ছিলো। দীর্ঘকাল ধরে নবুওত তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এরপর বলা হয়েছে.....

'আমি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রেযেক দান করেছিলাম......'

অর্থাৎ নীল নদ ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী যে এলাকায় তারা রাজত্ব করতো সে এলাকা ছিলো উর্বর ও পবিত্র। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও বিভিন্ন শস্যাদি উৎপন্ন হতো। এরপর বলা হয়েছে,

'আমি তাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম..... ।'

অর্থাৎ তৎকালীন যুগের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে তারা শ্রেষ্ঠ ছিলো। কারণ তাদের হাতে ছিলো নবুওত ও নেতৃত্বের ঝান্ডা। আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করার দায়িত্ব ছিলো তাদের হাতেই। এই হিসেবে তারা অন্যান্যদের তুলনায় নিসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলো, বেশী মর্যাদার অধিকারী ছিলো। এরপর বলা হয়েছে,

'তাদেরকে দ্বীনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে ছিলাম ....'

অর্থাৎ তাদেরকে যে শরীয়ত দান করা হয়েছিলো তা ছিলো চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট। তাতে কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না, কোনো বক্রতা ছিলো না এবং কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ছিলো না। এই জাতীয় সুস্পষ্ট একটি বিষয়ে তাদের মতবিরোধ করার কোনো কারণ ছিলো না, অথচ তারা মতবিরোধ করেছে; আর এই মতবিরোধ কোনো অস্পষ্টতার কারণে হয়নি এবং কোনো অজ্ঞতার কারণেও হয়নি। বরং জেনে বুঝে তারা এই মতবিরোধ করেছে। তাই বলা হয়েছে

'অতপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে...... ।'

অর্থাৎ তারা পরস্পর শক্রতা, হিংসা বিদ্বেষের কারণে জেনে বুঝে এই মতবিরোধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের হাত থেকে নবুওত ও নেতৃত্বের ঝান্ডা ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে চলে যাক, পরকালে তিনিই তাদের বিচার করবেন। তাই বলা হয়েছে,

'তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো, তোমার পালনকর্তা কেয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে নবুওত ও নেতৃত্বের জন্যে নতুন নবী নির্বাচিত করেন। যে নবী আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ও শরীয়ত অনুযায়ী মানব সমাজের নেতৃত্ব দেবেন। এখানে তার ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর কোনো সুযোগ থাকবে না। তাই বলা হয়েছে,

'এরপর আমি তোমাকে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের ওপর ...... ।' (আয়াত ১৮)

অর্থাৎ দুটোর যে কোনো একটি হবে। হয় আল্লাহর শরীয়ত বা বিধান মোতাবেক জীবন চলবে। অথবা ব্যক্তির খেয়াল খুশীমতো তা চলবে। তৃতীয় কোনো পন্থা নেই, শরীয়ত ও মানুষের খেয়াল খুশীর মধ্যবর্তী কোনো পন্থা নেই। যদি কেউ আল্লাহর শরীয়তকে ত্যাগ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীমতো বাইরে যা কিছু আছে তা সবই মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে অজ্ঞ লোকদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ, তারা কেউ তাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা একে অপরের সহযোগী। কিন্তু তারপরও তারা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাঁর বন্ধু ও সহায়ক। তাই বলা হচ্ছে,

'আল্লাহর সামনে তারা কেউ তোমার কোনো উপকারে আসবে না............ ।' (আয়াত ১৯)

এই আয়াত এবং এর আগের আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা ইসলামী দাওয়াতের মশালবাহীদের পথনির্দশনা করছে। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তারপর আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না।

অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত এক ও অভিন্ন। মানবজাতির জন্যে এই শরীয়তই একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান। এর বাইরে যা কিছু আছে তা সবই মনগড়া, যার উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা। কাজেই যারা ইসলামী দাওয়াতের ধারক ও বাহক তারা এক মাত্র আল্লাহর শীরয়তেরই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য সকল মনগড়া মতবাদ আদর্শ ত্যাগ করবে। তারা যেন কখনও এই শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো মতবাদের অনুসরণ না করে। কারণ যারা এসব মনগড়া মতবাদের স্রষ্টা ও ধারক, তাদের কেউ আল্লাহর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে তারা আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। কাজেই তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। তারা কারো কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। কারণ, যারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে থাকবে তাদেরকে আল্লাহই রক্ষা করবেন। আল্লাহর সামনে অন্য কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

এরপর বলা হয়েছে, 'এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।' (আয়াত ২০)

এখানে পবিত্র কোরআনকে 'জ্ঞানের কথা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষ চলার পথ খুঁজে পায়, আঁধারে আলোর সন্ধান পায়। এই কোরআন হেদায়াত ও রহমতের ভান্ডার। এই ভান্ডার থেকে কেবল তারাই লাভবান হতে পারে যাদের মনে বিশ্বাস রয়েছে, ঈমান রয়েছে, আস্থা রয়েছে; যাদের মনে কোনো সংশয় সন্দেহ নেই এবং কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। মনে যখন বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, আস্থার সৃষ্টি হয় তখন মানুষ নিজের চলার পথ খুঁজে পায় এবং পথে চলতে গিয়ে কোনো হোঁচট খায় না, পা টলে না, লক্ষ্যচ্যুত হয় না। কারণ তখন তার চোখের সামনে রাস্তা থাকে পরিষ্কার, দিগন্ত থাকে উজ্জ্বল, লক্ষ্য থাকে সুস্পষ্ট, আর সে কারণেই পবিত্র কোরআন তার জন্যে হয় হেদায়াত ও আলোর দিশারী।

ন্যায় ও অন্যায়ের মানদন্ড

উপরের আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম, কাফের ও আল্লাহদ্রোহী লোকেরা পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী। অপরদিকে যারা ধর্মপ্রাণ ও ঈমানদার, তাদের অভিভাবক ও সহায়ক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আমরা আরও জানতে পেলাম যে, কোরআন কেবল এই ঈমানদার লোকদের জন্যেই জ্ঞান, হেদায়াত ও রহমতের উৎস। এই আলোচনার পর এখন ধার্মিক ও অধার্মিক এবং সৎ ও অসৎ লোকদের পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে। এই উভয় শ্রেণী যে আল্লাহর মানদন্ডে কখনও সমান হতে পারে না সে কথা বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে এই জগত সৃষ্টি করেছেন। তাই জগত সৃষ্টির বুনিয়াদই হচ্ছে ন্যায় ও সত্য। কাজেই তিনি ন্যায় ও অন্যায় এবং সৎ ও অসৎকে একই পর্যায়ে রাখতে পারেন না। আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে,

'যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মতো করে দেবো, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? তাদের দাবী কতো মন্দ ....।' (আয়াত ২১-২২)

আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হয়তো ঐশী গ্রন্থের অনুসারী সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকজন। এরা ঐশী গ্রন্থের অনুশাসন অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরও নিজেদের ধার্মিক ও ঈমানদার মনে করতে থাকে, নিজেদের সৎলোকদের সমপর্যায়ের মনে করতে থাকে। এদের বিশ্বাস যে ইহকাল ও পরকালে তাদের অবস্থা ধার্মিক ও সৎলোকদের মতোই হবে।

আলোচ্য আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এখানে সাধারণভাবে সবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিচারে সকল যুগের সৎ ও অসৎ এবং ধার্মিক ও অধার্মিক কেমন হবে সে কথা বলা হয়েছে। এই হিসেবে বলা যায় যে, আল্লাহর মানদন্ডে ধার্মিক ও অধার্মিক এবং সৎ ও অসৎ লোকেরা কখনও এক হতে পারে না। ইহকালেও না এবং পরকালেও না। কারণ এমনটি করা হলে সেটা হবে ন্যায় বিরোধী, সত্যের বিরোধী। অথচ এই ন্যায় ও সত্যের ওপর ভিত্তি করেই গোটা জীবন ও জগত টিকে আছে। এই ন্যায় ও সত্যের দাবী হচ্ছে, সৎ ও অসৎ এবং ধার্মিক ও অধার্মিকদের মাঝে পার্থক্য করা, তাদেরকে এক দলভুক্ত মনে না করা। উভয় শ্রেণীর প্রত্যেককে যার যার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া এবং কোনো প্রকার অবিচার না করা।

সত্য ও ন্যায়ের এই মূলনীতির কথা পবিত্র কোরআনে বারবার বলা হয়েছে। কারণ এটা ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এবং এর ওপরই ভিত্তি করে এই আকিদা বিশ্বাস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, জীবন ও জগত সংক্রান্ত বিষয় দাঁড়িয়ে আছে।

এই শাশ্বত ও চিরন্তন মূলনীতির পাশাপাশি মানুষের অস্থির চিত্তের প্রসংগ আলোচিত হচ্ছে। এই অস্থির চিত্তের খেয়াল খুশীকে অনেকেই দেবতার মর্যাদা দিয়ে থাকে। ফলে তারা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং কখনও তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জোটেনা। তাই বলা হচ্ছে,

'তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছো যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় মাবুদ সাব্যস্ত স্থির করেছে?..(আয়াত ২৩)

এখানে অপূর্ব বর্ণনাভংগির মাধ্যমে পবিত্র কোরআন শাশ্বত মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর মানব মনের অবস্থা চিত্রায়িত করছে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন এই শাশ্বত মূলনীতি ত্যাগ করে নিজের খেয়াল খুশীর দাসত্বে লিপ্ত হয়ে তখন সে তার আচার আচরণ, চিন্তা-চেতনা এবং অনুরাগ অনুভূতি এই অস্থির চিত্তের খেয়াল খুশীরই অধীন হয়ে পড়ে। তার গোটা সত্ত্বা এই প্রভুর আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে। তাই বিস্ময়মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'তুমি কি সেই লোককে দেখেছো, যে নিজের খেয়াল খুশীকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে.........?

অর্থাৎ এই আজব ও অদ্ভুত মানুষটিকে দেখেছো কি? এমন মানুষ কখনও হেদায়াত লাভ করতে পারে না, আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে না। হেদায়াতকে স্থান দেয়ার মতো হৃদয় তার মাঝে নেই। সে তো রোগাক্রান্ত ও অস্থির চিত্তের আজ্ঞাবহ দাস। তাই বলা হয়েছে। 'আল্লাহ তায়ালা জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, ...। অর্থাৎ সে পথভ্রষ্টতা গোমরাহীর উপযুক্ত জেনেই তাকে গোমরাহ করেছেন, পথভ্রষ্ট করেছেন। অথবা তিনি সঠিক অবস্থা জানার পর তাকে খেয়াল খুশীমতো চলা থেকে বিরত রাখেননি। এটাও এক ধরনের বিপথগামিতা। এই বিপথগামিতার উপযুক্ত বলেই আল্লাহ তায়ালা তার সাথে এই আচরণ করেছেন,

'তার কান ও অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর পর্দা রেখেছেন'

এর ফলে তার হৃদয়ে আলো প্রবেশের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। চিন্তা ভাবনার সকল শক্তি লোপ পেয়েছে আর সে কারণেই সে নিজ খেয়াল খুশীর দাসে পরিণত হয়ে পড়েছে।

'এমন লোককে আল্লাহর পর আর কে পথ দেখাতে পারে?............'

কারণ হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি ব্যতীত আর কেউ হেদায়াত ও গোমরাহীর মালিক নয়। এমনকি তার মনোনীত রসূলরাও নন। এটা একান্তই তাঁর ব্যাপার!

এরপর বলা হয়েছে, 'তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করা না?......' কারণ, যারা চিন্তা ভাবনা করে তারা সতর্ক হয়, সজাগ হয়। প্রবৃত্তির দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত হয় এবং সুস্থির ও সুস্পষ্ট নীতির অনুসারী হয়, এর ফলে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না।

'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ, আমরা মরি ও বাঁচি..।' (আয়াত ২৪-২৭)

আলোচ্য সূরায় এই শেষ পর্বে পরকাল, পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান সম্পর্কে মোশরেকদের মন্তব্য উল্লেখ করে তাদের সৃষ্টি রহস্যের আলোকেই এর উত্তর দেয়া হয়েছে। কারণ, মানব সৃষ্টি রহস্য তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। এরপর কেয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে এর একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যদিও কেয়ামত এখনও আসেনি। কিন্তু কোরআন তার নিজস্ব বর্ণনাভংগির মাধ্যমে সেটাকে দৃশ্যমান ও মূর্ত করে তুলেছে যেন গোটা দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে।

সূরার সমাপ্তি ঘটেছে আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে। তাঁর তাওহীদ ঘোষণার মাধ্যমে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহত্মা বর্ণনার মাধ্যমে এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বর্ণনার মাধ্যমে।

وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلٰى
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا إِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾
وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ

২৪. এ (মূর্খ) লোকেরা এও বলে, আমাদের এ পার্থিব দুনিয়া ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই, আমরা (এখানেই) মরি বাঁচি, কালের আবর্তন ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধ্বংশও করেনা। (মূলত) এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই, এরা শুধু আন্দায অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে। ২৫. যখন এদের কাছে আমার (কিতাবের) সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয়– তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তারা বলে, তোমরা যদি (কেয়ামতের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো। ২৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এটা (সংঘটিত) হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু (তারপরও) অধিকাংশ মানুষ (এ সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

রুকু ৪

২৭. আকাশমন্ডলী ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এই বাতিলপন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৮. (হে নবী, সেদিন) তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে (মহাবিচারকের সামনে) ভয়ে আতংকে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেয়া হবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার (যথাযথ) প্রতিফল দেয়া হবে। ২৯. এ হচ্ছে আমার (সংরক্ষিত) নথিপত্র, যা তোমাদের (কর্মকান্ডের) ওপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে; তোমরা যখন যা করতে আমি তা (এখানে সেভাবেই) লিখে রেখেছি। ৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (আজ) তাদের মালিক তাদের তাঁর অনুগ্রহে (জান্নাতে) দাখিল করাবেন; আর

فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ
آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ
اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا
يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ
وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

এটাই হবে সুস্পষ্ট সাফল্য। ৩১. অপরদিকে যারা কুফরী অবলম্বন করেছে (আমি তাদের বলবো), তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ (বার বার) পড়ে শোনানো হতো না? অতপর (এ সত্ত্বেও) তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, (মূলত) তোমরা ছিলে নাফরমান জাতি! ৩২. যখন (তোমাদের) বলা হতো, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত (সংঘটিত) হওয়ার মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (অহংকার করে) বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত (আবার) কি, আমরা (এ ব্যাপারে সামান্য) কিছু ধারণাই করতে পারি মাত্র, কিন্তু আমরা তো তাতে বিশ্বাসীও নই! ৩৩. (সেদিন) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে– যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াতো। ৩৪. (ওদের তখন) বলা হবে, আজ আমি তোমাদের (জেনে শুনেই) ভুলে যাবো, ঠিক যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন, (সে আগুন থেকে বাঁচার জন্যে এখানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না। ৩৫. এটা এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং (তোমাদের) পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের সেখান থেকে বের করা হবে না– না (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে। ৩৬. অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহের মালিক, তিনি যমীনের মালিক, তিনি মালিক গোটা সৃষ্টিকুলের! ৩৭. আকাশমন্ডলী এবং যমীনের সমস্ত গৌরব ও মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর

আয়াত ২৪-৩৭

জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগি

আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবন তো শেষ.......।' *(আয়াত ২৪-২৬)*

এই হচ্ছে ওদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি। জীবন বলতে তারা এই পার্থিব জীবনটাই বুঝে যা তারা দেখতে পায় এবং উপভোগ করতে পারে। ওরা দেখছে, এক প্রজন্ম আসছে আর এক প্রজন্ম যাচ্ছে। এখানে মৃত্যুর বাহ্যিক অস্তিত্ব ওদের চোখে ধরা পড়ছে না। বরং ওদের বিশ্বাস, কালের পরিক্রমায় একসময় মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ কালের পরিক্রমাই ওদের আয়ু নিঃশেষ করে দেয় এবং ওদের দেহের ওপর মৃত্যুকে চাপিয়ে দেয়, ফলে সবার মৃত্যু ঘটে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এটা হচ্ছে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নিতান্ত অগভীর দৃষ্টিভংগি। এই দৃষ্টিভংগির ফলে মানুষ কখনও জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। এই শ্রেণীর মানুষ কখনও চিন্তা করে দেখে না যে, এই জীবন তাদের কাছে কিভাবে এবং কোথা থেকে আসলো এবং এ জীবন তাদের কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নেয়? মানুষের মৃত্যু তো বিশেষ কোনো নিয়মের অধীনে ঘটে না, নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন পার হলেই ঘটেনা। কাজেই ওরা কি করে বুঝলো যে, সময়ের ব্যবধানেই মৃত্যু ঘটে? তাহলে অল্প বয়েসী শিশুদের মৃত্যু কিভাবে ঘটে? সুস্থ লোকদের মৃত্যু কিভাবে ঘটে? কোন নিয়মেই বা শক্ত সামর্থ্য লোকদের মৃত্যু ঘটে? এতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল কালের পরিক্রমাকেই মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য করা যায় না। বরং যারা গভীর দৃষ্টিভংগি এবং অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে জীবন ও মৃত্যুর বিষয়টি তলিয়ে দেখে, এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায় এবং এর প্রকৃত কারণ জানতে চায়, তারা কখনও সেই জাতীয় ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেই ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো নিছক অনুমান করে।'

অর্থাৎ ওরা নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে এসব কথা বলে থাকে। অথচ ওদের এসব অনুমান হচ্ছে নিতান্তই অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন যার সাথে প্রকৃত জ্ঞান ও চিন্তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এর দ্বারা বস্তুনিচয়ের প্রকৃত পরিচয়ও পাওয়া যায় না। যারা এ জাতীয় ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জীবন ও মৃত্যুর ব্যাখ্যা করে তারা কখনও এর অন্তরালে ভিন্ন এক সত্ত্বার ইচ্ছার পতিফলনকে দেখতে পায় না এবং কালের পরিক্রমার বাইরে অন্য কোনো কারণ দেখতে পায় না।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে,

'তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, ...।' (আয়াত ২৫)

এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক স্থূল দৃষ্টিভংগি। এই দৃষ্টিভংগি যারা পোষণ করে তারাও পূর্বের আয়াতে বর্ণিত লোকদের মতোই সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল আল্লাহর কুদরতকে দেখতে পায় না, জীবন ও মৃত্যুর গোপন রহস্য তারা অনুধাবন করতে পারে না। এই পৃথিবীর বুকে মানুষকে কর্মের সুযোগ হিসেবে জীবন দান করা হয়। মানুষ এই সুযোগের কতোটুকু সদ্ব্যবহার করছে আল্লাহ তায়ালা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান। এরপর তাদের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর পর মানুষের কর্মের হিসাব নিকাশের জন্যে নির্ধারিত একটি দিনে সকলকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তারপর তাদের হিসাব নিকাশ করা হবে। তাই মানুষ মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। কেউ চাইলেও আসবে না। কারণ এটা আল্লাহর সৃষ্টি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অথচ গোটা সৃষ্টি জগত এই নিয়ম

ও বিধান অনুযায়ীই চলছে। কাজেই মৃত ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দাবী নিতান্তই বোকামী। ওদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা কেন তাঁর নির্ধারিত সময়ের আগে জীবিত করবেন? এর মাধ্যমে ওরা কি মৃতকে পুনরায় জীবিত করার আল্লাহর ক্ষমতার পরীক্ষা করতে চায়? আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর সৃষ্টির নিয়ম অনুসারী প্রতি মুহূর্তে তাদের চোখের সামনেই সৃষ্টি করছেন না? তাই বলা হচ্ছে,

'তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই অতপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন ......।' (আয়াত ২৬)

এই অলৌকিক ঘটনাই তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে দেখতে চায়। অথচ এই অলৌকিক ঘটনাই প্রতিনিয়ত তাদের চোখের সামনে ঘটছে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে জীবন দান করেন, এক মাত্র তিনিই তার মৃত্যু ঘটান। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি মানুষকে পুনরায় জীবিত করে কেয়ামতের দিন একত্রিত করলে এতে আশ্চর্যের কী আছে? এ ব্যাপারে সংশয় সন্দেহেরও কিছু নেই। কারণ এর নযীরতো তারা সচক্ষেই দেখছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানতে চায় না, বুঝতে চায় না।

এরপর বলা হচ্ছে, 'আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই .....' যেহেতু গোটা সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তাই সব কিছুই তাঁর করায়ত্ত। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই যে কোনো কিছু পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন।

কেয়ামতের ময়দানে কাফের ও মোমেনদের অবস্থা

কেয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, 'যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুমি প্রত্যেক উম্মতকে নতজানু অবস্থায় দেখবে..........।' (আয়াত ২৭-২৮)

প্রথম আয়াতেই বাতিল পন্থীদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে দিনটির ত্বড়িৎ আগমনের জন্যে তারা অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিলো আজ সেদিনটিতেই তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে আমাদের সামনে যে দৃশ্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাতে আমরা একটা বিরাট ময়দান দেখতে পাই। সেখানে এই গ্রহের বাসিন্দারা দলে দলে একত্রিত হচ্ছে। তারা একেক দলে বিভক্ত হয়ে নতজানু অবস্থায় ভয়ানক এক হিসাবের অপেক্ষায় বসে আছে। একই ময়দানে এতো বিরাট সংখ্যক লোকদের সমাগমই এক ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা করবে। তাছাড়া যখন দেখা যাবে, মানুষ দলে দলে নতজানু হয়ে বসে, তখন সে দৃশ্যও মনে ভীতির সৃষ্টি করবে। এরপর রয়েছে হিসাব নিকাশের আতংকময় মুহূর্ত। এর চেয়েও মারাত্মক ও আতঙ্কময় মুহূর্ত হচ্ছে পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার মুহূর্তটি। এই মহূর্তে সেই সকল লোকেরা উপস্থিত হবে যারা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করেছে, কিন্তু কোনোদিন তার শুকরিয়া আদায় করেনি।

এই শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তে অপেক্ষমান জনস্রোতের উদ্দেশ্যে এই ভাষায় ঘোষণা আসবে, 'আজ তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে.........।' (আয়াত ১৮-১৯)

অর্থাৎ এই আমলনামায় ছোট খাট সব কিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি অথবা ভুল করা হয়নি। কারণ, সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। কাজেই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে কোনো কিছু থাকতে পারে না। তাঁর জ্ঞানের বাইরেও কিছু থাকতে পারে না।

এরপর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর এই বিশাল জনসমুদ্রকে দুটো দলে বিভক্ত করা হবে। একটি দল হবে ঈমানদারদের আর একটি দল হবে কাফেরদের। অর্থাৎ একটি দল হচ্ছে 'হেযবুল্লাহ' বা আল্লাহর দল আর অপরটি হচ্ছে, 'হেযবুশ্ শয়তান' বা শয়তানের দল। কেবল এই দুটো দলের সাথেই যুক্ত হবে উপস্থিত শতধাবিভক্ত জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকগুলো। বলা হয়েছে,

'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন' (আয়াত ৩০)

এর ফলে তারা দীর্ঘ অপেক্ষার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা পাবে। তাদের ব্যাপারটা খুব দ্রুত সমাধা হয়ে যাবে বলে আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বুঝা যায়।

এরপর আসছে দ্বিতীয় দলটির পালা। তাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, তাদেরকে ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা করা হচ্ছে, তাদের দোষ ক্রটিগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে এবং তাদের সকল মন্দ কথাবার্তা ও অপকর্মগুলো তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আয়াতে বলা হয়েছে,

'আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সামনে কি আয়াতসমূহ পঠিত হয়নি? ....। (আয়াত ৩১-৩২)

এখন তোমরা কি বুঝতে পারছো? এখন তোমাদের অবিশ্বাসের ফল টের পাচ্ছ কি?

ওদের প্রসঙ্গ ক্ষণিকের জন্যে রেখে দিয়ে এবার জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, 'তাদের মন্দকর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো, তা তাদেরকে ব্যাপক গ্রাস করবে।' (আয়াত ৩৩)

এরপর পুনরায় ওদেরকে লক্ষ্য করে ভর্ৎসনার বাণ নিক্ষেপ করা হবে, ওদেরকে উপেক্ষা ও অমর্যাদার পাত্র বলে ঘোষণা করা হবে এবং ওদেরকে মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাবো, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে .... !' (আয়াত ৩৪-৩৫)

এবার তাদের শেষ পরিণতির কথা ঘোষণা দিয়ে এরপর দৃশ্যের এখানে সমাপ্তি ঘটবে। ওরা জাহান্নামে পড়ে থাকবে, সেখান থেকে আর বের হতে পারবে না। তাদেরকে কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হবে না এবং ওযর আপত্তি উত্থাপন করতেও বলা হবে না। তাই বলা হয়েছে, 'আজ তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তাওবাও চাওয়া হবে না।

এই ঘোষণার পর মনে হচ্ছে, আমরা যেন জাহান্নামের কপাট বন্ধ হওয়ায় শব্দ পাচ্ছি যা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনের সুযোগ নেই।

এই মর্মান্তিক দৃশ্যের সমাপ্তির পর এখন ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসাবাণী। বলা হচ্ছে, 'অতএব, বিশ্বজগতের মালিক, ভূমন্ডলের মালিক ও নভোমন্ডলের মালিক আল্লাহরই প্রশংসা। আসমানসমূহ ও যমীনে তাঁরই প্রশংসা, তিনি পরাক্রমশলী, প্রজ্ঞাময়' (আয়াত ৩৬-৩৭)

সর্বত্র প্রশংসাবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে চারদিকে। সকলকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন গোটা সৃষ্টি জগতের মালিক, তিনি আসমান ও যমীনের মালিক, জ্বিন ও ইনসানের মালিক। জীব জন্তু ও পশু পাখীর মালিক এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে এর সবকিছুরও মালিক তিনি। তিনিই এসব কিছুর রক্ষক এবং তিনিই এসব কিছুর পরিচালক। একমাত্র তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত।

সর্বশেষে আবারও মহান আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, গোটা সৃষ্টি জগতের তিনিই হচ্ছেন একক অধিপতি। তাঁর সামনে সকল ক্ষমতাধররাই আজ তুচ্ছ। তাঁর সামনে সকল বাহাদুররাই আজ পরাভূত। তাঁর সামনে সকল বিদ্রোহী আজ আত্মসমর্পিত। কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালকের উদ্দেশেই নিবেদিত।

-০-

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

২০তম খন্ড

২১তম খন্ড

২২তম খন্ড

سيد قطب
في ظلال القرآن
باللغة البنغالية
المجلد الثاني
ترجمة القرآن
حافظ منير الدين أحمد
AL-QURAN ACADEMY LONDON
إكاديمية القرآن لندن